শব্দ

Post-Conference Proceedings of

ʃɔbd̪o

Guest Editors

Agniv Dutta

Ratul Ghosh

Patitpaban Pal

A JJLL Publication of School of Languages and Linguistics

Jadavpur University

Kolkata

2024

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

Volume 06, Special Edition

Post-Conference Proceedings of

ʃɔbd̪o 2023

Editorial Assistant
Aniruddha Poddar

© 2024 by the author(s) of the respective articles. No part of this material protected by this copyright notice may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright owner(s).

***

Editorial Board:
Atanu Saha
Indranil Dutta
Samir Karmakar

Managing Editor:
Samir Karmakar

ʃɔbd̪o 2023 Conference Organising Committee

আহ্বায়ক বৃন্দ

অভিজিৎ মল্লিক, বাংলা বিভাগ, বারুইপুর মহাবিদ্যালয়, বারুইপুর

দেবদীপ ধীবর, বাংলা বিভাগ, দুর্গাপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়, দুর্গাপুর

ছন্দম চক্রবর্ত্তী, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সমীর কর্মকার, ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান শাখা , যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সৌম্য শংকর ঘোষ, ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান শাখা, ভি.আই.টি. ভেলোর বিশ্ববিদ্যালয়, ভোপাল

সুজয় সরকার, ভারতীয় ভাষা সংস্থান, মহীশুর

কার্যনির্বাহী সমিতি

অগ্নিভ দত্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

পতিতপাবন পাল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

রাতুল ঘোষ, ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত

শংকর রাম বর্মণ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সহযোগিতায়

বারুইপুর মহাবিদ্যালয়

দুর্গাপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়

ভি.আই.টি. ভেলোর বিশ্ববিদ্যালয়

ইন্সটিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় ভাষা সংস্থান

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

Table of Contents

অবৈধ কয়লা ব্যবসায় জড়িত জনসমাজে প্রচলিত 'বিশিষ্ট' শব্দ ও ভাষাভঙ্গি: রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে একটি সমীক্ষা ও তার বিশ্লেষণ 001-007
সুরজিৎ ভট্টাচার্য ও সনৎ কুমার গুছাইত

মহুয়া পালার ভাষাগত বিশ্লেষণ 008-013
সুমনা পাল

শব্দার্থ অভিধা-লক্ষণায় নেই বাঁধা : ব্যঞ্জনায় অনন্য পূর্ব মেদিনীপুরের ধাঁধা 014-025
সুদীপ্ত সামন্ত

ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শন 026-033
শিঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

ছন্দপাঠের ক্লাস: সংকেততত্ত্বের আবহে 034-040
রিমি ঘোষ দস্তিদার

‘ম্যাস্কুলাঁ-ফেমিনাঁ’-র চিত্রনাট্যের অনুবাদ: দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম পেরিয়ে লেখ্য মাধ্যমে অনুপ্রবেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট 041-049
অগ্নিভ দত্ত

নির্জ্ঞান এবং ভাষা: জাঁক লাকাঁর(বি)নির্মাণ 050-060
কৃষ্ণ শিঞ্জিনী দেব

ভুল বুঝি: শিক্ষা ব্যবস্থাতে analogy সৃষ্টি এবং তার ত্রুটির বিশ্লেষণ 061-071
আত্রেয়ী মুখার্জি

বিমল করের ‘দেওয়াল’: ভাষাশৈলী 072-084
কৌশিক কর্মকার

মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার ধানুক সম্প্রদায়ের বহুভাষিক পরিস্থিতি : কোড মিশ্রণ ও কোড পরিবর্তন 085-089
বাপী সরকার

আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি : সাধারণ পরিচয় ও নির্বাচিত গল্পে তার নানা মাত্রা অনুসন্ধান 090-099
পারমিতা দাস

বাংলা শিশুসাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ, গঠন এবং ব্যকরণগত অবস্থান 100-106
রাকিবা সুলতানা

শব্দ ও সংকেত [দ্য ওয়র্ডস্ অ্যান্ড দ্য সাইনস্] 107-113
শিবাংশু মুখোপাধ্যায়

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL
Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

অবৈধ কয়লা ব্যবসায় জড়িত জনসমাজে প্রচলিত 'বিশিষ্ট' শব্দ ও ভাষাভঙ্গি: রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে একটি সমীক্ষা ও তার বিশ্লেষণ

সুরজিৎ ভট্টাচার্য ও সনৎ কুমার গুছাইত
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO
Article history:
Received 06/05/2023
Accepted 06/05/2024
Keywords:
রানিগঞ্জ কয়লাখনির ভাষা, অবৈধ কয়লা ব্যবসার পরিস্থিতি, কয়লাখনির ব্যবহৃত বিশিষ্ট শব্দ
Guest Editors
Agniv Dutta
Ratul Ghosh
Patitpaban Pal
Organised by: শব্দ /ʃɔbd̪o/

ABSTRACT
কোনো বেআইনি অর্থনৈতিক কাজের যথেষ্ট বড় ভৌগোলিক পরিসর এবং বহু মানুষের অংশগ্রহণ থাকলে গ্রেপ্তার ও শাস্তির ভয় এড়াতে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত গোপন শব্দভাণ্ডার ও কথনভঙ্গির বিকাশ ঘটে।পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আসানসোল মহকুমা জুড়ে ভারতের প্রাচীনতম রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের অবস্থান। গত ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে এই এলাকায় অসংগঠিত, আধা-সংগঠিত এবং পূর্ণ সংগঠিত বেআইনি কয়লা ব্যবসায় বহু মানুষ জীবিকার দায়ে জড়িয়ে আছেন। অভিযোগ শোনা যায় পুলিশ, প্রশাসন ও রাজনৈতিক জগত পরোক্ষ সমর্থন যুগিয়ে এই ব্যবসার লাভের অংশ গ্রহণ করে। এ'নিয়ে বৃহত্তর সমাজে সমর্থন ও অসমর্থনের এক দ্বান্দ্বিকতাও রয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে এই অবৈধ ব্যবসায় জড়িত জনসমাজে গ্রেপ্তার, শাস্তি ও সামাজিক অসম্মানের ভয় অল্প বলে গোপন শব্দের ভান্ডার বেশ কম। তবু কাজের পরিবেশ ও প্রক্রিয়া থেকেই তৈরি হয়েছে বৃহত্তর সমাজে অজ্ঞাত কিছু বিশেষ নতুন শব্দ বা প্রচলিত শব্দের অর্থবিকৃতি ও অর্থান্তর। খনিগর্ভের মজুর থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমিক ও নানা স্তরের পরিচালক কর্মীরা এই শব্দভাণ্ডার ও ভাষার উদ্ভাবক ও ব্যবহারকারী। বৃহত্তর সমাজে যেসব মানুষের সরাসরি সংযোগ এদের সাথে আছে, তারাও এই ভাষা সমভাবে ব্যবহার করে। সতর্কভাবে গোপন করা না হলেও বৃহত্তর সমাজে এগুলি খুব একটা ব্যবহার হয় না। এইসব বিশিষ্ট শব্দ ও ভাষাভঙ্গি ব্যবহারের প্রধান কারণ কাজের বিশিষ্ট পরিস্থিতি। গোপনীয়তা কিছুটা থাকলেও তা খুবই আলগা ধরনের।
এই রচনায় রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে অবৈধ কয়লা ব্যবসা জগতে ব্যবহৃত ওই শব্দগুলির বিশেষ অর্থ, তাদের আর্থসামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও একটি অসম্পূর্ণ শব্দকোশ পাওয়া যাবে।

ভূমিকা

মান্য, শিষ্ট বা শালীন ভাষার ধারণা বিতর্কিত হলেও সব ভাষাতেই তার অস্তিত্ব আছে এবং তার পাশাপাশি অল্পশিক্ষিত মানুষ, ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে কিছুটা অশিষ্ট ধরনের ভাষাভঙ্গি ও শব্দ ব্যবহার সব এলাকাতেই পাওয়া যায়। এগুলি গোপন না হলেও সমাজের বেশিরভাগ মানুষ ব্যবহার করেন না, হয়তো জানেনও না। এই প্রবণতারই একেবারে চরম বহিঃপ্রকাশ হলো গোপন গোষ্ঠী বা অপরাধীদের ব্যবহৃত সাংকেতিক ভাষা, যা ওই গোষ্ঠীর অল্প সংখ্যক সদস্য ছাড়া আর কেউ জানে না।

email id:sulekhaputra@gmail.com & guchhait.sanat37@gmail.com

বাংলা ভাষাতেও আছে অপরাধী গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা-জগত এবং তার নিজস্ব বৈচিত্র্য।

প্রধানত গ্রেপ্তার ও শাস্তির ভয়ে নিজেদের জীবিকা সংক্রান্ত খবর যাতে পেশার বাইরের লোক জানতে না পারে, কাজ চলাকালীন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা যাতে অন্য মানুষের কাছে প্রকাশ না পায় এবং এর পাশাপাশি সামাজিক অসম্মান থেকে বাঁচতে চেয়েও এই গোপন ভাষার জন্ম হয়ে থাকে।

পূর্ব গবেষকদের কাজের সারমর্ম

বাংলা ভাষায় অপরাধ জগতের নিজস্ব ভাষাবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য এবং বৃহত্তরভাবে অশিষ্ট ও অকথ্য ভাষা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন শ্রীভক্তিপ্রসাদ মল্লিক (১৯৭২, ১৯৯৩), শ্রীসত্রাজিৎ গোস্বামী (২০০০) এবং শ্রীঅভ্র বসু (২০০৫) । এঁদের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ থেকে বাংলায় অপরাধ জগতে ব্যবহৃত ভাষার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। যেমনঃ

১. এই ভাষায় বিশেষ্য পদের পরিমাণ সবথেকে বেশি। অর্থাৎ, বিভিন্ন বস্তু, পেশা, কাজ, ব্যক্তি প্রভৃতি বিষয়ে প্রচলিত শব্দটি ব্যবহার না করে অন্য কোনো শব্দ প্রয়োগ করে গোপনীয়তা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। ক্রিয়াপদ ব্যবহারেও রয়েছে নিজস্ব গোপনীয় ধরন। এ'ছাড়া বিশেষণ ব্যবহারে আছে সামান্য বিশিষ্টতা। ভাষার বাকি উপাদানগুলি, যেমন ধ্বনি বা বাক্যগঠনে খুব উল্লেখযোগ্য কোনো বিচ্যুতি দেখা যায় না।

২. গোপন শব্দগুলি খুব দ্রুত অর্থাৎ দুই বা পাঁচ বছরের মধ্যেই বদলে গিয়ে নতুন গোপন শব্দ চালু হয়ে যায়। এ'ভাবে প্রতিশব্দ ভান্ডার দ্রুত বেড়ে ওঠে। যদিও তার সবগুলি সমান ব্যবহৃত হয় না। ভক্তিপ্রসাদ মেয়ে শব্দের চব্বিশটি, বোমা শব্দের একুশটি, পুলিশ শব্দের একচল্লিশটি এবং মদ শব্দের একুশটি প্রতিশব্দ সংগ্রহ করেছিলেন।

৩. পাশাপাশি-ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে হিন্দি, ভোজপুরি এবং সামান্য পরিমাণ ওড়িয়া, মারাঠি ও দক্ষিণ ভারতীয় শব্দের অনুপ্রবেশ বাংলায় অপরাধ জগতের ভাষায় ঘটেছে।

৪. প্রধানত তিনভাবে কোনো ভাষায় গোপনীয়তা জন্মাতে পারে। প্রচলিত শব্দের প্রচলিত অর্থ প্রসারিত, সংকুচিত অথবা বিকৃত করে ব্যবহার; প্রচলিত শব্দ সম্পূর্ণ নতুন অর্থে ব্যবহার এবং সম্পূর্ণ নতুন শব্দ সৃজন।

৫. বর্ণিত বিষয় বা বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য যেমন, আকার, আকৃতি, রং প্রভৃতির সাদৃশ্য নতুন শব্দ নির্মাণের পেছনে মনস্তাত্ত্বিকভাবে কাজ করে। ভাবগত বা প্রক্রিয়াগত সাদৃশ্যও গুরুত্বপূর্ণ।

৬. কিছু শব্দ কঠোরভাবে অপরাধ জগতের মধ্যেই সীমিত। কিছু আবার সাধারণ অসংস্কৃত সমাজ, ছাত্র ও যুবশ্রেণিতেও ব্যবহার হয়। ফলে অপরাধী সমাজ ও শিষ্ট সমাজ এইসব শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে অস্পষ্টভাবে হলেও শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত হয়ে যায়।

৭. অপরাধ জগতেও রয়েছে কিছু শব্দ যা বিশেষ বিশেষ অপরাধীরাই ব্যবহার করে, যেগুলি অন্য ধরনের অপরাধীরা জানে না এবং ব্যবহারও করে না। কিছু শব্দ অবশ্য সব ধরনের অপরাধীরাই ব্যবহার করে।

ক্ষেত্রসমীক্ষার এলাকা

এই গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষা পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার কয়লাখনি এলাকায় প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে চালু অসংগঠিত, আধা-সংগঠিত ও পূর্ণ সংগঠিত বেআইনি কয়লা ব্যবসায়ে নিযুক্ত জনসমাজের গোপন ভাষা ব্যবহারের ধরন বিষয়ে সীমিত ছিল। অপরাধের এই বিশেষ ক্ষেত্রটির ভাষা ব্যবহার নিয়ে আগে কোনো গবেষণা না থাকাই এই ক্ষেত্রটি বেছে নেওয়ার মূল কারণ।

উদ্দেশ্য

১. এই এলাকার অবৈধ কয়লার ব্যবসার সাথে জড়িত অপরাধীদের গোপন ভাষাভঙ্গির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
২. পূর্ব গবেষকদের চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যের সাথে এর মিল-অমিল ও তার কারণ নির্ণয়।
৩. এই জাতীয় শব্দের একটি শব্দভান্ডার নির্মাণ।

তথ্য সংগ্রহ

সম্পূর্ণ ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর প্রাথমিক তথ্য এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশ্লেষণ

প্রথমে অপরাধ জগতে সার্বিকভাবে ব্যবহৃত শব্দের একটি শ্রেণিবিভাজন করে তাতে অবৈধ কয়লা ব্যবসায় নিয়োজিত সমাজের বিশিষ্ট শব্দগুলি কোন শ্রেণিতে পড়ে, তা আমরা বুঝে নেব। এতে অপরাধ জগতের ভাষার সার্বিক প্রেক্ষাপটে এই বিশেষ ক্ষেত্রসমীক্ষার এলাকায় ওই জাতীয় ভাষার অবস্থান বুঝে নিতে সুবিধা হবে।
ক. অপরাধ জগতে গোপন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের শ্রেণিবিভাগ
খ.অপরাধ জগতের ভাষার সার্বিক শ্রেণিবিভাজনের ভিতর অবৈধ কয়লা ব্যবসায় নিযুক্ত সমাজে প্রচলিত গোপন শব্দের অবস্থান নির্ণয় এবং সেই অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ
অবৈধ কয়লা ব্যবসার ভৌগোলিক ও আর্থিক ব্যাপ্তি বিশাল হলেও এই কাজে যুক্ত সমাজে কোনো সম্পূর্ণ গোপন ভাষাভঙ্গি বা শব্দ একেবারেই ব্যবহার হয় না। যেগুলি হয়, সে'গুলি আংশিকভাবে বৃহত্তর সমাজেও অবগত। তবে খনি এলাকার বাইরে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গে এ'গুলির ব্যবহার প্রায় শোনাই যায় না। তাই শ্রেণিবিভাজনে এই এলাকার আধা-গোপন ভাষা দ্বিতীয় উপ-অংশে (২.১) যে চারটি ধরন (২.১.১, ২.১.২, ২.১.৩ এবং ২.১.৪) চিহ্নিত করা হয়েছে, মোটামুটি তার মধ্যেই সীমিত। অপরাধের ব্যাপ্তি বিপুল হওয়া সত্ত্বেও এখানে সম্পূর্ণ গোপন কোনো শব্দভান্ডার বা ভাষাভঙ্গি গড়ে না ওঠার কারণ বুঝতে গেলে এই বিশিষ্ট শব্দভান্ডার উৎপত্তির বিশেষ চারটি পরিস্থিতি বিচার করা দরকার। যেমন:
১. আইন ও শাস্তির সর্বাধিক ভয় এবং প্রবল সামাজিক অসম্মানের সম্ভাবনা
এ'ক্ষেত্রে গোপন শব্দভাণ্ডার, তার উচ্চারণ বৈচিত্র্য, অর্থান্তর এবং পরিবর্তনশীলতা প্রভৃতি সবই সর্বোচ্চ পরিমাণে বিকশিত হবে।
২. আইন ও শাস্তির অত্যধিক ভয় থাকলেও সামাজিক অসম্মানের সম্ভাবনা প্রায় নেই
এ’ক্ষেত্রে শুধু শাস্তির ভয়টুকুই থাকে। কিন্তু তা কম নয়। তাই গোপন ভাষার সর্বোচ্চ বিকাশ না হলেও এই পরিবেশে যথেষ্ট সংগঠিত আকারে তা পাওয়া যাবে।
৩. আইন ও শাস্তির ভয় নেই কিন্তু প্রবল সামাজিক অসম্মানের সম্ভাবনা।
এ'ক্ষেত্রে ভয় কেবল সমাজের। তাই গোপন ভাষার খুব উল্লেখযোগ্য বিকাশ হবে না।
৪. আইন ও শাস্তির ভয় নেই এবং সামাজিক অসম্মানের সম্ভাবনাও কম।
এ'ক্ষেত্রে গোপন ভাষার বিকাশ হবে সব থেকে অল্প। কারণ, অপরাধে যুক্ত থাকলেও অপরাধীর ক্ষতির সম্ভাবনা কোনো দিক দিয়েই নেই।

আক্ষরিক অর্থেই কোটি কোটি টাকার অবৈধ অর্থনীতি সৃষ্টি করলেও রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে অবৈধ কয়লা ব্যবসায় নিয়োজিত মানুষ প্রকৃতপক্ষে আইন ও শাস্তির ভয় সামান্যই পায়, কারণ, বিভিন্ন স্তরের পুলিশ প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত লাভের অংশের বদলে এই ব্যবসায় মদত দেন

বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে মানুষ বিকল্প জীবিকার অভাবে নিরুপায় ব'লে ক্রমে ক্রমে সামাজিক অসম্মানের বিপুল সম্ভাবনাও এখন কমে গিয়েছে।
তবু সামান্য হলেও সমাজের কোনও কোনও স্তরে সামাজিক অসম্মতি আছেই। বিশেষত, সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত অংশ, শিক্ষিত জনসমাজ ও পরিবেশ সচেতন মানুষ বৃহত্তর অর্থনৈতিক ভিত, পরিবেশের অবনতি ও মূল্যবোধের বিনাশের জন্য অবৈধ কয়লা ব্যবসাকেই দায়ী করেন। ফলে
১. অন্যদের অবমূল্যায়ন করার জন্য অথবা নিজে ওই সব কাজে জড়িত নয়— এমন বোঝাতে এই এলাকায় কয়লা বিষয়ে বিশেষ কিছু বাকভঙ্গি তৈরি হতে পেরেছে।
২. কাজের পরিবেশ, প্রক্রিয়া ও পরিস্থিতি অনুসারে কিছু বিশিষ্ট শব্দ তৈরি হতে বাধ্য, যে'গুলোকে গোপন না ব'লে বিশিষ্ট বলাই ভালো, কারণ, বৈধ খনির পরিবেশেও শব্দগুলি কম বেশি ব্যবহার হয়।
৩. এ'ছাড়া, বৃহত্তরভাবে এই এলাকার সমাজের অশিষ্ট অংশ ও ছাত্রযুবদের মধ্যে যে'সব শব্দ ও ভাষাভঙ্গি চালু আছে, সে'গুলি গোপন জীবিকার এই ক্ষেত্রটিতেও যথেষ্ট পরিমাণেই ব্যবহার হয়। এর মধ্যে কিছু কিছু শব্দ পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর অশিষ্ট জনগণের ভাষাভঙ্গির অংশ।

গ. অবৈধ কয়লা ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত শব্দ ও ভাষাভঙ্গি সমূহের উদাহরণ সহ বিশ্লেষণ
ভক্তিপ্রসাদ সমগ্র বাংলার অপরাধ জগতে ক্ষেত্রসমীক্ষা চালিয়ে যেসব শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলি তাঁর হিসেব মতো বিশেষ্য পদ প্রায় ৮০%, ক্রিয়াপদ ১৫%, বিশেষণ ৫%, সর্বনাম সামান্য কিছু এবং অব্যয় একেবারেই অনুপস্থিত। রানিগঞ্জ কয়লাখনি এলাকায় অবৈধ কয়লা ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকজনের কথাবার্তা থেকে যে শব্দগুলি সংগ্রহ করা গেছে এবং যা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি, তার ৭২.৭% বিশেষ্য, ৭.১% বিশেষণ, ১৭.৯% ক্রিয়া এবং সর্বনাম ও অব্যয় প্রায় নেই বললেই চলে।
অসম্পূর্ণ এই শব্দভাণ্ডারে মোট শব্দ সংখ্যা ৮৪, যার ২২ টি অবৈধ কয়লার প্রত্যক্ষ পরিবেশে এবং বাকি ৬২ টি ওই পরিবেশ ছাড়াও খনি এলাকার বৃহত্তর পরিসরের লোকজনও ব্যবহার করে থাকে। এর একটি ছোট অংশ বাংলার সব স্থানেই অশিষ্ট ভাষার অঙ্গ। পূর্ববর্তী গবেষকদের আলোচনায় সেগুলির উল্লেখ আছে।
১. ক্রিয়াপদ বিশ্লেষণ
অবৈধ কয়লা ব্যবসা সংক্রান্ত তিনটি (বিশেষ্য) যুক্ত ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট ব্যবহার এ অঞ্চলে লক্ষণীয়।
১.কয়লা করা: খুব কয়লা করছিস, নাকি?
২.কয়লা চালানো: খুব কয়লা চালাচ্ছিস, নাকি?
৩.কয়লা টানা: খুব কয়লা টানছিস, নাকি?
প্রথমটিতে নৈকট্যের সাথে খানিকটা সম্ভ্রমের বোধ জড়িত। অসফল আত্মীয় যেভাবে সফল আত্মীয়ের সাথে কথা বলে, অনেকটা সেই রকম।
দ্বিতীয়টিতে মেশানো আছে যথেষ্ট তাচ্ছিল্য ও ঈর্ষা। গরিব কোনো ব্যক্তি অবৈধ কয়লা 'চালিয়ে ' সচ্ছল হয়ে উঠছে, সেই ঈর্ষা থেকে তাচ্ছিল্য এবং সে যে অবৈধ কাজ করেই ধনী হয়ে উঠছে— তা ইঙ্গিত করে অপমান করার উদ্দেশ্য এই বাকভঙ্গিতে লুকোনো আছে।
তৃতীয়টিতে অবশ্য রয়েছে কেবল তথ্য সংগ্রহের ঝোঁক। এতে কোনো মূল্যায়ন মিশে নেই।

ক্রিয়াপদ দিয়ে ব্যক্তি পরিচয় ঘোষণা এখানে খুবই নির্দিষ্ট। কেবল অবৈধ খনির পরিসরেই এরূপ তিনটি শব্দ সৃষ্টি হয়েছে, যা বৈধ খনির পরিসরে অনুপস্থিত। যেমনঃ
১.<u>মাল-কাটাঃ</u> অবৈধ খনিগর্ভে যারা গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটে। (মাল= কয়লা)
২.<u>ঝিক্কা-পার্টিঃ</u> ওই কয়লা ঝুড়িতে ভরে যারা খনিমুখে টেনে আনে।

৩.<u>রশা-টানাঃ</u> খনিমুখে বাঁশের ফ্রেমে লাগানো কপিকলে দড়ি বেঁধে যারা ওই ঝুড়ি ভূপৃষ্ঠে তুলে আনে। তিন চারজন করে বারো-চোদ্দ জনের এই তিনটি বিশিষ্ট কর্মীদল ছাড়া অবৈধভাবে কয়লা উত্তোলন অসম্ভব। কিন্তু কোটি টাকার অর্থনীতি যাদের শ্রম ও প্রাণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ব্যক্তি পরিচয় একেবারে মুছে ফেলে শুধুমাত্র কাজের ধরন দিয়ে লোকগুলিকে চিহ্নিত করার প্রচলন দেখিয়ে দেয় মানুষ হিসেবে কতখানি অস্বীকার করলে তবে তাদের নির্বিবাদে শোষণ করা বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব।অবশ্য আমাদের দেশে অন্য অনেক শারীরিক শ্রমের পরিবেশেও আমরা এই ধরনের মানবিক অবনমন লক্ষ্য করে থাকি।

অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া যৌথভাবে যে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন করে, তার কিছু অশিষ্ট ধরন এই পরিবেশে শোনা যায়। তবে এ’গুলি কয়লার সাথে জড়িত নন এমন সাধারণ এলাকাবাসীরা জানেন এবং অল্পশিক্ষিতদের মধ্যে ব্যবহারের প্রবণতা আছে। এর দু’একটি শব্দ সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই ব্যবহার হয়।
পঁদপঁদিয়ে পালানোঃ দৌড়ে পালানো। (পুলিশ আসছে শুনে সব শালা পঁদপঁদিয়ে পালালো।)
(পঁদ) খাল করে দেওয়াঃ বেশি ক্ষমতাশালী কেউ এসে পরিকল্পনা বা কাজ নষ্ট করে দেওয়া। (পুলিশ এলে পঁদে খাল করে ছেড়ে দেবে।)
ফুটে যাওয়াঃ মরে যাওয়া। (আজ দুটো মালকাটা একসাথে ফুটে গেল।)
বিলা করাঃ গোপন কথা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া। (সম্ভবত ‘বিলিয়ে দেওয়া’ কথাটি থেকে উৎপত্তি) (টাকার কথা বিলা করিস না।)
(গর্ত বা কয়লা খাদ) ভোঁতাই দিছেঃ বুজিয়ে দিয়েছে। (সিবিআই আসা ইস্তক সব খাদানগুলা ভোঁতাই দিছে।)

বিশেষ্য পদ বিশ্লেষণ
আমরা লিখেছি এই পদগুলিই সংখ্যায় সবথেকে বেশি। এ'গুলি প্রধানত চার প্রকার। যেমন:

১. রূপতাত্ত্বিক বিচারে নতুন শব্দ তৈরি করে সৃষ্ট:
১.ক.প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ বিকৃতি ঘটিয়ে: যেমন, ইংরেজি থেকে ফারকোল <fire clay, কোলোজ <close, ডিনামাটি< dynamite, ডিসটাপ<disturb, ডাইলক< dialogue ইত্যাদি।
বাংলা থেকে সুঁদ <সুড়ঙ্গ, গাভা< গর্ভ বা গর্ত, চিথালে <চিৎ হয়ে, ছামুতে<সম্মুখে বা সামনে, জুনপুকি< জোনাকিপোকা, কুচরি< খুচরো।
১.খ. সম্পূর্ণ নতুন শব্দ সৃষ্টি করে: ঘুসিক= চুনাপাথর, গারা =পোড়ানো কয়লা, ফুল কয়লা= কাঁচা কয়লা, খোচর =পুলিশের চর, ফিতাবাজি= জুয়া, ফয়েল= কাঁচা কয়লা পোড়ানোর স্থান ইত্যাদি।
অবৈধ কয়লায় জড়িত নন এমন অনেক স্থানীয় মানুষ জানেন কিন্তু ব্যবহার করেন না এরূপ কিছু শব্দ হলঃ ফান্টুস= মেয়ে, মাকড়া= বোকা, খবিশ= দুষ্ট, নাংটা =মুখরা, ঝিটা= ঠকানো, পাত্তি= কাগজের দামী নোট (যেমন, ৫০০ বা ২০০০ টাকার নোট), টিকলি =পয়সা (সর্বনিম্ন মূল্যের) ইত্যাদি।
প্রত্যয় যোগ করে কয়েকটি নতুন শব্দ তৈরি হতে দেখা গেছে। যেমন,
ফিতাবাজি (বাজি) = জুয়ার মাধ্যমে লোক ঠকানো, ভোঁসড়িবালা (ওয়ালা) = যে নিমকহারামি বা উপকারীর অপকার করেছে, ধুরকিবাজ (বাজ) = যে অস্বাভাবিক বীরত্ব প্রকাশ ও হইচই করে (সাধারনত মাতাল অবস্থায়), প্যাঁদাগিরি (গিরি) = যৌনকাজ ইত্যাদি।

বাকি তিনটি ধরন শব্দার্থতাত্ত্বিক বিচারের অন্তর্গত। যেমনঃ

২. প্রচলিত শব্দ সম্পূর্ণ নতুন অর্থে ব্যবহার করে সৃষ্ট:
কাঁটা =অবৈধ কয়লার ডিপো— যেখানে ওজন ক'রে অথবা না ক'রে বিভিন্ন গাড়িতে কয়লা চাপিয়ে গন্তব্যে রওনা করানো হয়, প্যাড =অবৈধ কয়লাবাহী গাড়ির চালক যে সাংকেতিক লেখা বা ছবি-আঁকা কাগজ দেখিয়ে পুলিশের তল্লাশি ও গ্রেপ্তার থেকে রেহাই পায়, আলু= বোমা, চুইংগাম= সিম কার্ড, কাঠি বা দানা=বন্দুকের গুলি, এক নম্বর = ওয়ান শটার বন্দুক, ছয় নম্বর = ছয়ঘরা রিভলভার, খুল যাও =পালাও, নকশা= মিথ্যা, ব্যাপারী= পুলিশ, গান শোনা= পতিতা সঙ্গ করা ইত্যাদি।

৩.প্রচলিত শব্দ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে সৃষ্ট:
কোলিয়ারি= কেবলমাত্র বৈধ কয়লাখনি, খাদান= অবৈধ খনিগর্ভ, বাহারি লেবার= স্থানীয় এলাকার বাইরে থেকে আসা অবৈধ খনির মজুর, ভাটি= যেখানে অবৈধ কাঁচা কয়লা আংশিক পুড়িয়ে পাকা করা হয়, ধামা= বিশেষ পরিমাণ কয়লা ধরে এমন ঝুড়ি।

৪. প্রচলিত শব্দ প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করে সৃষ্ট: (যদিও শব্দগুলি বেশিরভাগ মান্য অভিধানে নেই)
সবুর = (দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাই) থেমে যাও অথবা অপেক্ষা করো, খবরদার= (কয়লার স্তর আলগা করার জন্য বিস্ফোরণের আগে অথবা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকলে) সাবধান বা সতর্ক হও, টেনিয়া= কিশোর শিক্ষানবিশ।
প্রতিবেশী হিন্দি এবং ভোজপুরি ভাষা থেকে প্রচুর সাধারণভাবে ব্যবহৃত তথাকথিত অশিষ্ট শব্দ সীমান্ত বাংলার এই কয়লাখনি অঞ্চলে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন,
পিয়ক্কড়= মদ্যপ, ভোঁসড়িবালা= যে নিমকহারামি বা উপকারীর অপকার করেছে, (কেস) কিচাইন= অত্যন্ত ঝামেলাপূর্ণ পরিস্থিতি (কেস= পরিস্থিতি), দগলা= বেজন্মা, কিচ্চড়= কীটপতঙ্গ বা সেই রকম বাজে ও উৎপাতকারী লোক, বাতবাতিয়া= কথাবার্তা, হামরাদের= আমাদের, সহিমে= ঠিকই তো, লাপারবাহা= বেপরোয়া হতদরিদ্র, উদমা= অকারণ, চবনা= চোয়াল, হরফর্মল্লা (মাতাল) = প্রবলভাবে (মাতাল), গিধধারা= পালানো ইত্যাদি।
গালাগালি বা অশ্লীল শব্দ, যা অনেক সময়েই এখানকার কথাবার্তায় অতি সাধারণ বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহার হয়, তার কিছু উদাহরণ দেখা যাক।
পঁদ (পশ্চাদদেশ) খুলে কিছু করা= প্রবল উৎসাহ ও পরিশ্রমে কিছু করা, দাগাদাগি /প্যাঁদাগিরি= যৌন কাজ করা, খিঁচে= রমণ ক্রিয়া ক'রে >গালাগালি ও অপমান ক'রে (এ'ক্ষেত্রে রমণ কাজের সাথে বল প্রয়োগ করে অপরকে দমন করার মানসিকতা পর্যন্ত শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে), ফেরিমাদারি =বাধা বিপত্তি বা ঝামেলা, ফিচা / পোঙা /পঁদ= পশ্চাদদেশ, (পঁদ) খাল করে দেওয়া= পরিকল্পনা বা কাজ নষ্ট করে দেওয়া, পঁদপঁদ করে (পালানো) =দ্রুতগতিতে পালানো (ছুটে পালানোর সময় পশ্চাৎদেশ দ্রুত আন্দোলিত হয়—সম্ভবত সেই সাদৃশ্য থেকে শব্দটি সৃষ্ট)
ধ্বন্যাত্মক নানারকম শব্দও এই পরিবেশে যথেষ্ট ব্যবহার হয়। যেমন,
ভটভটি =মোটরবাইক, ঘড়ঘড়ি= কপিকল, দবকানি= হম্বিতম্বি, ধুরপুক =অশান্ত, লচরফচর= অদরকারী ও বিরক্তিকর দীর্ঘস্থায়ী কথা বা কাজ, (মাতালের) ধুরকি (বাজি) =অস্বাভাবিক বীরত্ব প্রকাশ ও হইচই, পঁদপঁদ (ক'রে) =দ্রুতগতিতে, ধুমকি/ধুনকি= নেশা ধরা, ইড়কে= ভয় পেয়ে।
অবৈধ কয়লার জগতে ব্যবহৃত কয়েকটি সাঙ্কেতিক শব্দ পাওয়া গিয়েছে, যা বৃহত্তর বঙ্গের অপরাধ জগতেও ব্যবহার হয় বলে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক পঞ্চাশ বছর আগেই (১৯৭২) উল্লেখ করে গেছেন।

অতএব অনুমান করা যায়, এই শব্দগুলি বাংলার অপরাধ জগতে স্থায়িত্ব পেয়েছে, যা এই ধরনের শব্দের সাধারণ চরিত্র নয়।
তাঁর মতে, গৃহীত শব্দগুলি এবং তাদের গোপন অর্থগুলির মধ্যে অন্তত তিন ধরনের সাদৃশ্য-ভাবনা ক্রিয়াশীল আছে।
দৃশ্যগত সাদৃশ্য
আলু= বোমা, দানা= বন্দুকের গুলি, চুইংগাম= সিম কার্ড, প্যাড= অবৈধ কয়লা চালানের সাঙ্কেতিক কাগজ, এক নম্বর= ওয়ান শটার বন্দুক, ছ নম্বর= ছয়ঘরা রিভলভার।
প্রক্রিয়াগত সাদৃশ্য
গান শোনা=পতিতালয়ে যাওয়া, ফিতাবাজি=জুয়ার মাধ্যমে লোক ঠকানো (রানিগঞ্জ খনি এলাকায় ফিতে টেনে এক জাতীয় জুয়া খেলা অতীতে জনপ্রিয় ছিল)
ভাবগত সাদৃশ্য
ব্যাপারী= টাকার বিনিময়ে অবৈধ কয়লা পাচারে সাহায্য করে যে পুলিশ।

উপসংহার

ওপরের আলোচনা থেকে দুটো বিষয় স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ হিসেবে উঠে আসে–
১. রানিগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চলে অবৈধ কয়লা ব্যবসায় নিযুক্ত জনসমাজে সম্পূর্ণ গোপন কোনো শব্দ ও ভাষাভঙ্গি সৃষ্টি হয়নি। যা রয়েছে, তা হল আধা গোপন ও পরিস্থিতি নির্ভর কিছু বিশিষ্ট শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের ধরন।
২. ব্যবহৃত শব্দ গুলির প্রচুর প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়নি এবং তাদের খুব একটা পরিবর্তনও হচ্ছে না।
এই পর্যবেক্ষণ খুবই উল্লেখযোগ্য, কারণ অপরাধের পরোক্ষ প্রশাসনিক সমর্থন ও গণসম্মতি গড়ে ওঠার এক বিপদজনক সামাজিক প্রবণতা এটি নির্দেশ করছে।

সূত্র- নির্দেশ

Mallik, B. (1972). *Language of the Underworld of West Bengal*. Sanskrit college. Calcutta

মল্লিক, ভ. (১৯৯৩). *অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ*. দেজ প্রকাশন

গোস্বামী, স. (২০০০). *বাংলা অকথ্য ভাষা ও শব্দকোষ*. একবিংশ

বসু, অ. (২০০৫). *বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান*. প্যাপিরাস

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

মহুয়া পালার ভাষাগত বিশ্লেষণ

সুমনা পাল
কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received 13/07/2023
Accepted 06/05/2024

Keywords:
মৈমনসিংহ গীতিকা,
মহুয়া পালা,
পালাগান

Guest Editors
Agniv Dutta
Ratul Ghosh
Patitpaban Pal

Organised by: শব্দ /ʃɔbd̪o/

ABSTRACT

"মৈমনসিংহ গীতিকা" হল প্রেমগাথা বা প্রেমাখ্যান। মুক্ত স্বাধীন প্রেমচেতনাই হল গীতিকাগুলির উপজীব্য বিষয়। দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে "মৈমনসিংহ গীতিকা" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ গুলির মধ্যে দশটি পালা সংকলিত হয়েছে, যথা -১। মহুয়া, ২। মলুয়া, ৩।চন্দ্রাবতী, ৪।কমলা, ৫।দেওয়ান ভাবনা, ৬। দস্যু কেনারাম, ৭। রূপবতী, ৮। কঙ্ক ও লীলা , ৯। কাজলরেখা, ১০।দেওয়ান মদীনা। "মৈমনসিংহ গীতিকা" নামটিই তার উৎপত্তি স্থলকে নির্দেশ করে দেয়। পূর্ববঙ্গ তথা মৈমনসিংহ অঞ্চলে যে গীত বা গান গুলি প্রচলিত ছিল সেইগুলিই হল " মৈমনসিংহ গীতিকা" র বিষয়। চন্দ্রকুমার দে তার কঠোর এবং বিরামহীন পরিশ্রম দিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন এই অসামান্য গীতিকা গুলি, যেগুলি পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি কতটা দরদ দিয়ে এই গানগুলি গাইতেন সেখানকার মানুষ। এই গীতিকাগুলি পড়লে আমরা বুঝতে পারি কতটা স্বাতন্ত্রতা, কতটা স্বতঃফূর্ততা ,কতটা আবেগ, কতটা সৃজনশীলতা রয়েছে তাদের মধ্যে। কতটা সৃজনশীল মানুষ হলে এইরকম অনবদ্য কাহিনী ও ভাষা দিয়ে গান গাওয়া যায় তার প্রমাণ এই গীতিকাগুলি। এই গিতিকাগুলিতে ব্যবহৃত ভাষা হল পূর্ব বঙ্গ তথা মৈমনসিংহের কথ্য ভাষা। এই কথ্য ভাষার মধ্যে অসাধারণ মাধুর্য বর্তমান।

ভূমিকা

"মৈমনসিংহ গীতিকা" র অন্তর্গত "মহুয়া" পালার ভাষা হল অমার্জিত কথ্য ভাষা, এই ভাষা কৃত্রিমতার স্পর্শ মুক্ত। সজীব জীবনের আনন্দে স্বতঃফুর্তভাবে বেরিয়ে আসা ভাষায় হল মহুয়া পালার ভাষা। দ্বিজ কানাই প্রায় তিনশো বছর পূর্বে এই পালাটির রচনা করেছিলেন। তিনি "মহুয়া" পালাটিকে আরও জীবন্ত ও আস্বাদনীয় করে তুলেছিলেন অকৃত্রিম ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে।

এখন "মহুয়া" পালাটিতে ব্যবহৃত ভাষার যে বৈচিত্র্যময় দিক গুলি ফুটে উঠেছে তা এক এক করে আলোচনা করবঃ-

"মহুয়া" পালার ভাষাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখব একই শব্দের অনেকগুলি রুপ ব্যবহৃত হয়েছে এই পালায়। আসলে মহুয়া পালার ভাষা হল কথ্য ভাষা , আর কথ্য ভাষায় কখন একটি নির্দিষ্ট স্যাটিজি মানা যায় না তথা মানা সম্ভবও নয়, কেননা ভাষাবিজ্ঞান বলে প্রতি দশ কিলোমিটার অন্তর ভাষার পরিবর্তন হয়। একই অঞ্চলের দুজন লোক দুটো ভাষা বলে। একই অঞ্চলের লোক কিছু কিছু শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারণ করে। আর মহুয়া পালার ভাষা কথ্য ভাষা হওয়ার কারণে একই

email id: sumanapal6809@gmail.com

শব্দের অনেক রুপ প্রত্যক্ষ করা যায়। মহুয়া পালায় একই শব্দের একাধিক রুপে ব্যবহারের একটি তালিকা দেওয়া হলঃ-
যে শব্দ গুলির একাধিক রুপ পাওয়া যায়
যে শব্দ গুলির দুটি রুপ পাওয়া যায়ঃ-
বাদ্যা বাইদ্যা
কন্যা কইন্যা
ডুব্যা ডুইবা
থাক্যা থাইবা

আবার কখনো কখনো একই শব্দ সাধু ও কথ্য ভাষা দুটি রূপই পাওয়া যায়ঃ-
ছার‍্যা ছাড়িয়া
দেখ্যা দেখিয়া
ছাইড়া ছাড়িয়া
বাইচ্যা বাঁচিয়া
যে শব্দ গুলির তিনটি রুপ রয়েছে
কর‍্যা কইর‍্যা করিয়া
আন্দাইর আইন্ধ্যারিয়া আন্ধাইর
ছুড়ু ছুট ছুটু

আবার কখনো কখনো ‘চন্দ্র’ ও ‘সূর্য’ শব্দ দুটি “চান্দ সুরুষ “ কখনো “ চান্দ সুরুঝ “ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। “চাঁদ “ শব্দটি অনেক সময় “ চান” হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে “নদীয়ার ঠাকুর ” , “নইদ্যা ঠাকুর” আবার কখনো “নদ্যার চান” ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু মহুয়া পালার ভাষা অমার্জিত কথ্য ভাষা তাই এই রকম একই শব্দের একাধিক রুপ দেখা যায়। এই রকম একই শব্দের একাধিক রুপের সমাবেশ আমাদের আবারও একবার মনে করিয়ে দেয় সেখানকার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা অর্থাৎ কথ্য ভাষায় রচিত হয়েছে এই পালা।

“মহুয়া” পালার ভাষায় উপমার ব্যবহার লক্ষণীয়। এই পালায় যেকোনো উজ্জ্বল জিনিশ বোঝাতে “ কাঞ্চা সোনা” উপমাটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে, যথাঃ-
১। মহুয়ার রুপের বর্ণনায় – “ আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা”
২। নদ্যার ঠাকুর যখন মহুয়াকে খুঁজছিলেন তখন মহুয়ার রুপের বর্ণনা প্রসঙ্গে- “ আন্ধাইর ঘরে থইলে কন্যা কাঁঞ্চা সোনা জ্বলে”
৩।মহুয়া যখন হুমরা বাইদ্যার কাছে নদ্যার ঠাকুর এর রুপের বর্ণনা দিয়েছেন- “ আমার বন্ধু চান্দ-সুরুঝ কাঞ্চা সোনা জ্বলে “

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দেহের কম উজ্জ্বল বোঝাতে “ জ্যোনি” উপমা অর্থাৎ জোনাকির মৃদু আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এছারাও মহুয়ার রুপের বর্ণনা প্রসঙ্গে তার চোখকে “ আসমানের তারা” এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
“মহুয়া” পালাতে বারংবার “ বিষলক্ষের ছুরি” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ছুরির বিশেষণ হিসেবে “বিষলক্ষ” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে ছুরির অগ্রভাগটি বিষ মাখানো বোঝাতে এই বিশেষণটি

ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ছুরি দিয়ে যখনই কাওকে প্রানে মারার প্রসঙ্গ এসেছে তখনই “বিষলক্ষ” বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে।

“মহুয়া” পালার ভাষা বঙ্গালী উপভাষা হওয়ার কারণে অপিনিহিতির ব্যবহার এই পালাটির পরতে পরতে রয়েছে যথাঃ- “তুইল্যা”, “কইন্যা”, “ভাইস্যা”,”ছাইড়া”, “বাইদ্যা”, “ডুইবা”, “উইড়া”, “ফিইরা” ইত্যাদি।

ভাষা ব্যবহারের সমান্তরালতা “মহুয়া” পালায় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, একই শব্দ বা লাইন বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে, আবার একই লাইন একাধিক চরিত্র ব্যবহার করেছে। “মহুয়া” পালার ভাষা ব্যবহারের এই রীতিকে ভাষা ব্যবহারের সমান্তরলতা বলা যায়। ভাষা ব্যবহারের এই সমান্তরলতা মহুয়া পালায় কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা নীচে তুলে ধরা হলঃ-

১। নদ্যার ঠাকুর যখন তার মায়ের কাছে “তামসা” করার অনুমতি নিচ্ছে তখন তাদের কথোপকথনের ভাষা –

“বাইদ্যার তামসা করাইতে কয়শ টাকা লাগে।
বাইদ্যার তামসা করাইতে একশ টাকা লাগে।।”
(এই লাইনদুটিকে একই শব্দ বার বার ফিরে ফিরে আসছে।)

২।হুমরা বাইদ্যার উক্তি মহুয়ার প্রতি-
“ কাইন্দ না কাইন্দ না কইন্যা না কান্দিয়ো আর ।”
(এই লাইনটিতে “কাইন্দ” ও “না” শব্দটি তিন বার করে ব্যবহৃত হয়েছে।)

৩।নদ্যার ঠাকুরের উক্তি মহুয়ার প্রতি-
“মাও ছাড়ছি বাপ ছাড়ছি ছাড়ছি জাতিকুল।”
(ছাড়ছি শব্দটির বারংবার ব্যবহার)

৪। হুমরা বাইদ্যার উক্তি মহুয়ার প্রতি-
“নয়া বাড়ি লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলে উরি।
তুমি কইন্যা না থাকলে আবার গলার ছুরি।।
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কচু।
সেই কচু বেচ্যা দিয়াম তোমার হাতের বাজু।।
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কলা।
সেই কলা বেচ্যা দিয়াম তোমার গলার মালা।।“
(“ নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা” লাইনটি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে)

৫। “বনদম্পতি” অধ্যায়ে নদ্যার চাঁদ ও মহুয়ার সুখে দিন অতিবাহিত করার প্রসঙ্গে –
“বাপে ভুলে মায়ে ভুলে ভুলে ঘর বাড়ী ।
দেশ ভুলে বন্ধু ভুলে স্বজন পেয়ারী।।“
(এই লাইনদুটি একই শব্দ বার বার আবর্তিত হয়েছে)

এছাড়াও একই সংলাপ বা লাইন শোনা যায় একাধিক চরিত্রের মুখে। যেমন-“ কঠিন তোমার মাতাপিতা” এই উক্তিটি তিনটি চরিত্রের মুখে শোনা যায়, যথা- মহুয়া, নদ্যার চাঁদ ও সন্ন্যাসী।
যথাঃ-

নদ্যার ঠাকুরের উক্তি-“ কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার প্রাণ।”
মহুয়ার উক্তি- “কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।”
সন্ন্যাসীর উক্তি-“ কঠিন তোমার মাতাপিতা শানে বান্দা হিয়া।”আবার “ আমার মাথা খাও” এই উক্তিটি চার বার ব্যবহৃত হয়েছে একবার বলেছে “ পালঙ্ক সই”,
দুইবার বলেছে “মহুয়া” এবং আর একবার বলেছে হুমরা বাইদ্যা’ যথা-
পালঙ্ক সই এর উক্তি –“ শুন শুন বইন মহুয়া আমার মাথা খাও”
মহুয়ার উক্তি_ “ আমি মরি জলে ডুব্যারে বন্ধু আমার মাথা খাও”
-“ বাপের বাড়ীর তাজী ঘোড়া আছে আমার মাথা খাও ।“
হুমরার উক্তি-“ আমার মাথা খাও রে কন্যা আমার মাথা খাও”

অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে কিভাবে মহুয়া পালায় সমান্তরাল ভাবে ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি ভাষা ব্যবহারের সমান্তরালতা মহুয়া পালার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

“মহুয়া” পালার ভাষার মধ্যে কথকথার ভাষাও বর্তমান। মহুয়া পালাটি পড়ার সময় দেখব এই পালার চরিত্রগুলি একাধিকবার তাদের বক্তব্য অন্যকে বলার সময় “ শুন শুন” বলে সম্বোধন করেছে। এই সম্বোধনসূচক শব্দ শুনে আমাদের মনে পরে যায় কখকথার আসরের কথা। সেখানেও সভাজনের উদ্দেশ্যে “ শুন শুন” বলে ডাক দেওয়া হয়, তাই আমরা বলতে পারি মহুয়া পালার শরীরে কথকথাধর্মী ভাষার নিদর্শনও রয়েছে।

“মহুয়া” পালায় ভাষায় নৈশব্দের শব্দও বর্তমান। নদ্যার ঠাকুর ও মহুয়ার মধ্যে কথোপকথনে সেই নৈশব্দের শব্দ লুকিয়ে রয়েছে। তাদের কথোপকথনের মধ্যে between the line অনেক কথাই রয়েছে। যে শব্দ গুল দেখতে না পেলেও মনে মনে আমরা অনুভব করতে পারি। কয়েকটি উদাহরনের সাহায্যে বিষয়টিকে প্রতিপণ্য করা হল-

“নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার জলের ঘাটে দেখা” অধ্যায়টিতে যখন নদ্যার ঠাকুর ও মহুয়া নিজেদের পরিচয় ব্যক্ত করছে তখন মহুয়া নদ্যার ঠাকুরকে‘সে বিয়ে করেছে কিনা’ সরাসরি জিঙ্গাসা না করে বলেছে-

“মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া”
তার পর ক্ষণেই নদ্যার ঠাকুর উত্তর দিয়েছে -
“মিছা কথা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া”

অর্থাৎ আমরা দেখলাম তারা অনেক কথাই বলল না কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ তুলে নিজেদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন গুলির উত্তর পেয়েছে। যেকোনো সংবেদনশীল পাঠক এই লাইনগুলি পড়লে বুঝতে পারবে এই লাইনগুলির ভিতর আরও অনেক লাইন। এই লাইনগুলতে শব্দের ভিতরেও যে আরও শব্দ রয়েছে সেগুলি আমরা অনুভব করতে পারি। তাই মহুয়া পালার ভাষায় যেমন নৈশব্দের মধ্যে শব্দ বর্তমান ঠিক তেমনই অনুভবের ভাষাও বর্তমান।

“মহুয়া” পালার মধ্যে যেমন ভাবগত বিচ্যুতি রয়েছে সেইরকম ভাষাগত বিচ্যুতিও রয়েছে। দ্বিজ কানাই “সাধু” ও “ সন্ন্যাসী” নামে দুটি চরিত্র নির্মাণ করেছে। এই চরিত্র দুটির নামকরণে লেখক ভাষাগত

বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। আসলে আমরা সাধারনত অর্থে সাধু বলতে নির্লোভ, জ্ঞানী , ধ্যানী কোন যোগী পুরুষকে বুঝি। কিন্তু লেখক এখানে সাধু চরিত্রটির যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করেছেন তা মোটেও একজন প্রকৃত সাধুর অনুগামী নয়। এই সাধু লোভী, কামুক কোন ধনী ব্যক্তি। অর্থাৎ এই চরিত্রটির “ সাধু” নামকরণে ভাষাগত বিচ্যুতি ঘটেছে।

“সাধু” চরিত্রের পরেই লেখক আর একটি চরিত্রের নির্মাণ করেছেন যার নামকরণ করেছেন “ সন্ন্যাসী”। এখানেও লেখক ভাষাগত বিচ্যুতি এনেছেন। সন্ন্যাসী চরিত্রটিকেও লেখক নির্মাণ করেছেন এক লোভী ও কামুক ব্যক্তি হিসাবে, তাই তার চরিত্রে আমরা সন্ন্যাসী সুলভ কোন গুন দেখতে পাই না। এই নামকরণের ক্ষেত্রেও লেখক ভাষাগত বিচ্যুতি এনেছেন।
মহুয়া পালায় কোন জিনিসের শব্দের অনুভূতি বোঝাতে তারা একাধিক সময় ধনাত্মক শব্দের ব্যবহার করেছেন, যেমনঃ-
১। করতালের শব্দকে “ রুনুঝুনু” বলা হয়েছে।
২।নুপুরের শব্দ বোঝাতে “ ঝুনঝুনি” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
৩। মহুয়ার হাসির শব্দ বোঝাতে “ খলখলি” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
৪। শুকনো পাতার শব্দ বোঝাতে “ মড়মড়ি” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

“মহুয়া” পালায় আমরা দেখব একাধিক শব্দে “ রেফ” ও “ রফালা” র পরিবর্তে “র” এর ব্যবহার করা হয়েছে। এই “রেফ” ও “ র-ফলা” র পরিবর্তে “ র” এর ব্যবহারের ফলে উচ্চারণরীতি আরও সরল ও মধুর হয়েছে। এই রকম শব্দের কিছু তালিকা নীচে দেওয়া হলঃ-

ভ্রমণ > ভরমণ
গ্রাম > গেরাম
ব্রাহ্মণ > বরামণ
প্রকাশ > পরকাশ
গর্জিয়া > গরজিয়া
প্রবোধ > পরবুধ
পর্বত > পরবত
ত্রিভুবন > তিরভুবন
প্রভাতে >পরভাতে
ব্রত >বরত
গ্রাস > গরাস
দর্শন> দরশন

ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম অনুসারে আমরা এটিকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের পর্যায়ভুক্ত করতে পারি।

পরিশেষে বলা যায় “মহুয়া” পালাকে ভাষাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে এক অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এই পালাটিকে আস্বাদন করা যায়। এই পালাটির মধ্যে ভাষা ব্যবহারের নানান বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববঙ্গ তথা মৈমনসিংহের সাধারণ মানুষের মুখ দিয়ে অনর্গল যে ভাষা বেরিয়ে আসে সেই ভাষাই হল মহুয়া পালার ভাষা।

তথ্যসূত্র

শ, রামেশ্বর. (১৪১৯). *সাধারণ ভাষাবিঙ্গান ও বাংলা ভাষা*, কলকাতা: পুস্তক বিপনি.

সেন, চন্দ্র. দীনেশ. (২০২২). *গিরি,রত্ন দ্যুতি (প্রাসঙ্গিক আলোচনা). মৈমনসিংহ গীতিকা.* কলকাতা: প্রঙ্গাবিকাশ.

চক্রবর্তী, শ্রীবামনদেব. (২০১৮). *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ.* কলকাতা: মোহন প্রেস।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

শব্দার্থ অভিধা-লক্ষণায় নেই বাঁধা : ব্যঞ্জনায় অনন্য পূর্ব মেদিনীপুরের ধাঁধা

সুদীপ্ত সামন্ত
অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received 05/03/2023
Accepted 07/05/2024

Keywords:
লৌকিক ধাঁধা,
লোকায়ত সাহিত্য,
মঙ্গলকাব্য,
অভিধা,
লক্ষণা

Guest Editors
Agniv Dutta
Ratul Ghosh
Patitpaban Pal

Organised by: শব্দ /ʃɔbd̪o/

ABSTRACT

আজকের শিষ্টসাহিত্যের উৎসে রয়েছে লোকায়ত সাহিত্যে। সেই লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা লৌকিক ধাঁধা। সাহিত্যের অন্তর্নিহিত অর্থের ইঙ্গিত প্রথম খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল এই ধাঁধাতেই। শব্দের অর্থকে বুঝতে হলে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রেক্ষিত। অভিধায় শব্দের প্রাথমিক অর্থ ধরা থাকে। লক্ষণায় পুরোপুরি আভিধানিক অর্থ যেমন থাকে না তেমন তা আভিধানিক অর্থের একদম ধরাছোঁয়ার বাইরের বিষয়ও নয়। যেমন : 'গ্রামের মর্যাদা' বলতে কোনো এক গ্রামের মর্যাদা নয়, সেই গ্রামে বসবাসকারী মানুষের মর্যাদাই বুঝি। শব্দের অভিধা-লক্ষণা অতিক্রম করে ইঙ্গিতের দিকে নিয়ে যায় ব্যঞ্জনা। ধাঁধা আসলেএক ধরনের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভাণ্ডার। ধাঁধা কথাটি শিষ্টসাহিত্যে 'প্রহেলিকা' নামে পরিচিত। 'ধন্দ' বা 'ধন্ধ' থেকে ধাঁধা কথাটি এসেছে। আবার কারও কারও মতে 'দ্বন্দ্ব' থেকে এসেছে ধাঁধা কথাটি। ধাঁধাকে বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। লোকসাহিত্যের অন্য শাখাগুলির সঙ্গে ধাঁধার তুলনা করা সম্ভব। ছড়া এবং ধাঁধা—উভয়ই মৌখিক পরম্পরার উদাহরণ; উভয়েরই রচয়িতা অজ্ঞাত হয়। লোকশ্রুতিপথে ছড়া ও ধাঁধা চলে আসছে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে। প্রবাদ ও ধাঁধা উভয়ই লোকশ্রুতি নির্ভর এবং ব্যঞ্জনার্থক। উভয়েরই দুটি পক্ষ থাকে। প্রবাদের অন্যপক্ষ নীরব শ্রোতা হলেও ধাঁধার অপরপক্ষ সক্রিয় উত্তরদাতা। লোকসংগীতের মতোই ধাঁধা মৌখিক পরম্পরার ধারক ও বাহক। লোকসংগীতে যেমন ব্যঞ্জনা থাকে, তেমন ধাঁধাতেও ব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায়। লোককথা ও ধাঁধা—দুই-ই শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর। তবে ধাঁধা আকারে বেশ ক্ষুদ্র, সে তুলনায় লোককথার আয়তন যথেষ্ট বড়ো। তাই লোককথা তার শরীরে ধরে রাখে অসংখ্য ধাঁধা, লোককথার চরিত্রদের প্রায়ই ধাঁধাচর্চা করতে লক্ষ করা যায়। লোকশ্রুতি ও লোকস্মৃতি বেয়ে বহু যুগ পূর্ব থেকে ধাঁধা চলে আসছে আমাদের লোকসমাজে। মঙ্গলকাব্য লেখার অনেক আগে থেকেই ধাঁধারও চল ছিল, বলাই বাহুল্য। মৌখিক পরম্পরাজাত সেই ধাঁধাকে শিষ্টসাহিত্যের আঙিনায় এনেছেন মঙ্গলকাব্যের কবিরা। আমাদের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব মেদিনীপুরের প্রচলিত ধাঁধা ও অভিধা-লক্ষণায় পেরিয়ে অনন্য তার ব্যঞ্জনা।

email id:mesudiptasamanta@gmail.com

ভূমিকা

লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা লৌকিক ধাঁধা। কাব্যের অন্তর্নিহিত অর্থের ইঙ্গিত প্রথম খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল এই ধাঁধাতেই। লোকসংস্কৃতিচর্চা যারা করেন, তাদের পর্যবেক্ষণ—"পল্লিবাংলার সাধারণ মানুষ যেন নিজের সন্তানের শিক্ষার জন্য প্রতিদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে ধাঁধার মধ্যে সঞ্চিত করে রেখেছে। ...ধাঁধা পল্লির জনগণের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রশ্নের আকারে লিপিবদ্ধ করে। ধাঁধা হল পল্লির গণসমাজে অতিসাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার উপায়। ধাঁধা পল্লিবাংলার আপামর জনসাধারণের মনে জীবন ও জগৎকে জানার কৌতূহল সৃষ্টি করে।"১ সুদূর অতীত থেকে জগৎকে জানার এই অদম্য ইচ্ছাই ধাঁধাচর্চার পথকে করেছিল প্রশস্ত।

নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে আমরা প্রাচীন পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। ধাঁধার উদ্ভব কীভাবে হল, সে কথা বলতে গিয়ে নৃতত্ত্ববিদ জেমস জর্জ 'Golden Bough-iii' (London, 1890, page-121-122) গ্রন্থে ফ্রেজার জানাচ্ছেন যে, কোনো এক আদিম কালে আমাদের প্রপিতামহরা ধাঁধা উচ্চারণ করেছিল। ফ্রেজার সাহেবের কথায়, "The custom of asking riddles at certain seasons or on a certain special occasions is curious and has not yet, so far as I know, been explained."২ আবার ব্লুমফিল্ড মনে করেন, আদিম সমাজে যে ধাঁধাগুলি উচ্চারিত হত—তা খুব সহজ-সরল। ধীরে ধীরে যুগ যত এগিয়েছে, ধাঁধা তত জটিল আকার ধারণ করেছে। 'Brahminical Riddles' (1901, page-939) গ্রন্থে ব্লুমফিল্ড বলছেন, "From the olden times as an early exercise of the primitive mind in its adjustment to the world about it, comes the riddles...The fresher the vision, when the world was young, so much keener was the interest in the phenomena of life, and in the simple institution which surrounded man. All harmonies and fitness, all his discrepancies and inconsistencies attract the notice of the children and child-like men...As civilization advances they still sustain life but they grow more complicated, more conscious and exacting, as the simpler relations become common place, and interest in them fades and wears off."৩ প্রায় একই কথা শোনা যায় এনড্রিউ ল্যাং বক্তব্যেও, "They were very ancient and had been handed down, with a gradual refining, from ages of savagery to ages of civilization."৪

অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্তর মতে, "ধাঁধা আসলে এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভাণ্ডার; এদিক থেকে দেখলে একে প্রবাদেরই জ্ঞাতি বলে গণ্য করতে পারি।"৫

ধাঁধা গড়ে ওঠার বিভিন্ন ধারণা৬ সূত্রাকারে সাজালে দেখা যাবে—

১. সুদূর অতীতে বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে অন্য গোষ্ঠীর থেকে গোপন করার উদ্দেশ্যে সংকেতের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যে কথাবার্তা বলত—তা থেকে ধাঁধা উদ্ভব হতে পারে।

২. আদিম প্রপিতামহরা প্রকৃতির অলৌকিক শক্তিকে করায়ত্ত করার ভাবনা থেকে ধাঁধা উচ্চারণ করত। ধাঁধার সঙ্গে সর্বপ্রাণবাদ ধারণা থেকে পূর্বপুরুষপূজার মিল লক্ষ করা গেছে। মৃতদেহ সৎকারের পূর্বে ধাঁধা বলা হত এই কল্পনা থেকে যে, আত্মা সেই ধাঁধার জাল কাটিয়ে এসে কারওর ক্ষতি করতে পারবে না।

৩. ধাঁধা অনেক সময়েই আদিম মানবগোষ্ঠীর আগামী নেতা নির্বাচনের মাপকাঠি হয়েছে। আদিম গোষ্ঠীসমাজে কোনো বিশেষ পদ অধিকার করার আগে ধাঁধার উত্তর দেওয়া একপ্রকার বাধ্যতামূলক ছিল।

৪. লোকসমাজ ধাঁধার মাধ্যমে বুদ্ধিচর্চা করে আসছে প্রাচীন কাল থেকে।
৫. ধাঁধার মাধ্যমেই মানুষ সাহিত্যে ব্যঞ্জনা ব্যবহার করতে শিখেছে। বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে যায় যে সাহিত্য, সে-ই তো টিকে থাকে লোকস্মৃতিতে। ব্যঞ্জনাময় সাহিত্যের পথচলা শুরু ধাঁধার হাত ধরে।

শব্দার্থ বোঝার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রেক্ষিত। তবুও শব্দের অর্থকে আমরা মোটামুটি ভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি—
১। অভিধা : অভিধায় শব্দের প্রাথমিক অর্থ ধরা থাকে। অভিধানে আমরা শব্দের মুখ্যার্থ দেখতে পাই। "শব্দের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ প্রকাশিত হয় যে বৃত্তির বলে, তার নাম অভিধা।"৭
যেমন : 'গাছ' বললে চোখের সামনে সাধারণভাবে ভেসে ওঠে ডালপালা-ফুল-পাতা সহ বৃক্ষের চিত্র।

২। লক্ষণা : লক্ষণায় পুরোপুরি আভিধানিক অর্থ থাকে না, আবার আভিধানিক অর্থের একদম ধরাছোঁয়ার বাইরেও বিষয় নয় সেটি। "বাক্যের বা বাক্যাংশের অঙ্গীভূত কোনো শব্দের মুখ্যার্থ যদি ওই বাক্যের বা বাক্যাংশের অর্থের দ্বারা বাধিত (বাধাপ্রাপ্ত) হয় অর্থাৎ মুখ্য অর্থটিকে সমগ্র অর্থের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বলে মনে হয়, তা'হলে দেখতে হয় শব্দটির কোন্ অমুখ্য (গৌণ) অর্থ সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে। এইভাবের অমুখ্য অর্থ সৃষ্টি করার শক্তিও শব্দের আছে; এই শক্তি বা বৃত্তির নাম লক্ষণা।"৮
যেমন : 'গ্রামের মর্যাদা' বলতে সেই গ্রামে বসবাসকারী মানুষের মর্যাদাই বুঝি।

৩। ব্যঞ্জনা : শব্দের অভিধা এবং লক্ষণা অতিক্রম করে ইঙ্গিতের দিকে নিয়ে যায় ব্যঞ্জনা। "অভিধা এবং লক্ষণা আপন আপন ভাবে শব্দের অর্থ প্রতিপাদিত ক'রে যখন পরিক্ষীন হ'য়ে আসে অর্থাৎ আপন শক্তির সীমায় পৌঁছে বিশ্রান্তি লাভ করে, তখন যে-বৃত্তির বলে শব্দ নূতন অর্থের দ্যোতনা করে, সেই বৃত্তির নাম ব্যঞ্জনা।"৯
যেমন : "বিধাতার নির্মাণ-ঘর নাহিক দুয়ার।/যোগীপুরুষ তাহে আছে নিরাহার।।/যখন পুরুষ তাহে হয় বলবান।/বিধাতার ঘর ভাঙ্গা করে খানখান।।" এখানে 'ঘর' বলতে চার দেওয়াল, ছাদ, দরজা-জানালাযুক্ত বাসস্থানকে না বুঝিয়ে 'ডিম'কে বোঝাচ্ছে।

সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য

ধাঁধা কথাটি শিষ্টসাহিত্যে 'প্রহেলিকা' নামে পরিচিত। মনে করা হয়, 'ধন্দ' বা 'ধন্ধ' থেকে ধাঁধা কথাটি এসেছে। আবার কারও কারও মতে 'দ্বন্দ্ব' থেকে এসেছে ধাঁধা কথাটি। 'বাঙলা ধাঁধার ভূমিকা' গ্রন্থে অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক জানাচ্ছেন, "বাঙলার লোকসাধারণ প্রহেলিকা ও ধাঁধাকে অভিন্ন করে উভয়ের মধ্যে একটি সমীকরণ করে নিলেও মূলে এই দু'টি যে ভিন্ন পদার্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ...প্রহেলিকা হল, যে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তার বুদ্ধি ও মননের পরীক্ষা করা। ...ধাঁধা সেখানে জিজ্ঞাসা করা হয় কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তিকে রাজারূপে নির্বাচিত করার জন্য; কিংবা কোনো ইহজাগতিক বা আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা নির্বাচনের জন্য। কোনো-কোনো সময় বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী কিংবা পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনের জন্যও ধাঁধার ব্যবহার ছিল বা আছে। প্রহেলিকা কখনও-বা মুমূর্ষু পিতা-কর্তৃক পুত্রকে উপদেশ দানের ছলে কথিত হয়ে থাকে। অনেক লেখক আবার খাঁটি ধাঁধা বলতে হেঁয়ালিকেই বুঝিয়েছেন।"১০ তাহলে ধাঁধা কী? অধ্যাপক শীলা বসাক জানাচ্ছেন, "ধাঁধা শুধু ধন্দ লাগায় না, দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি করে। বস্তুত ধাঁধা একটি জটিল জিজ্ঞাসা, দুরূহ প্রশ্ন, আবার সমস্যাও। ধাঁধার স্বরূপ ধাঁধার ভাষাতেই নিহিত। আর্চার টেলর 'English Riddles from Oral Tradition' গ্রন্থে একটি ইংরেজি ধাঁধার উল্লেখ করেছেন :

‘When first I appear I seem mysterious,
But when I explained, I am nothing serious.’

ধাঁধাটির উত্তর ‘ধাঁধা’। প্রথম দৃষ্টিতে ধাঁধা রহস্যময় বলেই মনে হয়, কিন্তু তাৎপর্য বিশ্লেষণে সামান্য মনোযোগী হলে মীমাংসাটি ধরা পড়ে।”১১

ধাঁধার সংজ্ঞা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। Durga Bhagwat তাঁর ‘The riddle in Indianlite lore and literature’ (Bombay, 1965, page-1) গ্রন্থে বলেছেন, “The riddle incorporates a question primarily and an answer secondarily.”১২ অর্থাৎ ধাঁধায় প্রাথমিকভাবে রূপকার্থে একটি প্রশ্ন থাকবে, আর তার সঙ্গে থাকবে উত্তর। আবার জার্মান লোকবিজ্ঞানী Friedreich তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Geschichte des Rathesels’ (Dresdeu, 1860, page-6)-এ লিখেছেন, ধাঁধা হল “an indirect presentation of an unknown object in order that the ingenuity of the hearer or reader may be exercised in finding in out.”১৩ P. D. Beuchat তাঁর ‘Riddles in Bantu’ (The study of folklore, Alan Dundes , N.J., 1954, page 187) গ্রন্থে ধাঁধা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জানাচ্ছেন, “The main function of the riddle is an entertainment, and this is consciously recognized...The riddle also acts as an exercise of intellectual skill and quickness of wit, it becomes a test of memory with those riddles whose answers have to be learned by heart to be known.”১৪ আবার লোকসংস্কৃতিচর্চাকারী বিজ্ঞানী Georges ও Dundes তাঁদের ‘Toward A structural Definition of the Riddle’ (AJF. 76, 1963, page-113) বিষয়টি সহজে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন, “A riddle is a traditional verbal expression which contains one or more descriptive elements in opposition and which may be literal or metaphorical but contain no apparent contradiction.”১৫

ধাঁধাকে বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।১৬ অ্যাংলো-স্যাকসন শব্দ : Readin; ইংরেজি : Riddle (to give advice); সংস্কৃত : ব্রহ্মোদয়, প্রশ্নোত্তর কূট, প্রভালিকা, বিবাদ, গূঢ় হৃদয়ালিকা ইত্যাদি; পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে—ঝাড়গ্রাম : কউটো, ফোর; মেদিনীপুর : কাহিনি, হেঁয়ালি, ফলই, ফরই, কিচ্ছা, ঢক ইত্যাদি; বাঁকুড়া : ফড়ই; পুরুলিয়া : রাতকথা, দাঁতকথা; মুর্শিদাবাদ : হেঁয়ালি ইত্যাদি।

ধাঁধা প্রসঙ্গে বিভিন্ন গবেষকের বিভিন্ন আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা ধাঁধার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি—

এক। ধাঁধার উদ্ভব ঘটেছে সুদূর অতীতে। শিশুর মতো সহজ-সরল আদিম মানবসমাজই ধাঁধার জন্ম দিয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধা জটিল হয়েছে।

দুই। ধাঁধা মৌখিক পরম্পরা, এই লোকসাহিত্য চর্চা বা অনুশীলনের জন্য কমপক্ষে দু’জন ব্যক্তি প্রয়োজন। একজন প্রশ্ন করলে অন্যজন উত্তর দেবেন। পরস্পরের প্রতিস্পর্ধিতা ধাঁধাচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করে। এখানে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ দেখা যাওয়া সম্ভব নয়।

তিন। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ধাঁধারও রচনাকাল-স্থান এবং রচয়িতার নাম জানা সম্ভব নয়। দীর্ঘ মৌখিক পরম্পরায় ধাঁধা চলে আসছে লোকসমাজে।

চার। ধাঁধাচর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদের ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ে—এককথায় লোকশিক্ষা হয়।

পাঁচ। ধাঁধা যেমন প্রশ্নকর্তার রসবোধের পরিচয় দেয়, তেমন অনেক ধাঁধার উত্তর নির্মল হাস্যরস উপহার দেয়।

ছয়। ধাঁধা মাত্রই যেহেতু রূপক, সেহেতু উপমান এবং উপমেয় লক্ষ করা যায় স্বাভাবিকভাবে। দুটি ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার না করা অবধি এর ইঙ্গিত ধরা প্রায় অসম্ভব।

সাত। ধাঁধায় কিছু আপাত অর্থহীন শব্দ থাকে, এছাড়া ধ্বন্যাত্মক শব্দও লক্ষ করা যায়। ধাঁধায় ছড়ার মতো অন্ত্যমিল লক্ষ করা যায়।

আট। ধাঁধার একটি বড়ো গুণ তার সংহত প্রকাশ। যত সংক্ষেপে প্রশ্ন করা যাবে, ততই তা জটিল আকারে ধরা দেবে উত্তরদাতার কাছে।

নয়। ধাঁধায় যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন হয় এবং উত্তর দিতে পারলে বিশেষ গর্ব হয়, সেহেতু শিশু-কিশোরদের কাছে ধাঁধা বেশ আকর্ষক। তবে তাদের পক্ষে অত অল্প বয়সে বুদ্ধিদীপ্ত ধাঁধা সৃষ্টি করা একটু কঠিনই বটে। মনে রাখতে হবে লোকসাহিত্যের এই শাখাটি সচেতন শিল্পমনের রচনা।

দশ। ধাঁধার সঙ্গে ছড়া ও প্রবাদের যেমন অনেক মিল রয়েছে, তেমন বেশকিছু অমিলও রয়েছে।

লোকসাহিত্যের অন্য শাখাগুলির সঙ্গে তুলনা :

ছড়া ও ধাঁধা

ছড়া এবং ধাঁধা—উভয়ই মৌখিক পরম্পরার উদাহরণ; উভয়েরই রচয়িতা অজ্ঞাত হয়। লোকশ্রুতিপথে ছড়া ও ধাঁধা চলে আসছে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে। অন্ত্যমিল, শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রভৃতি থাকার কারণে ধাঁধা শুনতে অনেকটা ছড়ারই মতো। আবার ছড়ার মতোই আনুষ্ঠানিক ধাঁধাও লক্ষ করা যায়। ছড়ার মতোই ধাঁধায় কাহিনির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ছড়া ও ধাঁধা—উভয়ই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ছড়ার অন্যতম উদ্দেশ্য শিশুভোলানো। ধাঁধার প্রধান উদ্দেশ্য উত্তরদাতার বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়া।

প্রবাদ ও ধাঁধা

প্রবাদ ও ধাঁধা উভয়ই লোকশ্রুতি নির্ভর এবং ব্যঞ্জনার্থক। উভয়েরই দুটি পক্ষ থাকে। প্রবাদের অন্যপক্ষ নীরব শ্রোতা হলেও ধাঁধার অপরপক্ষ সক্রিয় উত্তরদাতা। প্রবাদ চিরকালই প্রবীণ মানুষদের আলোচনার বিষয়, ধাঁধা—শিশু-কিশোররাই খেলাচ্ছলে বলে থাকে। তবে, মনে রাখতে হবে ধাঁধা ও প্রবাদ উভয়েরই প্রধান বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্তি এবং উভয়ক্ষেত্রেই লোকসমাজের মস্তিষ্কচর্চা হয়। তবে প্রবাদে অল্প কথায় অনেক বড়ো বক্তব্য গোপন থাকে, ধাঁধা সেই রকম কোনো অর্থবাহী বৃহৎ বক্তব্য থাকে না। 'বাঙলা ধাঁধার ভূমিকা' গ্রন্থে অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক বিষয়টি সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন—"কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই (ধাঁধাটির উত্তর : ইঁচড় বা গাছপাঁঠা)। কিন্তু অনেক সময় কোনো অপদার্থ ও চেতনাহীন ব্যক্তিকে (যাকে কাটলে রক্ত-মাংস বেরোয় না) বোঝাতে

প্রবাদ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।”১৭ ধাঁধায় লোকসংসারের সুখের চিত্রই বেশি ধরা পড়ে; প্রবাদ সুখ-দুঃখ উভয়কেই ধরে রেখেছে তার সংক্ষিপ্ত কথনে।

লোকসংগীত ও ধাঁধা

লোকসংগীতের মতোই ধাঁধা মৌখিক পরম্পরার ধারক ও বাহক। লোকসংগীতে যেমন ব্যঞ্জনা থাকে, তেমন ধাঁধাতেও ব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায়। তবে লোকসংগীতের ব্যঞ্জনা থাকে শ্রোতার অন্তরে, কিন্তু ধাঁধার শ্রোতাকে অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে উত্তর দিতে হয়। লোকসংগীতের আকার ধাঁধার থেকে অনেক-অনেক বড়ো। বেশকিছু লোকসংগীত ধাঁধারই মতো অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক। নতুন ফসল তোলার আনন্দে দার্জিলিং এর নেপালিরা ‘ধান-নাচ’-এর অনুষ্ঠান করে, সেখানে প্রহেলিকাময় ‘জোয়ারী গান’ গাওয়া হয়। গ্রাম-বংলার তরজা গানে ধাঁধার মতো প্রশ্নোত্তরের রীতি লক্ষ করা যায়।

লোককথা ও ধাঁধা

লোককথা ও ধাঁধা—দুই-ই শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর। তবে ধাঁধা আকারে বেশ ক্ষুদ্র, সে তুলনায় লোককথার আয়তন যথেষ্ট বড়ো। তাই লোককথা তার শরীরে ধরে রাখে অসংখ্য ধাঁধা, লোককথার চরিত্রদের প্রায়ই ধাঁধাচর্চা করতে লক্ষ করা যায়। ধাঁধার যথাযথ উত্তর দিতে পারলে লোককথার (রূপকথা) নায়ক বিপদ থেকে পরিত্রাণ পায়, রাজকন্যাকে বিবাহ করার সুযোগ পায় আরও কত কী! লোককথার চরিত্ররা প্রায়ই নিজেদের অন্য সত্তায় রূপান্তরিত করে নিতে পারে, যেমন : রূপকথার কাহিনিতে রাক্ষসী হয়ে যায় সুন্দরী রানি। ধাঁধার চরিত্ররা অন্য রূপ ধারণ করতে না পারলেও অন্য বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে উপমিত হয়।

মঙ্গলকাব্যে ধাঁধা :

লোকশ্রুতি ও লোকস্মৃতি বেয়ে বহু যুগ পূর্ব থেকে ধাঁধা চলে আসছে আমাদের লোকসমাজে। মঙ্গলকাব্য লেখার অনেক আগে থেকেই ধাঁধারও চল ছিল, বলাই বাহুল্য। মৌখিক পরম্পরাজাত সেই ধাঁধাকে শিষ্টসাহিত্যের আঙিনায় এনেছেন মঙ্গলকাব্যের কবিরা। পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকপ্রিয় কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে একটি সাহিত্যিক ধাঁধা খুঁজে পাওয়া যায়—
“ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন শা নৃপতি তিলক।।”১৮

অধ্যাপক দীপঙ্কর মল্লিক ‘লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলা মঙ্গলকাব্য’ গ্রন্থে জানাচ্ছেন, “বিজয়গুপ্তের কাব্য রচনাকাল সংক্রান্ত এসব প্রহেলিকার সাংকেতিক ‘অঙ্কস্য বামাগতি’ অর্থাৎ দক্ষিণ থেকে বামে হিসাব করলে দাঁড়ায় এমন—

ঋতু=৬, শূন্য=০, বেদ=৪, শশী=১

--এই অর্থে ১৪০৬ শকাব্দ বা ১৪০৬+৭৮ অর্থাৎ ১৪৮৪ খ্রি.।”১৯

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ধাঁধার আরও দুটি পাঠান্তর২০ পাওয়া যায়—

১. “ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমিত।” অর্থাৎ, ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রি.।
২. “ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।” অর্থাৎ, ১৪০০ শকাব্দ বা ১৪৭৮ খ্রি.।

পঞ্চদশ শতাব্দীর আরেক মঙ্গলকাব্যকার বিপ্রদাস তাঁর মনসাবিজয় বা মনসামঙ্গলে কাব্য রচনার কালকে ধাঁধার২১ মাধ্যমে বলেছেন—

“সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।

নৃপতি হোসেন শাহা গৌরের প্রধান।।”
অর্থাৎ, ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪১৭+৭৮=১৪৯৫ খ্রি.।

ষোড়শ শতাব্দীর শিল্পসচেতন সাহিত্যিক মুকুন্দরাম এই অবিভক্ত মেদিনীপুরে বসে রচনা করেছেন তাঁর চণ্ডীমঙ্গলকাব্য। সেখানে বিভন্ন চরিত্র কথায় কথায় ধাঁধা বলেছে। ‘চণ্ডীর সহিত ফুল্লরার সাক্ষাৎ’ কাব্যাংশে ‘কোন জাতি কার কন্যা’ প্রশ্নের উত্তরে চণ্ডী ‘সত্য ভাষা’ বলেছেন হেঁয়ালি করে—“ইলাব্রত দেশে ঘর জাতি গো ব্রাহ্মণী।/শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী।।/বন্দ্যবংশ জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল।/ সাত সতা গৃহে মোর বিষম জঞ্জাল।।”২২

আবার, ‘চণ্ডীর পরিচয় দান’ কাব্যাংশে চণ্ডী আপন পরিচয় জানিয়েছেন সেই হেঁয়ালি করেই। দীর্ঘ সেই হেঁয়ালিতে মধ্যযুগের পুরুষের বহুবিবাহের খণ্ডচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় চণ্ডী বলছেন—“এতক্ষণে পরিচয় করি/আমার করম দুষী বসি গুপ্ত বারাণসী/স্বামী মোর জনমভিখারী।।/কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা/স্বামী তারে বন্দয়ে মস্তকে।/বরঞ্চ গরল খায় আমা পানে নাহি চায়/ভবন তেজিনু এই পাকে।।/গঙ্গা বড় সোহাগলী সদাই পাড়য়ে গালি/স্বামীর সোহাগ দরপে।/দেখিয়া পতির দোষ উঠিল পরম রোষ/লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে।।/বিষ কণ্ঠ মোর স্বামী সহিতে না পারি আমি/পঞ্চমুখে মোরে দেয় গালি।/একে সতীনের জ্বালা কত সহে অবলা/পরিতাপে হয়্যা গেনু কালী।।/সতীনের সম্মান দেখি বাড়ে অভিমান/লোকলাজে নাহি মেলি আঁখি।/দেখিয়া দারুণ সতা বিবাহ দিলেন পিতা/পিতৃকুলে হইলাম বিমুখী।।/খাও পর যত তুমি সকল যোগাব আমি/মোরে তুমি না বাসিহ ভিন্।/ সমরে কানন-ভাগে কিব বীরের আগে/আজি হৈতে সম্পদের চিন্।।/শতেক রাজার ধন অঙ্গে মোর আভরণ/ভুবন কিনিতে পারি ধনে।/সম্পদ অনেক দিব ভকতি কেবল নিব…”।২৩
চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ডে ‘পিতা পুত্রের মিলন’কালে পরিচয় প্রদানের সময় এসেছে একাধিক হেঁয়ালি।২৪

ধাঁধায় ভরা প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে শ্রীমন্ত মাতৃকলঙ্কমোচন করেছে। আমরা শ্রীমন্ত আর ধনপতির কথোপকথনে খুঁজে পাব সেই সব হেঁয়ালি—
১. শ্রীমন্তের প্রশ্ন : “কহ কহ অহে বন্দি তোমি কোন জাতি।/কি নাম তোমা কোন দেশে অবস্থিতি।।/কোন কুলে উৎপত্তি কিবা অভিধান।/তোমার দেশের রাজা কি তাহার নাম।।”
• ধনপতির উত্তর : “গন্ধবণিক জাতি দেশ গৌড় নাম।/বসতি মঙ্গলকোট উজবনী গ্রাম।।/দত্তকুলে উৎপত্তি নাম ধনপতি।/বিক্রমকেশরী মহীপালের ক্ষেয়াতি।।”
২. শ্রীমন্তের দ্বিতীয় প্রশ্ন : “বাপ পিতামহের কহ না বন্দি নাম।/কতেক দিবস বন্দি তেজিয়াছো গ্রাম।।/কি গোত্র তোমার বন্দি মাতা কার ঝি।/কহ মাতামহ তার কুল বটে কী।।”
• ধনপতির উত্তর : “রঘুপতি পিতামহ পিতা জয়পতি।/ভুবনে বিদিত বর্দ্ধমান উবস্থিতি।।/গোত্র দুর্ব্বাঋষি মোর মাতা চন্দ্রমুখী।/মাতামহ সোমচন্দ গোত্র কৌসিকি।।”
৩. শ্রীমন্তের তৃতীয় প্রশ্ন : “কয় জায়া তোমার জায়ার কিবা নাম।/কতেক দিবস বন্দি ছাড়িয়াছ গ্রাম।।/দুঃখ পাইলে প্রচুর দুঃখ পাইলে প্রচুর।/এথা হইতে উজানি নগর কতদূর।।”
• ধনপতির উত্তর : “শ্বশুর আমার বটে নিধি লক্ষপতি।/ইছানি নগরে দুই ভাইর বসতি।।/গোত্র কাশ্যপ তার দত্তকুলে স্থান।/দুই জায়া লহনা খুল্লনা অভিধান।।”
৪. শ্রীমন্তের চতুর্থ প্রশ্ন : “উজনি নগর বহু দিবসের পথ।/সিংহলে আইলে বন্দি কিবা মনোরথ।।/অকপটে কহ বন্দি নিজ অভিসন্ধি।/কি কারণে দ্বাদশ বৎসর আছ বন্দি।”

• ধনপতির উত্তর : “রাজার ভাণ্ডারে নাহি শঙ্খ চন্দন।/তরণী সাজিয়া আইনু দক্ষিণ পাটন।।/কালিদহে শতদল বসিয়া সুন্দরী।/গরাস করয়ে পুনু উগরিয়া করী।।/দেখি কৈল রাজা সনে প্রতিজ্ঞাপূরণ।/পরাজয় কারাগারে নিপুণ বন্ধন।”
৫. শ্রীমন্তের পঞ্চম প্রশ্ন : “যদি বন্দি হইলে সাধু দৈবের ঘটন।/পুত্র নাহি উদ্দিশ করয়ে কি কারণ।।/শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে দয়া।/কেমনে উদরে অন্ন দেয় দুই জায়া।।”
• ধনপতির উত্তর : ভাগ্য নাহি করি রায় কোথা পাব পো।/শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে মোহ।/কি দুসিব সহজে অবলা দুই জায়া।/গ্রহদোষে নরপতি নাহি করে দয়া।।”
৬. শ্রীমন্তের ষষ্ঠ প্রশ্ন : “যদি পুত্র নাহি বন্দি নাহিক দুহিতা।/অপেক্ষণ বিনে আছে কেমন বনিতা।।/ছাড়িলে মন্দির বন্দি কেমন সাহসে।/কেমনে যুবতি জায়া শূন্য ঘরে বৈশে।।”
• ধনপতির উত্তর : নাহি পুত্র বন্ধ্যা মোর প্রথম যুবতি।/কনিষ্ঠ বনিতা মোর ছিল গর্ভবতী।।/যখন তাহার গর্ভ হইল ছয় মাস।/সেই কালে নৃপাদেশে কৈল পরবাস।।”

এই কাব্যের ধনপতি উপাখ্যানের ‘প্রহেলিকা’ শীর্ষক অংশটি বেশ আকর্ষক। শুকপাখি রাজসভার পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সামনে হেঁয়ালিপূর্ণ যে প্রশ্নগুলি২৫ রেখেছিল তার মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি উল্লেখ করা যেতে পারে—
১. “বিধাতার নির্মাণ-ঘর নাহিক দুয়ার।/যোগীপুরুষ তাহে আছে নিরাহার।।/যখন পুরুষ তাহে হয় বলবান।/বিধাতার ঘর ভাঙ্গা করে খানখান।।” (উত্তর : ডিম)
২. “সিরস্থান নিবসে পুরের দুই সার।/ভালমন্দ সবাকার করয়ে বিচার।।/বিচার করিয়া সে রহে মৌনশালী।/পুরস্কার করে তার মুখে দিয়ে কালি।।” (উত্তর : চক্ষু)
৩. “পাষাণ জিনিয়া সেই অতি দৃঢ়কায়।/তুষার জিনিয়া সেই সুশীতল গায়।।/যখন পাত্রের সনে হয় দরশন।/সেইখানে হয় তার অবশ্য মরণ।” (উত্তর : মেঘ)
৪. “নীরেতে জনম তার নীরে তার কায়।/নীরকে দেখিলে পুন হানিতে ডরায়।।/আপনি বিকাতে সেই চিত্ত পরহিত।/হিঁয়ালি প্রবন্ধে বলে বুঝহ পণ্ডিত।।” (উত্তর : নদী)
৫. “বিষ্ণুপদে সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।/গাছ পল্লব নয় কিন্তু অঙ্গে পত্র হয়।।/পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু চারি দিবসে।।/মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।।” (উত্তর : পাখি)
সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্যে আটটি ধাঁধা (নারিকেল, চক্ষু-২বার, পয়োধর, পক্ষী, করকা, মধু ও চন্দ্র বিষয়ক) লক্ষ করা যাচ্ছে বরবেশি শিব এবং ঋষিপত্নীদের কথোপকথনে। শ্রী রায় ধাঁধার পরিবর্তে ‘প্রহেলিকা’ এবং ‘হেঁয়ালি’ শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। ধাঁধাগুলির উত্তরও শিব দিয়েছেন চাতুর্যের সঙ্গে। আমরা উদাহরণস্বরূপ নারিকেল বিষয়ক ধাঁধাটির২৬ উল্লেখ করতে পারি—

ঋষিপত্নীদের প্রহেলিকা : “যোগী নহে জটা ধরে তোমার লক্ষণ।/গঙ্গা নহে জল বহে এ তিন লোচন।।/নারী সম্বোধন মাত্র নহে স্ত্রীজাতি।/শস্য উপজে তাহা নহে সেই ক্ষিতি।।/হর, বুঝ প্রহেলিকা, হর, বুঝ প্রহেলিকা।/জিজ্ঞাসে তোমার একপাটলা বালিকা।।”

ভোলা মহেশ্বরের উত্তর : “শুন একপটলা তোমার এ প্রহেলিকা।/নাম কহিয়া দিলে দিবে কুমুদ-কলিকা।।/যেই অস্ত্র করে ধরে রেবতীর কান্ত।/তৃতীয় অক্ষরে তার কর ই-কারান্ত।/সেই তো বৃক্ষের ফল শুন গো সুন্দরী।।”
সপ্তদশ শতাব্দীর আরেক খ্যাতনামা কবি রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যরচনাকালকে২৭ মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, যা আসলে ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দকে নির্দেশ করে—“শাকে শীমে জড় হৈল যত

শাক হয়।/তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।।/রসের উপরে রস তায় রস দেহ।/এই শকে গীত হৈল লেখা করি নেহ।।"

ধর্মমঙ্গলকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ঘনারাম চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগের বাংলার লোকসমাজের মৌখিক পরম্পরাজাত ধাঁধার অনুসরণে দীর্ঘ চুয়াল্লিশ পঙক্তির প্রশ্নোত্তর রচনা করেছেন।

গণিকা সুরিক্ষার হেঁয়ালির উত্তর দিয়েছেন লাউসেন ও কর্পূর সেন। আমরা উল্লেখযোগ্য দুটি 'হেঁয়ালীর সন্ধি'র২৮ নজির দিতে পারি—

১. সুরিক্ষার প্রশ্ন : "নাস্তি মুখ মস্তকাদি নাস্তি হস্ত পা।/নাস্তিতু আকার ভূমে নাস্তি বাপ মা।।/নহে সেই জীবজন্তু কিন্তু অতি শক্ত।/আবেশে আহার করে মনুষ্যের রক্ত।।"

• কর্পূর সেনের উত্তর : চিন্তানল।

২. সুরিক্ষার প্রশ্ন : "খায় সে সহস্র মুখে পাক নাহি পায়।/উদরে আহার ভরে অস্থিরে বেড়ায়।।/তার প্রহারের ঘায় পরিত্রাহি ডাকে।/আহারে উগরে ফেলে তবে ছাড়ে তাকে।।"

• লাউসেনের উত্তর : তাঁতের সানা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আরেক ধর্মমঙ্গল রচয়িতা মানিকরাম গাঙ্গুলিও তাঁর কাব্যে সুরিক্ষার প্রশ্ন ও সেনভাইদের দেওয়া উত্তর উল্লেখ করেছেন। উল্লেখযোগ্য দুটি 'হেঁয়ালী সমস্যা'২৯--

১. সুরিক্ষার প্রশ্ন : "জীব নয় জন্তু নয় জীবনে বাস করে।/জীবন বিহীন হৈলে যথা তথা মরে।।/ জীবে যদি পরশে জীবনে টানাটানি।/ সত্য বলে সেই কে সুন্দর গুণমনি।।" (উত্তর : টোপাপানা)

২. সুরিক্ষার প্রশ্ন : "নটিনী জিজ্ঞাসে শুন শুন হে নাগর।/চতুর্ভুজ মূর্তি তার দেখিতে সুন্দর।।/শূন্য পথে সদা গতি সংস্কারের সার।/সুর নর সকলে প্রসাদ খায় তাঁর।/সদাই সন্তুষ্ট তায় সংহার কারণ।/সত্য বল সুনাগর সেই কোন জন।।" (উত্তর : শ্বেত মৌমাছি)

অবিভক্ত মেদিনীপুরের সুসন্তান রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর শিবায়ন কাব্য সমাপ্তির যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে মনে হয় আলোচ্য কাব্য রচনা শেষ হয়েছিল ১৬৩২ শকাব্দ বা ১৭১০ খ্রি. নাগাদ। রামেশ্বরের ইঙ্গিত৩০—"শকে হৈল্য চন্দ্রকলা রাম কৈল্য কোলে।/ বাম হৈল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে।।/সেই কালে শিবের সঙ্গীত হৈল্য সারা।/অবনীতে আল্য যেন অমৃতের ধারা।"

একইরকমভাবে অন্নদামঙ্গলের কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্য রচনাকাল সম্পর্কে যে ধাঁধার৩১ উল্লেখ করেছেন তা থেকে অনুমান করা যায় ১৬৭৪ শকাব্দে এই কাব্য রচনা করা হয়েছিল—"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।/সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।।"

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন মৌখিক পরম্পরাজাত ধাঁধাকে গুরুত্ব দিয়ে অনেক কবিই এইভাবে তাঁদের কাব্যে সাহিত্যিক ধাঁধা সৃষ্টি করেছেন। আজও শিষ্টসাহিত্যের পাশাপাশি লৌকিক ধাঁধা প্রচলিত পূর্ব মেদিনীপুরের লোকসমাজে।

পূর্ব মেদিনীপুরের ধাঁধা :

পূর্ব মেদিনীপুরের প্রচলিত ধাঁধাকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১. নর-নারী বিষয়ক : ক. দেব-দেবী বিষয়ক, খ. পৌরাণিক চরিত্র, গ. ঐতিহাসিক চরিত্র, ঘ. মানুষ ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষয়ক; ২. প্রকৃতি বিষয়ক : ক. আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ক, খ. উদ্ভিদ-লতাপাতা বিষয়ক, গ. পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ-মাছ বিষয়ক; ৩. লোকায়ত জীবনকেন্দ্রিক : ক. আত্মীয়-পরিবার কেন্দ্রিক, খ. খাদ্য ও পানীয় কেন্দ্রিক, গ. প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র বিষয়ক, ঘ. আচার-আচরণ-অনুষ্ঠান-ক্রিয়াকর্ম বিষয়ক; ৪. লোকশিক্ষা কেন্দ্রিক ও ৫. বিবিধ। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা

থেকে পাওয়া ধাঁধাগুলির অল্পকয়েকটি উল্লেখ করে এই জেলার লোকসমাজের সঙ্গে পরিচিত হব। আমাদের সংগৃহীত ধাঁধায় যে উত্তরগুলি পাওয়া গেছে—তা সবই ব্যঞ্জনাভিত্তিক।

নর-নারী বিষয়ক ধাঁধা

• আদি বর্ণ বলিব, না বলিব শেষ বর্ণ সেই/নিরাকার নিমস্তক ভেদমাত্র এই/মাঝের দুটি বর্ণে পাবে অপূর্ব রায়/তাঁর স্মরণ নিয়ে লোকে বিষ্ণুলোকে যায়! উত্তর : নারায়ণ।
• সূর্যবংশে জন্ম তাঁর, অজ রাজার নাতি/রাবণের শত্রু তিনি, সীতামায়ের পতি! উত্তর : রাম।
• পাঁচভাতারি কোন নারী ছিল ধরাতলে/বিশ্বশুদ্ধ লোক তারে সতী-সতী বলে! উত্তর : দ্রৌপদী।
• অহিংসা পরমধর্ম প্রচার যে করে/রাজ মুকুট সেই মানুষ হেলায় ত্যাগ করে! উত্তর : বুদ্ধদেব।
• আমি সবসময় তোমার চোখের সামনে উঠি আর বসি—আমি কে? উত্তর : চোখের পাতা।

প্রকৃতি বিষয়ক

• দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থেকে রাতের বেলায় জাগে/ঘর নেই বাড়ি নেই আকাশেতে থাকে—কে? উত্তর : চাঁদ।
• এক থালা সুপারি/গুণতে পারে কোনও ব্যাপারি? উত্তর:আকাশের তারা।
• সাঁঝবেলায় জন্ম তার, সকালে মরণ/মাথার উপরে সদা করে বিচরণ/স্বর্ণকায় মনোহর দেহের বরণ/এক পথে করে গতি সে কোন জন! উত্তর : তারা।
• কে ডোবে, কিন্তু জলে ভেজে না? উত্তর : সূর্য ডোবে (সূর্যাস্ত) কিন্তু জলে ভেজে না।
• ডানা ছাড়া উড়তে পারে, চোখ ছাড়া কাঁদতেও পারে—কে? উত্তর : মেঘ।

লোকায়ত জীবন কেন্দ্রিক

• কোন জিনিস মেয়েরা তার স্বামীরটা দেখতে পারে কিন্তু নিজের বাবার নয়? উত্তর : বিবাহ।
• কোন দেশে মানুষ নেই? উত্তর : সন্দেশ।
• কোন জিনিস ফ্রিজে রাখলেও গরম থাকে? উত্তর : গরম মশলা।
• একটুখানি জলে মাছ কিলবিল করে/কারোর বাপের সাধ্য নেই হাত দিয়ে ধরে—কী? উত্তর : ফুটন্ত ভাত।
• তিন জন ধরে, একজন করে/এমন করা করে, ফেনা তুলিয়ে ছাড়ে! উত্তর:উনুনে ভাত রাঁধা

লোকশিক্ষা

• কোথায় বুধবার আসে মঙ্গলবারের আগে? উত্তর : বাংলা অভিধানে।
• কোন ধান পড়তে লাগে? উত্তর : অভিধান।
• কী সে জিনিস যা লোককে দিলে আপনাকেই রাখতে হয়? উত্তর : প্রতিশ্রুতি।
• এটি পৃথিবীর সবার দরকার তবু সবাই দিতে চায়, কেউ নিতে চায় না! উত্তর : উপদেশ।
• কোন পথে যেতে নেই? উত্তর : বিপথে।

বিবিধ

• কোন মা ভাত দেয় না? উত্তর : সিনেমা।
• কোন ডিম চোখে দেখা যায় না? উত্তর : ঘোড়ার ডিম।
• কোন বনে বাঘ নেই? উত্তর : জীবন।
• বছরে তিনমাস রাতের শেষ প্রহরে/গান গেয়ে ঘুম থেকে জাগায় সবারে! উত্তর : বৈষ্ণব।
• একই প্রশ্ন, কিন্তু সবাই আলাদা আলাদা উত্তর দেয়—প্রশ্নটি কী? উত্তর : আপনার নাম!

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গ্রামগুলি দ্রুত বদলে যাচ্ছে, তবু তার অন্তরে রয়ে গেছে লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি এক অদ্ভুত টান। এখনকার ছেলে-মেয়েরা মূলত সময় কাটায় মোবাইলে মুখ গুঁজে। তবু, তাদের খেলার মাঠে কিংবা টিউশনি পড়ার ফাঁকে এখনও যে ধাঁধাগুলি নিয়ে আলোচনা হয়—তাতে এই

জেলার লোকায়ত জীবনের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়। বৈষ্ণবের গানে ঘুম ভাঙা থেকে খই ভাজা, মাছ ধরা, (চুলায়) উনুনে কাঠ জাল দিয়ে রান্না করা কিংবা শাঁখারির কাছে শাঁখা পরা—সবই চিত্রিত হয়েছে প্রচলিত ধাঁধায়। লোকসমাজকে জানতে চাইলে খুঁজে পেতেই হবে ধাঁধার ব্যঞ্জনাভিত্তিক উত্তর।

তথ্যসূত্র :

১। বসাক, শ. (২০২০). *বাংলার ধাঁধা : বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়* (নতুন সংস্করণ, পৃ. ১). কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স.

২। তদেব, পৃ. ৫.

৩। তদেব, পৃ. ৫-৬.

৪। তদেব.

৫। সেনগুপ্ত, প. (২০০২). *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ* (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৬৭). কলকাতা : পুস্তক বিপণি.

৬। তদেব, পৃ. ১৬৯.

৭। চক্রবর্তী, শ. (২০০৪). *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা* (পুনর্মুদ্রণ,পৃ. ২৩৯). কলকাতা : কৃতাঞ্জলি.

৮। তদেব, পৃ. ২৪০.

৯। তদেব.

১০। ভৌমিক, ন. (২০০৯). *বাঙলা ধাঁধার ভূমিকা* (নতুন সংস্করণ, পৃ. ২১). কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং.

১১। বসাক, শ. (২০২০). *বাংলা ধাঁধা : বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়* (নতুন সংস্করণ, পৃ. ২-৩). কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স.

১২। তদেব, পৃ. ১.

১৩। তদেব, পৃ. ২.

১৪।তদেব.

১৫। তদেব.

১৬। তদেব, পৃ. ৩-৪.

১৭। ভৌমিক, ন. (২০০৯). *বাঙলা ধাঁধার ভূমিকা* (নতুন সংস্করণ, পৃ. ৫৬). কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং.

১৮। বিশ্বাস, অ. (সম্পাদিত-২০২১). *কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল* (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১১৪). কলকাতা : নিউ বইপত্র.

১৯। মল্লিক, দ. (২০১৩). *লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলা মঙ্গলকাব্য* (প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৩৩). কলকাতা : দিয়া পাবলিকেশন.

২০। তদেব.

২১। তদেব, পৃ. ৩৪.

২২। মণ্ডল, স. (সম্পাদনা-২০১২). *শ্রী কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডিকামঙ্গলকাব্য* (নতুন সংস্করণ, পৃ. ৩৫৮). কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং.

২৩। তদেব, পৃ. ৩৬১.

২৪। মল্লিক, দ. (২০১৩). *লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলা মঙ্গলকাব্য* (প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১২৫-১২৬). কলকাতা : দিয়া পাবলিকেশন.

২৫। তদেব, পৃ. ১২৭.

২৬। তদেব, পৃ. ৩১৭-৩১৮.

২৭। তদেব, পৃ. ৩১৫.

২৮। তদেব, পৃ. ৪৬৭.

২৯। তদেব.

৩০। মণ্ডল, দ. (২০২০). *রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন* (পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ২১৪). কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ.

৩১। মল্লিক, দ. (২০১৩). *লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলা মঙ্গলকাব্য* (প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৪৬৮). কলকাতা : দিয়া পাবলিকেশন.

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শন

শিঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

বারুইপুর কলেজ

ARTICLE INFO

Article history:
Received 25/04/2023
Accepted 07/05/2024

Keywords:
ভাষা আন্দোলন,
ভাষা ও রাজনীতি,
জাতীয়তাবাদ,
ভাষার রাজনৈতিক ইতিহাস

Guest Editors
Agniv Dutta
Ratul Ghosh
Patitpaban Pal

Organised by: শব্দ /ʃɔbd̪o/

ABSTRACT

মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসের একটি অপরিহার্য এবং অনিবার্য অধ্যায় হল ভাষার প্রকাশ এবং বিকাশ। ভাষা হল সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে মানুষ তার ভাব প্রকাশ করে এবং অপর মানুষের সাথে দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত, বিতর্কের আদান প্রদান করে, এবং এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের থেকে ভিন্ন হয় এই ভাষার ভিত্তিতে, এই ভাষাই একটি সম্প্রদায়ের বাহক (Bearer) এবং ধারক (Sustainer)। অর্থাৎ ভাষা হল সেই শক্তিশালী মাধ্যম যা মানুষের স্বাতন্ত্রতার (Liberty)র ইঙ্গিত বহন করে আবার এই ভাষাই একটি সম্প্রদায়ের আধিপত্যের জন্য সন্মতি খোঁজে বিশেষত পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে যাকে আমরা বলি (Developed Countries) of the First World. এই ভাষাই, আবার অপরদিকে অনুন্নত এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর শোষণমূলক সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল থেকে অর্থাৎ (Colonial Exploitation & Colonial Enslavement) এর পরাধীনতার গ্লানি মোছানোর স্বপ্ন দেখায় যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আকারে মানব সভ্যতার ইতিহাসে Post Colonial Literature এর জন্ম দেয়। সুতরাং ভাষার ভূমিকা পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য দুই ধরনের দেশের ক্ষেত্রেই বিশেষ অর্থবহ ভূমিকা রয়েছে। এখানে একটি বিশেষ কথার উদ্রেক হয়। ভাষার ভিত্তি কি শুধু মাত্র মানুষের ব্যাকরণ চয়ণ এবং কিছু নির্দিষ্ট কাঠামো? ভাষার মূলে কি কোন আর্দশ, মতাদর্শের অস্তিত্ব নেই? একইভাবে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক দর্শনের কি কোন সম্পর্ক নেই? ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক দর্শনের এক নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান।

ভূমিকা

এই গবেষনাপত্রে আমি দুটি বিষয়ের আলোচনার উপর আলোকপাত করব। যথাঃ –

ক) ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক দর্শনের সম্পর্ক

খ) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঘটে যাওয়া ভাষা আন্দোলনের গোড়ায় যে রাজনৈতিক দর্শন অন্তর্নিহিত তার বিবৃতি।

আমি আমার গবেষণাপত্রের প্রথম বিষয়ের আলোচনার উপর আলোকপাত করার জন্য অগ্রসর হচ্ছি-

ক) Language Movements and Political Philosophy Interface :- অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক দর্শনের সংযোগ বা মিলনের রসায়ণ। রাজনৈতিক দর্শন হল মূলত দর্শনের সেই শাখা

email id:shinjana1981@gmail.com

যা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামতের ধারণাসমূহ এবং তর্কবিতর্কের সবথেকে বিমূর্ত বা Transcendental Elements নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে। রাজনৈতিক১ সিদ্ধান্ত কি হওয়া উচিৎ তার পথ দেখায়, অপরদিকে ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল কোন এক সম্প্রদায়ের অধিকারের কথা অথবা কোন দেশের স্বাতন্ত্রের কথা বলা। রাজনৈতিক দর্শনের মূল সমস্যা হল জনক্ষমতাকে কিভাবে সীমাবদ্ধ অথবা সীমিত করা যায়, যার ফলে মানুষের জীবনের মান উল্ল্যন করা সম্ভব এবং জীবিকা নির্ধরণ বজায় রাখা সম্ভবপর হয়। রাজনৈতিক দর্শনের প্রকৃতি হল অনেক বেশি তাত্ত্বিক এবং নীতিমানবাচক, এবং অধিবিদ্যার এই শাখা মূলত সাধারণ দর্শনের সেই দিকগুলোর প্রশ্ন খোঁজে যা নীতির পথ দেখায়, কি হওয়া উচিৎ, মূলত কিছু অনুমানের ভীতিতে এবং কিভাবে এর উদ্দেশ্য সাধিত হবে সেই পথের অনুসন্ধান করে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দর্শন হল সাধারণ দর্শনের সেই শাখা যা সমাজতত্ত্ব, সামাজিক নৃতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক, সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক জ্ঞানের ধারা। অপরদিকে ভাষা আন্দোলন বা ভাষার আধিপত্য বিস্তার করার যে লড়াই তা সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সুতরাং মানব সমাজকে নিয়ে দুজনের চিন্তাভাবনা আন্দোলিত হয়। রাজনৈতিক দর্শন মূলত, কি হওয়া উচিৎ তার পথনির্দেশ করে, অপরদিকে ভাষা আন্দোলন হয় বিশেষ কোন ভাষার আধিপত্যের অথবা কোন ভাষাকে মাধ্যম করে কোন বিশেষ মানবজাতির স্বাধীনতার কথা/স্বাতন্ত্রের কথা বলে, যা সংগ্রামের রূপ ধারণ করে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মানবসমাজকে মুক্ত করে। অর্থাৎ যদি আমরা Britannica কে অনুসরণ করি তাহলে বলা যায় যে “Political Philosophy may be viewed as one of the most important intellectual disciplines, for it sets standards of judgement and defines constructive purposes for the use of public power.” যে কোন প্রকারের বৌদ্ধিক অনুসন্ধান, অন্বেষণ যা ক্ষমতার উদ্দেশ্যর, তার যথাযথ নৈতিক ব্যবহারের কথা বলে, ক্ষমতা কোন পথে পরিচালিত হওয়া উচিৎ তার বিবেচনা করে – এই ধরণের আলাপ আলোচনা আজকের যূগে অনেক বেশি অথর্বহ, কারণ এখন মানবসভ্যতার সব থেকে বড় সাফল্য এবং সঙ্কট এই দুই হল আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি, যা মানবজাতিকে লাভবান করতে পারে অথবা ধ্বংসও করতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য হল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের যে শোষণমূলক নীতি, Mercantilist Policy of the British এবং the Unconditional Hegemony of English, English as an instrument to perpetuate the Imperial Authority of the British Monarchy অর্থাৎ পাশ্চাত্যের আধিপত্যের ইতিহাস এবং ফলশ্রুতি হিসাবে তৎসংলগ্ন দের জেগে ওঠার দুর্দমনীয় আকাঙ্খা, তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার আন্দোলন, সমাজে মনিষীদের আর্দশ তাঁদের বৌদ্ধিক নেতৃত্বে, একটি মাতৃভাষার উন্মেষ, বিকাশ, সমৃদ্ধি। ক্রমে সেই ভাষাই কিন্ত একটি স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যম, ধারক এবং বাহক অর্থাৎ BEARER & SUSTAINER অর্থাৎ মানবসম্প্রদায়ের জীবিকা নির্বাহ, তাদের অস্তিত্ব যাতে বিপন্ন না হয় তার দিকনির্দেশ দেয় সেই ভাষা আন্দোলন। অর্থাৎ রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েমে যেমন ভাষার ভূমিকার প্রাধান্য লক্ষ করা যায় ঠিক তেমন ২সেই রাজনৈতিক আধিপত্যের শোষণমূলক ‘রাজ’ কে প্রশ্নচিহ্নের এবং অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পেছনে একটু একটু করে জন্ম নেয়, জেগে ওঠে, তিল তিল করে বেড়ে ওঠে কোন এক মাতৃ্ভাষা যার কোলে জন্ম নেয় অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, কবিয়াল, নাট্যকার, যাত্রা সম্রাট যাদের লেখনি CHALLANGE জানায় পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াইকে, অর্থাৎ ভাষাই রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্ণধার হয়ে ওঠে। সুতরাং এরপরও কি আমরা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক দর্শনের এক বিশেষ সম্পর্ককে / রসায়ণকে লক্ষ না করে অথবা তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে পারি ? হয়ত না। মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে সাথেই ভাষার উদ্ভব, উন্মেষ, বিকাশ এবং তার আস্তে আস্তে ক্ষমতা দখল, গোটা বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তারের এক নির্মম খেলা এবং অপরদিকে মাতৃ্ভাষার জাগরণ তার উন্মেষ, বিকাশ, সাহিত্য রচনা, কবিতা এবং পরবর্তীকালে লেখার মাধ্যমে ভাষাকে অস্ত্র করে বিপ্লবের সূচনা।

ডঃ রাফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক - Department of Peace and Conflict Studies, University of Dhakaর মতে 'ভাষা হল একটি শক্তিশালী মাধ্যম মত প্রকাশের, শিক্ষকতা এবং অধ্যায়ণের।' ভাষার সাথে রাজনৈতিক দর্শনের সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা দুধরণের প্রবনতা লক্ষ্য করব। প্রথম অনেক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের উপর বলপূর্বক তাদের নিজেদের ভাষা আরোপ করতে পারে, এরফলে যারা সংখ্যালঘু তারা অবদমিত এবং শোষিত হতে পারে। অর্থাৎ এখানে ভাষা শোষণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধ যেখানে তামিল সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলীদের দ্বারা অবদমন করা হচ্ছিল। দ্বিতীয় ভাষার আরোপ প্রক্রিয়ার বিপরীত ধর্মী একটি প্রবনতা লক্ষ করা যায় যা মূলত প্রাচ্যের দেশগুলোর স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলে বিরাজমান ছিল। এই আন্দোলনগুলো মূলত মাতৃভাষার প্রতি আবেগ, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি থেকে উৎপন্ন হয় এবং ঔপনিবেশিক অবদমন তথা শোষণের বিরোধীতা করে। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং SELF-DETERMINATION এর অধিকারের সঙ্গে নিবিড় সম্পক ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ৭০ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস।

ভাষার এবং রাজনৈতিক দর্শনের সমীকরণের ইতিহাস

মানব সভ্যতার ইতিহাস দেখলে ভাষা এবং রাজনৈতিক দর্শনের এক ইতিবাচক সমীকরণ লক্ষ করা যায়। অর্থাত LANGUAGE TAKES THE FORM OF POLITICS AND POLITICS, POLITICAL PHILOSOPHY IS DRESSED EITHER IN THE FORM OF A DOMINANT HEGEMONIC LANGUAGE / NATURAL STANDARD LANGUAGE / LANGUAGE AIMING AT NATIONAL UNIFICATION / LANGUAGE THAT WANTS TO৩SUBJUGATE AND SUBORDINATE OTHER MINORITY LANGUAGES. John C. Maher তাঁর Multilingualism : A Very Short Introduction গ্রন্থে লিখেছেন জাতীয় সঙ্গীত মূলত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত – দেশের দাপ্তারিক ভাষায় লেখা হয়েছিল। Kenyaর জাতীয় সঙ্গীত Kiswahiliতে গাওয়া হয়। পূর্ব ইউরোপের দেশ Moldavaর জাতীয় সঙ্গীত সেই দেশের ভাষাকে প্রতিবিম্বিত করে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক Eric John Ernest Hobsbawn (1917 – 2012) মিশর দেশর Alexandriaতে জন্মগ্রহণ করেন, মূলত ঐতিহাসিক এবং একজন কমিউনিস্ট হওয়ার সুবাদে লক্ষ করেছিলেন যে পাশ্চাত্যে জাতীয় মানের বা স্তরের ভাষাগুলো জাতীয়তাবাদের ফসল। জাতীয় মানের ভাষা অথবা NATIONAL STANDARD LANGUAGES বলতে Chinese, English, Greek, Hindi-Urdu, Irish, Italian, Latin, Portugese ভাষাকে সনাক্ত করা হয়। জাতীরাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষার সাংকেতিক গুরত্বকে পরিলক্ষিত করা যায়। পাশ্চত্যে বৈপ্লবিক কাল অর্থাৎ AMERICAN WAR OF INDEPENDENCE (১৭৭৬), ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) এবং নেপোলিয়ন এর যুদ্ধ অভিযানের মুহুর্ত থেকেই জাতীয় পরিচিতির নির্মাণের প্রচেষ্টা চলে ভাষার সাহায্যে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি Theodore Roosevelt ১৯১৯ এ তাঁর 'Letter to The American Defense League' এ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন যা ইংরাজিকে একমাত্র ভাষার স্বীকৃতির কথা বলে কারণ আমেরিকান জাতীয়তাবাদ সেই সময় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং জাতির অপরিহার্য আবশ্যিকতা বলে অনুভূত হয়। অর্থাৎ Theodore Rooseveltএর ঘোষণা থেকে ভাষার আদর্শায়নের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে তখনকার মার্কিনি ইতিহাসের পাতায়। এই প্রক্রিয়াকে মূলত 'IDEALIZATION OF LANGUAGE' বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ENGLISH ONLY MOVEMENT' এর রাজনৈতিক দর্শনঃ- ১৬০৭ সালে ঔপনিবেশিকরা প্রথম আমেরিকায় পদার্পণ করে এবং সর্বপ্রথম আমেরিকান মাইগ্রেন্টস হিসাবে সনাক্ত হন। এই সময়কাল থেকে যদি কোন ব্যক্তি আমেরিকায় প্রবেশ করতেন তিনি মাইগ্রেন্ট হিসাবে চিহ্নিত

হতেন। ১৮৮০ সালে আমেরিকায় দ্বিতীয় অভিবাসন বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই প্রবণতাকে বলা হয় SECOND IMMIGRATION BOOM। এই BOOMএর আগে যে নাগরিকরা আমেরিকায় থাকত তারা পরবর্তীকালের অভিবাসীদের বিরোধীতা করে এবং অভিবাসী বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। আমেরিকান সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে একটি আক্ষেপের সুর ফুটে ওঠে-আমাদের দেশ বহুবিধ ধারণার সংগমস্থল, এই দেশ স্বাধীন ভাবনাচিন্তার, স্বাতন্ত্রতার, একতার আধার অথচ এই দেশে মানসিক সংকীর্নতা, RACIAL DISCRIMINATION, একটা MIGRANTS / DESCENDANTS OF MIGRANTS V/S MIGRANTS মানসিকতা। সমগ্র দেশে একটি ঘৃণার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল এবং একটি ‘ANTI-MIGRANT STIGMA’। এই প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে আমি ৪ ENGLISH ONLY MOVEMENT, THE SUBORDINATION OF MINORITY LANGUAGES THROUGH ICONIZATION AND ERASURE, THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে এবং ২০০২ সালের সাক্ষরিত NCLB আইনের পিছনে যে রাজনৈতিক দর্শন এবং ঔপনিবেশিবাদের আধিপত্তের রাজনীতি অর্ন্তনিহিত ছিল তার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

জনজীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইংরাজি ভাষার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ইংরাজিকে একটি আধিপত্তবিস্তারকারী/কর্তৃত্বপূর্ণ/প্রধান ভাষার মর্যাদা প্রদান করেছে। NATIONAL STANDARD LANGUAGES দের তালিকায় ইংরাজিভাষা অন্যতম একটি ভাষা যা আমি পূর্বেই উল্লখ করেছি। ইংরাজির বুৎপত্তিস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে অ্যাঙ্গো স্যাকসন এলিটরা যারা প্রধানত ইংল্যাণ্ডের জার্মেনিক বাসিন্দা পঞ্চম শতক এবং নর্মান বিজয়ের মাঝামাঝি সময়কালে মনে করতেন যে অনাহুত, অনাগত জনগোষ্ঠীদের ভাষা সর্বদাই একটি সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করবে। আন্তঃসাংস্কৃতিক আধিপত্তের গোড়ায় থাকে ভয় এবং Xenophobia অর্থাৎ বিদেশাতঙ্ক। অর্থাৎ একদিকে শুধুমাত্র ইংরাজি ভাষা আন্দোলনের হুংকার এবং অপরদিকে সংখ্যালঘু ভাষাদের অবদমন, অধিনতা – ICONIZATION এবং ERASURE বিলুপ্তিকরণ। এখানে উল্লখ্য যে সংখ্যালঘু ভাষা বা MINORITY LANGUAGES USA তে – Spanish 41.3 miilion (13.2%) Chinese 3.40 million (1.1%), Tagalog 1.72 million (Filipino অন্তর্ভুক্ত, Victnamese 1.52 million (0.5%) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ইংরাজিকে দেখা হল আমেরিকান পরিচিতির চিহ্ন হিসাবে। English became the Symbol the American Identity আসলে দেশীয় আদর্শকে বৈধতা প্রদান করা হয় একটি HISTORICAL LINEAR NARRATIVE এর মাধ্যমে যা মনে করত যে একমাত্র ইংরাজি ভাষাই দেশকে জাতীয় ঐক্যের উপাদান প্রদান করতে পারবে এবং সমগ্রদেশকে একটি যৌথ ভবিষতের পথ দেখাবে। Robert Phillipson এই প্রবণতাকে LINGUISTIC IMPERIALISM হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এর এক নেতিবাচক ফলাফল পরিলক্ষিত করা যায়। Valencia মনে করেন এর ফলে একটি ‘DEFICIT MODEL’ তৈরি হয় সংখ্যালঘুদের বৈশিষ্ট, সামাজিক সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে পৃথক হওয়ায় একটি ঘাটতি বা Deficit তৈরি হয় এবং সামাজিক অসাম্যের / Social Inequality কে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা চলে। ভাষা এবং নৃকুলজাত সংখ্যালঘুদের লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হয় না এবং এর ফলে “children’s stigmatization, নিম্ন আত্মবিশ্বাস, নিম্নমানের লেখাপড়ার এবং বৌদ্ধিক বিকাশের সম্ভাবনা, উচ্চতর শিক্ষায় অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ত্ব, নিম্নমানের সামাজিক–অর্থনৈতিক মর্যাদা। Robert Phillipson LINGUISTIC IMPERIALISM নামক গ্রন্থে একটি আকর্ষনীয় মন্তব্য করেছেন “The British Empire has given way to the Empire of English”। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন, “How can one relate the ৫
micro level of ELT (ENGLISH LANGUAGE TEACHING) professionaling to the macro level of global inequality ?” তিনি যথার্থই বলেছেন “ELT is also billion pound business

এবং Economist Intelligence Unit study of English এই ভাষাকে বর্ণনা করেছে ‘World Commodity’ হিসাবে। অর্থাৎ ‘বিশ্ব সামগ্রী’ হিসাবে ইংরাজিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৬০ এবং ১৯৭০ দশকের CIVIL RIGHTS MOVEMENTS ভাষা এবং নৃতাত্ত্বিক/নৃকুল জাত গোষ্ঠীগুলোকে মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবেশাধিকার প্রদান করে। CIVIL RIGHTS ACT 1964 prohibits discrimination on the basis of sex, color, national, origin and religion। সমগ্র মার্কিন জাতি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি George W. Bush একটি শিক্ষানীতি আরোপ করে - NO CHILD LEFT BEHIND ACT 2001 এবং আইন হিসাবে সাক্ষরিত হয় ২০০১ সালে। কিন্ত এই আইন দ্বিভাষিক অনুষ্ঠানসূচিকে প্রত্যাখান করে এবং ছা্ত্রছাত্রীদের বাধ্য করে শুধুমাত্র ইংরাজি পড়াশোনায়।

ইউরোপ

ইউরোপের ভাষা নিয়ে যত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ঘটেছে এবং এই ক্রিয়াকলাপের বুৎপত্তিতে যে রাজনৈতিক দর্শন অন্তর্নিহিত আছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হল আমাকে COUNCIL OF EUROPE এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই হবে। প্রথমেই এখানে উল্লেখ্য যে THE COUNCIL OF EUROPE এবং EUROPEAN COUNCIL এক নয়। The Council of Europe ১৯৪৯ এর ৫ই মে তে প্রতিষ্ঠিত হয় ১০টি পাশ্চাত্য ইউরোপীয় দেশ নিয়ে–যথা 1) BELGIUM, 2) DENMARK, 3) FRANCE, 4) IRELAND, 5) ITALY, 6) LUXEMBOURG, 7) NETHERLANDS, 8) SWEDEN, 9) NORWAY, 10) UNITTED KINGDOM। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০র মধ্যে ১৩টি দেশ প্রবেশ করে যথা Austria, Cyprus, Finland, West Germany, Greece, Iceland, Liechenstin, Malta, Portugese, San Masino, Spain, Switzerland এবং Turkey। ১৯৯০ থেকে ২০০৭এর মধ্যে Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia, Herzegorina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Latria, Lithuaria, Mildora, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, Russia, Estonia, Georgia, Hungary, Montenegro, Ukraine এই Councilএর সদস্য হয়। ১৯৯৪ সালে এবং ২০০৪এ Andorra এবং Monaco প্রবেশ করে। Council of Europe এর উদ্দেশ্য হল গনতন্ত্র এবং মানবাধিকার কে সংরক্ষণ করা এবং ইউরোপের ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করা আইনি, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বিষয়াদির সাহায্যে। Stephen Breidbach তাঁর লেখায় “Plurilingualism, Democratic Citizenship in Europe and the Role of English” এ বলেছেন গণতান্ত্রিক নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করতে হলে শিক্ষাব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ হবে Plurilingual Competance অর্থাৎ বহুভাষিক দক্ষতা। Polity Europeএর কল্যানার্থে এই দেশের সমগ্র মানব সম্পদকে ৬

অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অর্থাৎ Europe must follow the ‘Policy of Inclusion.’ Council of Europeএ যে রাজনৈতিক তর্কবিতর্কের উদ্ভব হয় তার মধ্যে থেকে সৃষ্টি হয় ইউরোপের ভাষা ভিত্তিক শিক্ষা নীতির উন্নয়নের এক পথনির্দেশিকা যেখানে বলা হয় গণতন্ত্রের এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য সুষ্ঠ ভাষা নীতি প্রয়োজন। The capacity and full opportunity to ones linguistic right is essential to democratic participation and any policies of social inclusion।

আফ্রিকা

আফ্রিকার ভাষা নীতি এবং রাজনৈতিক দর্শনের বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের অনিবার্যরূপে বিশ্বজনীন ভাষা হিসাবে ইংরাজির আধিপত্য এবং তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশ আফ্রিকার বিদ্যজন এবং বৌদ্ধিক মণ্ডলীর ইংরাজি ভাষায় পারদর্শিতা এবং এই পারদর্শিতাই হল ঔপনিবেশ দেশের

সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি। অর্থাৎ আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি The WESTERN PARADIGM OF INTELLECTUAL DISCOURSEএ। এখানে উল্লেখ্য Pierre Bourdieuর Theory as Method যা মূলত 'The Bourdieu Paradigm' নামে বৌদ্ধিক মহলে পরিচিত। Union of South Africaতে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিরা ঠিক করেন ইংরাজি এবং আফ্রিকান ভাষা হবে দুই দাপ্তরিক ভাষা। বিশ্ব ব্যবস্থাপকতত্ত্ব বা Pierre Bourdieuএর SOCIAL REPRODUCTIONএর Approachএ ভাষা ভিত্তিক বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণার আঙ্গিক Claytonএর পর্যালোচনায় পাওয়া যায় থাকে 'Constructive Structuralism' বলে। ২০০০ সালে Clayton তাঁর বক্তব্যে বলেন যে বিশ্বের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চল বা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভাষা বিতরণ ভাষার গ্লোবাল ইকোলজির দ্বারা প্রভাবিত হয়। Ayo Bamgbose, Emeritus Professor for Linguistics & African Languages, Ibadan University, Nigeria মনে করেন আফ্রিকান ভাষার বর্ধিত ব্যবহারের পথে বেশ কিছু বাঁধা বর্তমান। আফ্রিকান ভাষা বর্তমানে এখনো সেভাবে উন্নত নয় এবং কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যবহৃত হলে লেখাপড়ার মান এবং মর্যাদা হ্রাস পাবে। অধ্যাপক Bamgbose মনে করেন যে আফ্রিকান ভাষার সুষ্ঠ আরোপের পিছনে একটি অনিহা কাজ করেছে যা মনে করে ইংরাজির আধিপত্য এবং স্থিতিবস্থা রক্ষায় Union of South Africaর কল্যাণ অন্তর্নিহিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য AFRICAN ACADEMY OF LANGUAGES (ACALAN) ভাষা নীতি এবং ভাষা পরিকল্পনার দায়ভার প্রাপ্ত এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা। ২০০৬-২০০৭ সাল, YEAR OF AFRICAN LANGUAGES হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। Sudanএর Khartoumএ ২৩-২৫ জানুয়ারী একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়।৭

ভারত

১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এবং পরে ভারতবর্ষ হল একটি বহুভাষিক দেশ এবং এখানকার মানুষ একাধিক কথা বলে এবং একাধিক ভাষা বোঝে যার অর্থ হল বিভিন্ন হস্তলিপি, পাণ্ডুলিপির ব্যবহারের প্রচলণ রয়েছে। ভারতের ২০১১ সালের CENSUS DOCUMENTS অনুসারে ১২১টি ভাষা মাতৃভাষা হিসাবে কথিত হয় ভারতীয় সংবিধান ২২টি ভাষাকে OFFICIAL অর্থাৎ SCHEDULED LANGUAGES হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৩৪৪(১) এবং ৩৫১ নং ধারা অর্থাৎ অষ্টম তফসিল নিম্নে উল্লেখিত ভাষাগুলোকে OFFICIAL LANGUAGE হিসাবে চিহ্নিত করেছে। যথাঃ- i) Assamese, ii) Bengali, iii) Bodo, iv) Dogri, v) Gujarati, vi) Hindi, vii) Kannada, viii) Kashmiri, ix) Konkani, x) Maithili, xi) Malayalam, xii) Manipuri, xiii) Marathi, xiv) Nepali, xv) Oriya, xvi) Punjabi, xvii) Sanskrit, xviii) Santhali, xix) Sindhi, xx) Tamil, xxi) Telugu, xxii) Urdu। ছয়টি ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার উপাধি দেওয়া হয়েছে। যথাঃ- Kannada, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu ভাষা।

ভারতে ভাষাকে বিভিন্ন ভাষা পরিবারে শ্রেনীবদ্ধ করা হয়েছে। যথা- i) Dravidian ii) Indo-Aryan এবং iii) Sino-Tibetan. Bodo ভাষা হল Sino-Tibetan ভাষা যা উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে প্রচলিত এবং এই ভাষায় কথোপকথন করে প্রায় ১.৪ মিলিয়ন মানুষ। ভারতের ২৮টি রাজ্য ভাষাগত সিদ্ধান্তে সংগঠিত হয়েছে ১৯৫০ সাল থেকে। ১৯৫৩ সালে দক্ষিণপূর্ব রাজ্য অন্ধ্রপ্রবেশ গঠিত হয় Telegu ভাষীদের জন্য।

এছাড়া ভারতের ১৯৪৯ সালের সংবিধানে ইংরাজি ভাষা ব্যবহারের উল্লেখ্য আছে। অনুচ্ছেদ ৩৪৩(এ) বলা হয়েছে "the official language of the Union shall be Hindi in Devanagari Script and for a period of 15 years from the commencement of the constitution the English Language shall continue to be used for all official purposes of the Union

for which it was being used immediately before such commencement : provided that the president may during the said period by order authorize the use of the Hindi Language addition to the English Language.
বাংলাদেশঃ- ১৯৪৭ সালের PARTITION এর পর পূর্ব বাংলার নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের ভারত অথবা পাকিস্তানের থাকার ইচ্ছা প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পছন্দের দেশ বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। মানুষ তখন পাকিস্তানকে বেছে নেয়। কিন্তু তাদের আশা ভরসা আঘাত পায় যখন দেখে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ নিজেদের সুবিধার্থেই আর্থনীতিক নীতি, কৌশল তৈরি করছে। ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত রাজ্যের ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে ৮প্রস্তাবিত করেন করাচিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি Mohammad Ali Jinnah দেশের ঐক্য বজায় রাখার জন্য শুধুমাত্র একটি ভাষাকে অর্থাৎ Urdu কে অনুমোদন করার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে Dhaka শহরের Race Course তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেনঃ "Let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language… Therefore so far as the state language is concerned, Pakistan's shall be Urdu." ছাত্রদের আবেগ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে। এর ফলে SECTION 144 নং ধারায় পাকিস্তান সরকার যেকোন ধরণের মিছিলকে আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ছাত্ররা এই নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে শান্তিপূর্বক মিছিল এ বের হয়। Medical College Hostelএর সামনে পুলিশ খোলাখুলি গুলি চালায় সরকারি নিষেধাজ্ঞার অছিলায়। কিছু বিরোধী ছাত্রের মৃত্যু হয় যাদের মধ্যে Rafiquddin Ahmed, Mohammad Salauddin, Abul Barkat, Abdus Salam এবং Abdul Jabbarএর নাম উল্লেখ্য।

উপসংহার

মানব সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে অনিবার্যরূপে জড়িয়ে আছে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। ভাষা কোন দেশে হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক আধিপত্যের সংকেত আবার অন্য কোন দেশে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের / জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের মূল চালিকা শক্তি। সুতরাং যে ভাষা পাশ্চাত্যে আধিপত্যের হাতিয়ার সেই ভাষাই প্রাশ্চ্যে অথবা পাশ্চাত্যে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্রতার বা স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল উদ্দীপনা জোগানোর উৎস। সুতরাং ভাষার সঙ্গে রাজনৈতিক দর্শনের যে সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরণের তা স্পষ্ট। ভবিষতে এই আলোচনাটি আরো সমৃদ্ধ করার প্রয়াস নিয়ে আমার এই গবেষণাপত্র লিখলাম।

তথ্যসূচী

Articles 210 and 243 of the Constitution of India, 1949.
Official Languages Act, 1963, Section 3.

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, F. (2019). *The Struggle in Bangladesh*. Critical Asian Studies.

Baker, S. (ed.) *Language Policy : Lessons from Global Models*. Monterey, CA: Monterey Institution of International Studies.

Bamgbose, A. (2000). *Language and Exclusion*. Hamburg: LIT Verlag.

Barbour, S. & Carmichael, C. (2002). *Language and Nationalism in Europe*. Oxford: Oxford University Press.

Harbert, W. McConnell-Ginet, S. Miller, A. & Whitman, J. (ed.). (2009). *Language & Poverty*. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Hasan, Z. (1994). *The Separation of East Pakistan – The Rise and Realization of Bengal Muslim Nationalism*. Karachi, Pakistan: OUP.

Hill, J.H. (2008). *The everyday language of white racism*. Wiley Blackwell.

Maher, John. C. (2017). *Multilingualism*. United States of America: OUP.

Ritzer, G. (2003). *Contemporary Sociological Theory and it's Classical Roots : The Basics*. New York: McGraw-Hill.

Robbins, D. (2019). *The Bourdieu Paradigm : The Origins and Evolution of an Intellectual Social Project*. Manchester University Press.

Starkey, H. (2002). *Democratic Citizenship, Languages, Diversity and Human Rights*. Council of Europe: Strasbourg.

Talukdar, M. (1980). *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*. Dhaka, Bangladesh: Bangladesh Books International Limited.

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

ছন্দপাঠের ক্লাস: সংকেততত্ত্বের আবহে

রিমি ঘোষ দস্তিদার
পি আর ঠাকুর গভর্নমেন্ট কলেজ

ARTICLE INFO

Article history:
Received 09/06/2023
Accepted 06/05/2024

Keywords:
ছন্দ,
ছন্দরীতি,
পাঠ্য এবং পাঠপ্রতিম,
সংকেততত্ত্ব

Guest Editors
Agniv Dutta
Ratul Ghosh
Patitpaban Pal

Organised by: শব্দ /ʃɔbd̪o/

ABSTRACT

ছন্দ মানুষের মুখের ভাষার বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ভাষা অনুযায়ী ছন্দের চলন বদলে যায়। আবার ভাষার ভিতরেও ভাষীর ব্যবহারের উপর ছন্দের তারতম্য নির্ভর করে। সেটা আটপৌরে ভাষা বা সাজানো-গোছানো ভাষাই হোক অর্থাৎ কবিতা, বক্তব্য, পাঠ যাই হোক না কেন! আজকের আলোচনা কবিতা কেন্দ্রিক। কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণে গতানুগতিক ছন্দরীতি মূলত ব্যাকরণ নির্ভর। যেখানে নির্দিষ্ট নিয়মের কাঠামোতে মাত্রা সংখ্যার বিচারে ছন্দ নির্ণয় করা হয়। অথচ ছন্দ ভাষার এমনই এক আনম্য উপাদান যা শুধুমাত্র মাত্রা নির্ভর নয়, বরং পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গ নির্ভর। আটপৌরে ভাষার ক্ষেত্রে ছন্দের গতিশীলতার সাথে পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গের সহাবস্থান অনুধাবন করা যায় কারণ সেক্ষেত্রে ভাষিক উপাদানের চলনের সাথে বক্তা-শ্রোতার মধ্যে যোগাযোগের এক তাৎক্ষণিক বন্দোবস্ত তৈরি হয় এবং যোগাযোগের মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলির যোগসূত্রের পরম্পরা বহন করতে ছন্দ এবং অনুষঙ্গের ঐ বোঝাপড়াটা জরুরী। এই গবেষণা পত্রে আমরা লতম্যানের (১৯৯০) পাঠ্য এবং পাঠপ্রতিমের ধারনাকে কাজে লাগাবো কবিতা এবং তার ছন্দের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে, যেখানে একটা টেক্সট অনুদিত হয় পাঠকের চেতনায়, পাঠকের সংস্কৃতিগত গ্রহনযোগ্যতায়। আমাদের প্রশ্ন: ছন্দ বিশ্লেষণ তাহলে আদৌ কি ব্যাকরণের নিয়ম মেনে গ্রহনযোগ্যতা পেতে পারে? যদি পায়, তাহলে পাঠকের উপলব্ধি ছন্দে অংশ নেবে কীভাবে? প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আসরে নামবে সংকেততত্ত্ব।

ভূমিকা

ছন্দ মানুষের মুখের ভাষার বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ভাষা অনুযায়ী ছন্দের চলন বদলে যায়। আবার ভাষার ভিতরেও ভাষীর ব্যবহারের উপর ছন্দের তারতম্য নির্ভর করে। সেটা আটপৌরে ভাষা হোক। বা সাজানো-গোছানো ভাষাই হোক অর্থাৎ কবিতা, বক্তব্য, পাঠ যাই হোক না কেন! আজকের আলোচনা কবিতা কেন্দ্রিক। কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণে যে গতানুগতিক ছন্দরীতি মেনে চলা হয়, সেই ছন্দ-রীতি মূলত ব্যাকরণ নির্ভর। যেখানে নির্দিষ্ট নিয়মের কাঠামোতে মাত্রা সংখ্যার বিচারে ছন্দ নির্ণয় করা হয়। অথচ ছন্দ ভাষার এমনই এক আনম্য উপাদান যা শুধুমাত্র মাত্রা নির্ভর নয়, বরং পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গ নির্ভর। আটপৌরে ভাষার ক্ষেত্রে ছন্দের গতিশীলতার সাথে পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গের সহাবস্থান অনুধাবন করা যায় কারণ সেক্ষেত্রে ভাষিক উপাদানের চলনের সাথে বক্তা-শ্রোতার মধ্যে যোগাযোগের এক

email id:rimigd@gmail.com

তাৎক্ষণিক বন্দোবস্ত তৈরি হয় এবং যোগাযোগের মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলির যোগসূত্রের পরম্পরা বহন করতে ছন্দ এবং অনুষঙ্গের ঐ বোঝাপড়াটা জরুরী। কিন্তু কবিতার সাথে পাঠকের যে বোঝাপড়াটা তৈরি হয়, সেখানে বাহ্যিক জগতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে পাঠক বা কবিতার বা উভয়ের তাৎক্ষণিক যোগাযোগ নির্বাহের দায়ভার থাকে না। কবিতা এবং পাঠকের একটা নিজস্ব বৃত্ত থাকে যার মধ্যে চলতে থাকে এক স্বতন্ত্র যোগাযোগ। আর এখানেই ছন্দের ভূমিকা গভীরভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ।
যোগাযোগ বলতে মোটা দাগের সংজ্ঞায় আমরা যদি শুধুই ভাষা বুঝি, তাহলে বলতে হয় আমাদের ধারণায় মস্ত এক ফাঁক থেকে যায়। ভাষার শরীরে সিগনিফায়ার, সিগনিফায়েড এবং সাইন নামক উপাদানগুলির যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার এক আন্তর্জাল তৈরী হয় এবং সামগ্রিক ভাবে মানুষের বোধের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে, তার পাশাপাশি ভাষার বাইরেও এমন কিছু উপাদান ছড়িয়ে থাকে, যারা সংকেতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সকল উপাদানের হয়তো কোনো আক্ষরিক অবয়ব নেই কিন্তু সংকেত ভাষ্যের মধ্যে দিয়ে তারা ঐ কমিউনিকেশনের গ্রহনযোগ্যতাকে নির্ধারিত করে। আটপৌরে ভাষায় যেমন শব্দ-বিশেষের উল্লেখ, আবেগের অভিব্যাক্তি অনুষঙ্গের কাঠামো অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে যোগাযোগের পরিধি নির্মাণ করে, কবিতার ছন্দের ক্ষেত্রেও সেই উপাদান গুলো নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।
ছন্দ কী? বাংলা ভাষায় ছন্দের রীতি-নীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। পাঠকেরা সেই বিষয়ের সাথে অবগত ধরে নিয়েই আমরা সংকেততত্ত্বের আবহে ছন্দের চলন সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করছি। মানুষের ভাষার ক্ষেত্রে যোগাযোগের ধারণাটি রয়েছে, সেই প্রসঙ্গে সস্যুর (১৯১৬) দেখিয়েছেন, সংকেতক এবং সংকেতিতের মধ্যে একটা বিমূর্ত সম্পর্ক কাজ করে। অন্যদিকে জেকবসন (১৯৬০) দেখালেন, যোগাযোগের একটা নির্দিষ্ট পরিকাঠামো রয়েছে যেখানে একজন বক্তা শ্রোতার কাছে একটা বার্তা পাঠায় এবং সেটা নির্দিষ্ট কোনো অনুষঙ্গের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট কোড হিসেবে তৈরি হয়ে বক্তা-শ্রোতা উভয়ের মধ্যেই এক ধরনের পারস্পরিক বোধগম্য যোগাযোগ তৈরি করে। এই দুই ধারণাকে মাথায় রেখে আমরা লতম্যানের (১৯৯০) পাঠ্য এবং পাঠপ্রতিমের ধারনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি কবিতা এবং তার ছন্দের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে, যেখানে একটা টেক্সট অনুদিত হয় পাঠকের চেতনায়, পাঠকের সংস্কৃতিগত গ্রহনযোগ্যতায়। এখানে অনুবাদ ভাষা থেকে ভাষায় নয়। স্থান থেকে স্থানে, বোধ থেকে বোধে।
দৈনন্দিন ভাষার মাধ্যমে যখন যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরী হয়, তখন শুধু ভাষা নয়, ভাষার ভিতরে বাইরে এবং ভাষার সাথে জড়িয়ে থাকা সংকেতের নানাবিধ ভূমিকা থাকে। সেখানে শুধুমাত্র ভাষার ব্যাকরণের সাহায্যে যোগাযোগের বোধগম্যতা তৈরী করা সম্ভব নয়। যে কোনো বস্তু বা ধারণা ব্যক্ত করার জন্য প্রতিটি ভাষায় নির্দিষ্ট সংকেতক তো রয়েছেই। যেমন গাছ বলতে গাছের একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরী হয়, কাঠ বলতে কাঠের একটা সামগ্রিক ধারণা তৈরী হয়। মানুষ বললেও মানুষের একটা সামগ্রিক ধারণা তৈরী হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো যোগাযোগের পরিমন্ডলে শুধুমাত্র সামগ্রিক ধারণা দিয়ে ভাষার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না। ভাষায় যাকে সংকেতক হিসেবে দেখানো হচ্ছে, সেই সংকেতকেরও পারিপার্শ্বিক ব্যাখ্যা থাকে। সেই পারিপার্শ্বিক ব্যাখ্যা নির্ধারিত হয় সংকেতকের আশে-পাশে থাকা অন্যান্য সংকেতকের ব্যক্তার্থের উপর। ধরে নেওয়া যাক, গাছ শব্দটি বসিয়ে কয়েকটি বাক্য, শব্দবন্ধের উদাহরণ দেখা যাক।

১.

ক. আমাদের বাড়িতে একটা পেয়ারা গাছ আছে। (গাছের সাথে 'পেয়ারা' শব্দের যোগে গাছের বৈশিষ্ট্যটি অধিক মাত্রায় প্রকট।

খ. ঝড়ে অনেক গাছ ভেঙে গেছে। (গাছের সাথে 'অনেক' শব্দের যোগে কোনো নির্দিষ্ট গাছ চোখের সামনে আসে না। তেমনি 'ভেঙে' শব্দের উপস্থিতিতে গাছের গঠন সংক্রান্ত দ্বন্দ্বেরও একটি অবকাশ থেকে যায়। যেখানে গাছ অপেক্ষা গাছের ক্ষয়ক্ষতির ধারণা প্রবল হয়)
গ. একটি গাছ, একটি প্রাণ । ('একটি' শব্দের যোগেও কোনো নির্দিষ্ট গাছের ধারণা তৈরী হয় না বরং প্রাণ শব্দের যোগে একটি সতেজ গাছের ধারণা মনে আসে।)
ঘ. গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান । (এখানে খুব স্বাভাবিক ভাবেই চারা গাছের ধারণা মাথায় আসে কারণ গাছ 'লাগানো'-র সাথে বৃক্ষজাতীয় ধারণার যোগ তৈরী হয় না।
ঙ. ঠিক একই ভাবে পুরোনো স্কুলের পুনর্মিলন উৎসবে গিয়ে কথা ওঠে যখন- এমা! ঐ গাছটা নেই এখন আর? মনে আছে ওখানে বসে টিফিন পিরিয়ডে কি ধুন্ধুমারটাই না বাঁধাতাম আমরা!
তখন গাছের সংকেতন শব্দার্থের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক মুহূর্ত, অনেক আবেগকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। যেখানে ভাষা শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে ওঠে না। ভাষার ব্যাপ্তি একটি বৃহত্তর যোগাযোগের আন্তর্জালকে প্রস্তুত করে তোলে। শুধুমাত্র ধারণা এবং ধ্বনিচ্ছবিকে জুড়ে দিয়েই ভাষার সংকেতকগুলি সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। প্রতিটি সংকেতকের একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচয় থাকে।

এবার আসি কবিতার কথায়:

২.

ক) চাঁদ নেই, জ্যোৎস্নার অমলিন জ্বালা নেই, তবু
কী এক বিপন্ন আলো লেগে আছে এ মাঠের আঁধারের মুখে।
(বিনয় মজুমদার, নক্ষত্রের আলোয়)

খ) আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে ॥
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২ক) এবং ২খ) নমুনা দুটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় , এক্ষেত্রেও মোটা দাগের শব্দ দুটির মধ্যে ব্যাকরণগত ফারাক এই যে একটি সম্বন্ধ পদ ২(ক) আরেকটি বিশেষণ ২(খ)। অর্থগত পার্থক্য আভিধানিক ভাবে কিছু নেই। কিন্তু শব্দ দুটির অভিব্যাক্তির তফাৎ রয়েছে। জ্যোৎস্না শব্দটির আশেপাশে যখন বিপন্ন শব্দটি ঘোরাফেরা করে, তখন জ্যোৎস্না সেই অনুষঙ্গের বাইরে বেরিয়ে যায়, যে অনুষঙ্গের সাথে মাতাল সমীরণের যোগ থাকে। সুতরাং শব্দ দুটির ছন্দের শৈলীবিচারেও তারতম্য ঘটতে বাধ্য।

শব্দেরা (সংকেতক হিসেবে দেখছি যাদের) যেমন আটপৌড়ে ভাষা নির্মাণ করে, তেমনই তারা কবিতাও নির্মাণ করে। আটপৌড়ে ভাষার ক্ষেত্রে শব্দের সাথে অনুষঙ্গের অঙ্গাঙ্গিক যোগাযোগ যেমন এক ধরণের নিত্যতা, কবিতার ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হওয়ার অবকাশ নেই। অথচ কবিতা নিয়ে যখন চর্চা চলে, ছন্দের গতি-প্রকৃতি নিয়ে যখন বিশ্লেষণ চলে, তখন শব্দ কি শুধুমাত্র ধ্বনিগুচ্ছ রূপেই নির্ধারিত

হয়? সে যে আসলে সংকেতক, সে যে নির্দিষ্ট অভিব্যাক্তি নিয়ে উপস্থিত হয় কবির মনে এবং পাঠকের অনুশীলনে, সেই সংকেতনের ওজন মাপা হয় কী দিয়ে?

লৎম্যান (১৯৯০) পাঠ্যের তিনরকম কার্যকারিতা দেখিয়েছেন। প্রথমত, সৃজনশীলতা। দ্বিতীয়ত পাঠ্যের শৈল্পিক দিক এবং তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক স্মৃতি ঘনীভূত করার ক্ষমতা। প্রতিটি পাঠ্যের অর্থ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে। অর্থ সৃষ্টি করা বলতে বোঝানো হয়, দুই বা ততোধিক কোডের (সংকেতের) মাধ্যমে নতুন তথ্য আহরণ করা। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, দুই বা ততোধিক কোড বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? প্রথমত, ভাষা থেকে ভাষায় অনুবাদের কথা যদি বলি, সেক্ষেত্রে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় একটা পাঠ্যের যখন স্হানান্তর ঘটে, শুধু ভাষিক মাধ্যমের বদল ঘটে না। সংস্কৃতির বদল ঘটে। পারিপার্শ্বিকতার বদল ঘটে। ফলে গ্রাহক বা পাঠকের কাছে সেই পাঠ্য নতুন এক ধরণের বোধ নিয়ে পৌঁছায়। আসলে প্রতিটি ভাষার প্রতিটি সংকেতকের এক-একটি নিজস্ব পরিচয় থাকে। সেই সংকেতক যখন অন্য সংকেতকের চেহারায় নিজেকে প্রবেশ করায়, তখন আভিধানিক সূত্র ধরে তার অর্থনির্দেশ খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগে না ঠিকই কিন্তু তার প্রায়োগিক অবস্থানের সঠিক ঠিকানা পেতে অনেকগুলি অর্থের স্তর তৈরী করতে হয়। নমুনা (৩) এর দিকে নজর রাখি-

৩.

“আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলঙ্গীর ঢেউ-এ ভেজা বাংলারি সবুজ করুণ ডাঙ্গায়” –

“I will return again, loving the river, field of Bengal
On the green melancholy land of Bengal, drizzled by Wave of Jalangi”

খেয়াল করে দেখুন, দুই পাঠ্যের সামগ্রিক অর্থ অনুসন্ধান করতে বেগ পেতে হবে না, কিন্তু মাঠ ও ক্ষেতের সূক্ষ পার্থক্য বাংলায় যত সহজে এবং সাবলীলভাবে ধরা দেয়, অন্যভাষায় সেই পার্থক্য ধরতে পারা অতটা সহজ নয়। ঠিক একই ভাবে সবুজ করুণ ডাঙ্গার বাঙ্ময় প্রকাশ বাঙালী পাঠকের কাছে যতটা পরিচিত, অন্য ভাষীর কাছে সবুজ ডাঙার অর্থ সহজবোধ্য হলেও করুণ ডাঙার ধারণা তৈরী করতে গেলে পাঠ্যকে ভাষাতাত্ত্বিক সীমানা অতিক্রম করে সংকেততত্ত্বের কাছে পৌঁছাতে হয়। এবং শুধুমাত্র এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে নয়, এই স্থানান্তর ভাষার মধ্যেও ঘটতে থাকে। এক পাঠ্যধারা থেকে অন্য পাঠ্যধারায়। যেমন কোন উপন্যাস যখন চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে। বৃষ্টির ধারাপাত লেখকের লেখনীতে যেভাবে পাঠকের মনন অব্দি পৌঁছায়, চলচ্চিত্রের নির্মাণে বৃষ্টির প্রতিবিম্বন দর্শক হয়ে ওঠা পাঠকের চেতনা অধিকার করে অন্য আঙ্গিকে। আবার পাঠক থেকে পাঠকেও বদলে যায় শব্দের অভিব্যাক্তি। যে বাঙালী পাঠক বাংলার সামগ্রিকতার সাথে নিজেকে আত্মস্থ করে নিয়েছে, তার কাছে ৩. এর পাঠ্যটি যে অনুষঙ্গে বিচরণ করবে, যে বাঙালী পাঠক শুধুমাত্র ভাষিক পরিচয়ে বাঙালী কিন্তু সংস্কৃতিতে ভিন্ন মনস্কতা অনুসরণ করে, তার কাছে এই পাঠ্যের প্রকাশে তফাত ঘটতে বাধ্য। কবিতায় ছন্দপাঠের যে রীতি আবহমান কাল ধরে চলে আসছে, সেখানে ছন্দ বিশ্লেষণ অর্থেই ধ্বনির মাপ, দলের মাত্রা, পর্বের বিন্যাস ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়। ছন্দপাঠের আলোচনায় কোনো সময়ই শব্দের অভিব্যাক্তি নিয়ে কথা ওঠে না। ব্যাকরণের নিয়ম সীমাবদ্ধ হয়ে যায় বাক্য, পংক্তি ইত্যাদির কাঁটাছেড়া বিশ্লেষণে।

৪.

কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি/ অন্ধের কন্ঠের গান আগমনী

কীভাবে ছন্দ বিশ্লেষণ শেখানো হয় এই পঙক্তিটির?

২	১	১	১		১	১	১	১	২	১	১
কল	লো	লে	কো	লা	হ	লে	জা	গে	এক	ধ্ব	নি
২	২	২	২	২	১	১	১	১			
অন্	ধের	কন	ঠের	গান	আ	গ	ম	নী			

বলা হয় পংক্তিটি কলাবৃত্ত ছন্দরীতিতে অবস্থান করে। কারণ কলাবৃত্ত ছন্দের রীতি অনুযায়ী মুক্ত দল এক মাত্রা এবং রুদ্ধ দল দুই মাত্রার। সেই মাত্রা মেপে ৪/৪/৪/২ মাত্রার পর্ব বিন্যাস হয়। কলাবৃত্ত ছন্দরীতিতে পংক্তিটি মানিয়ে যায় বলে ছন্দ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ভাবতে হয় যে পংক্তিটির মধ্যে শব্দবন্ধের যে ব্যবহার রয়েছে তাদের অর্থ এবং অভিব্যাক্তির প্রকাশে, সেখানে শুধুমাত্র সূত্র বসিয়ে পর্ববিন্যাসের সমতা বজায় রাখা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অন্ধের কন্ঠের গান 'আগমনী'-র সুরাচ্ছন্নতার সামগ্রিকতাকে কোনো ভাবে কি ভেঙে দেয় না পর্ব বিন্যাসের বলপ্রয়োগ?
আরেকটা নমুনার দিকে চোখ রাখা যাক।

৫.

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে/
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে/
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা/ শ্যামগম্ভীর সরসা।

এই ছত্রের ছন্দবিন্যাস করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হিমসিম খাওয়ার মতো অবস্থা হয়। কেন? ছন্দরীতির নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম ধরে এগোতে গেলেও বার বার হোঁচট খেতে হয়। অথচ কোনো এক প্রকারে ছন্দবিন্যাস ঠিক মতো মিলিয়ে দিতে না পারলে পরীক্ষার জাঁতাকলে ছন্দ বিশ্লেষণের ফল শূন্য। তাহলে সমস্যাটা ঠিক কোথায়? ছত্রটির পরতে পরতে এতটাই শৈল্পিক আঙ্গিক, যে এই আঙ্গিককে নিয়মের ফাঁসে বেঁধে নেওয়া মুশকিল হয়ে যায়। লৎম্যানের (১৯৯০) বক্তব্য অনুযায়ী পাঠ্যের দ্বিতীয় কার্যকারিতা। কবি যখন এই ছত্র সাজাচ্ছেন, প্রকৃতির সাজসজ্জার সাথে মিলিয়ে নিচ্ছেন নিজের শব্দের অনুভূতি, তখন যে ছন্দের বিপুল শক্তিকে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন এই পাঠ্যে, সেই বিশালতাকে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণের রীতিতে বাঁধা বড়ই দুষ্কর। তাই আমরা বার বার আটকে যাই। মনে হয়,

এখানে ১ মাত্রা কেন দুই বসালে ক্ষতি কী? আবার পুরো ছত্র ঘুরে এলে দুই- এক কোথায় যেন হারিয়ে যায়। শঙ্খ ঘোষ (২০১৭) কবিকাহিনী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, কোনো কবিতাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করতে গেলে এ ধরণের ভ্রান্তি তৈরী হয়। কারণ কবিতার সেই অংশ একটি দীর্ঘ শিল্পের অংশ। কবিতার মধ্যের উপলব্ধি, প্রতীক্ষা, উচ্ছাস, রূপ-রহস্য দুটো বিচ্ছিন্ন পংক্তির ছন্দবিচারে ধরা কি আদৌ সম্ভব? শিল্পবোধ যদি মুক্তিরই এক রূপ হয়ে প্রতিভাত হয় এবং পাঠ্য তার শৈল্পিক সত্তাকে অস্বীকার করে যেতে না পারলে ছন্দই বা কীভাবে বাঁধা পড়ে নিয়মের আগলে?

পরিশেষে যে পাঠ্যের তৃতীয় দিকটি নিয়ে আলোচনা করতে হয়, যাকে লৎম্যান বলছেন সাংস্কৃতিক স্মৃতি ঘনীভূত করার ক্ষমতা। এখানে পাঠ্যকে আমরা দুই তরফ থেকে দেখতে পারি। সৃষ্টি করছেন যিনি আর গ্রহন করছেন যিনি। সৃষ্টির মূহুর্ত পাঠ্যের মধ্যে বন্দী হয় সৃষ্টি কর্তার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আর গ্রাহকের কাছে সেই পাঠ্যের হয়ে-ওঠার মূহুর্ত বন্দী হয় তার পারিপার্শ্বিক অবস্থান দিয়ে। দুই ক্ষেত্রেই অনুষঙ্গের গ্রহনযোগ্যতা সবেচেয়ে বেশি। একটি পাঠ্যের বহু পাঠক থাকে, বহু পাঠকের বহুবিধ অস্তিত্বের প্রকাশ থাকে। ফলত পাঠ্যের সাংস্কৃতিক রূপায়ণ কখনোই একটি স্তরে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বহুস্তরীয় উপলব্ধির সমাবেশে একটি পাঠ্য নির্মিত হয়।

৬.

যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি
ঝড় এসেছে, ওরে, এবার ঝড়কে পেলেম সাথি ।।

রবীন্দ্রনাথের এই পাঠ্যের সৃষ্টি সুরুলে। বোলপুরের একটি গ্রাম। সময় ভাদ্রমাস। পাঠ্য সৃষ্টির মুহূর্তের সাথে কবির নিজস্ব আলাপ জড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক শক্তির বিপুল ছন্দোময়তায়। বিচিত্র তার গতিপথ। একাকীত্বের সাথে মিশে যাচ্ছে বিশ্বচেতনার ব্যাপকতা। পাঠক যখন সামনে টেনে নিচ্ছেন এই পাঠ্য, পাঠ্য কবির ব্যাক্তিগত সীমারেখা ছাড়িয়ে পাঠকের হয়ে উঠছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সব পাঠক একই অভিপ্রায় নিয়ে গ্রহন করবেন এই পাঠ্যের মর্মার্থ? যে পাঠক ঝড়ের পথে একলা হাঁটেন নি, তার অন্তরের ক্ষরণ আর যে পথিক নির্জন, নির্নিমেষ অন্ধকারে ঝড়ের সাথে পথিক হয়েছেন, তার এই পাঠ্যে বিচরণ কি এক হয়? ছন্দ যদি পাঠ্যের সাথে ওতপ্রোত সত্তায় জড়িয়ে থাকে, তাহলে তার নির্বাহের পথ আলাদা হবে না কেন?

ছন্দ নিয়ে প্রথাগত যে চর্চা চলে আসছে, সেখানে ভাষাতাত্ত্বিক বৃত্তে ভাষিক উপাদানের গঠনগত নির্মাণের উপর নজর থাকে বেশি। কিন্তু একটি ভাষিক উপাদানের অস্তিত্ব শুধুমাত্র তার ভাষাতাত্ত্বিক গঠন দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। সংকেততত্ত্ব আসরে নামে ঠিক এই জায়গাতেই। একমাত্রিক উপস্থাপন দিয়ে কোনো ভাষিক উপাদানের সামগ্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। লৎম্যান (১৯৯০) যে সেমিওস্ফিয়ারের ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন, সেটি এমন একটি বলয় যেখানে ভাষার বহুমাত্রিকতাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। সেমিওস্ফিয়ারের ভিতর যে উপ-কাঠামো গুলি থাকে, সেগুলি স্থানাঙ্কের একটি সাধারণ ব্যবস্থায় সংগঠিত থাকে। কালিক বা সময়গত অক্ষে অবস্থান করে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং স্থানিক অক্ষে অবস্থান করে আভ্যন্তরীণ পরিসর, বাহ্যিক পরিসর এবং দুইয়ের মাঝের সীমানা। একটি পাঠ্য যখন তার পাঠকের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, অর্থাৎ যোগাযোগের একটি বলয় তৈরী হয়,

তখন অনেকগুলি সম্ভাব্য বিকল্পের সম্ভাবনা তৈরী হয়। সেই বিকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে সেমিওস্ফিয়ার।

সংকেততত্ত্বের পরিসরে আত্মবিবরণকে চূড়ান্ত নির্বাহ বলে স্বীকার করা হয়। লৎম্যান (১৯৯০) সংস্কৃতিকে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন তার কারণ হল সংস্কৃতি মানুষের এক ধরনের স্বরচিত শিল্প যা বিচ্ছিন্ন নয় কিন্তু স্বতন্ত্র। এবং ভাষার নির্বাহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যিনি পাঠক, যিনি গ্রাহক, তিনি কীভাবে পাঠ্যের সাথে সংযুক্ত হবেন, সেটা একান্ত ভাবেই তার সংস্কৃতি নির্ভর। লেখক যেমন সৃষ্টি করছেন, পাঠকও একটা সমান্তরাল সৃষ্টির পথে হাঁটেন। দুই সৃষ্টির মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই কিন্তু নতুন এক হয়ে-ওঠা আছে। এই নতুনত্বকে বার বার গ্রহন করতে হবে। শুধুমাত্র কবিতার সারসংক্ষেপ বা মর্মার্থের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় নয়, কবিতার ছন্দপাঠকেও উত্তীর্ণ করতে হবে সেই আঙ্গিকে যেখানে যান্ত্রিক ছন্দোময়তার শিকল নয়, বরং ভাষ্যের বহুমুখী বয়ানে। পাঠকের সাথে সেই বয়ানের যে যোগাযোগের সেতু স্থাপন হয়, লৎম্যানের ভাষায় সেখানে সাংস্কৃতিক উপাদানের আদানপ্রদান ঘটে। এক অভিযোজনের বৃত্ত তৈরী হয়। আর সেখানেই পাঠ্যের যথার্থ প্রকাশ।

তথ্যসূত্র

Lotman, J. (১৯৯০). *ইউনিভার্স অফ মাইন্ড: সেমিওটিক থিওরি অফ কালচার.* ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস.

ঠাকুর, র. (১৯৮৯). *রবীন্দ্র রচনাবলী. চতুর্থ খন্ড.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশনা.

মজুমদার, বি. (২০০৭). *শ্রেষ্ঠ কবিতা.* পঞ্চম সংস্করণ.কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

দাস, জী. (২০১৭). *শ্রেষ্ঠ কবিতা.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

ঘোষ, শ. (২০১৭). *কবিকাহিনী. ছন্দোময় জীবন.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

‘ম্যাস্কুলাঁ-ফেমিনাঁ’-র চিত্রনাট্যের অনুবাদ: দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম পেরিয়ে লেখ্য মাধ্যমে অনুপ্রবেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

অগ্নিভ দত্ত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:

Received 13/04/2023

Accepted 07/05/2024

Keywords:

উৎস টেক্সট,

লক্ষ্য টেক্সট,

চিত্রনাট্য,

আপেক্ষিক সাম্য

Guest Editors

Agniv Dutta

Ratul Ghosh

Patitpaban Pal

Organised by: শব্দ /ʃɔbd̪o/

ABSTRACT

অনুবাদ-কর্মে ভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য- একথা মাথায় রেখেও অনুবাদের ক্ষেত্রে জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ইতিহাস, প্রথা, মূল টেক্সট এবং অনূদিত টেক্সটের ভিতরকার রাজনৈতিক ও সমাজ-অর্থনৈতিক সম্পর্ক, তাদের মধ্যকার স্থান-কাল ও সমাজ-বাস্তবতাজনিত ব্যবধান, অনুবাদকের সচেতন অথবা অবচেতন হস্তক্ষেপজনিত কারণে টেক্সটের বিনির্মাণ এর সম্ভাবনা- ইত্যাদি বিষয়সমূহের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা চলে না। এই পেপারে জাঁ লুক গোদার পরিচালিত ম্যাস্কুলাঁ-ফেমিনাঁ চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের ইংরেজি অনুবাদ এবং সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়-কৃত বাংলা অনুবাদকে পাশাপাশি রেখে অনুবাদরীতির নৈর্ব্যক্তিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষার পাশাপাশি উপরোক্ত বিষয়গুলির ভূমিকার পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

অনুবাদ সোর্স-টেক্সট এবং টার্গেট-টেক্সট, অর্থাৎ উৎস ও লক্ষ্য-টেক্সটের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। অনুবাদক উৎস-টেক্সটকে সুচারুরূপে নিরীক্ষণের মাধ্যমে তার ভাষা ও শৈলীগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, চরিত্রায়ন, তাদের মুখের ভাষা, পারস্পরিক সম্পর্কের ওঠাপড়া ইত্যাদির নির্মোহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ্য-টেক্সটে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত অবস্থায় পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করবেন- এই হলো অনুবাদের মৌলিক, স্বীকৃত নীতি। অনুবাদক উৎস-টেক্সটের ভাষাতাত্ত্বিক ও শৈলীগত বৈশিষ্ট্যসমূহকে লক্ষ্য-টেক্সটে সার্থকভাবে পুনঃনির্মাণ করতে সক্ষম হলেন কি না- এটিই আবহমান কাল ধরে অনূদিত টেক্সটের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হিসেবে উঠে এসেছে। অনুবাদ প্রক্রিয়ায় দুইটি-টেক্সটের আপেক্ষিক সাম্যের যে চিরাচরিত ধারণা প্রচলিত রয়েছে, তা কী পরিমাণে গৃহীত বা বর্জিত হবে, তা অনুবাদকের সচেতন সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। উৎস-টেক্সট এবং লক্ষ্য-টেক্সটে ব্যবহৃত দুইটি পৃথক ভাষা দুইটি পৃথক সংস্কৃতির অংশ; ফলে অনুবাদের সময় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিমিশ্রণের প্রশ্নটিকেও অবহেলা করা চলে না। যদিও বাখতিনের (২০০৩) মতে, অনুবাদ প্রক্রিয়ায় দুই পৃথক সংস্কৃতির বিমিশ্রণ তাদের নিজস্বতার পরিপন্থী নয়, বরং এই বিমিশ্রণকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করা আবশ্যিক।

email id:agniv.rs.ju@gmail.com

গবেষণা-সংক্রান্ত প্রশ্ন

অনুবাদ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী দুইটি টেক্সটের আপেক্ষিক সাম্যের ধারণা, ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভেদজনিত দ্বান্দ্বিক প্রতিবেশ, অনুবাদকের সচেতন বা অবচেতন হস্তক্ষেপ ইত্যাদি অনূদিত টেক্সটের অটোনমির প্রশ্নটিকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। চিত্রনাট্য অনুবাদের ক্ষেত্রে এই অটোনমির প্রশ্নটি জটিলতর আকার ধারণ করে; কারণ এক্ষেত্রে লক্ষ্য-টেক্সট অর্থাৎ অনূদিত টেক্সট একটি হলেও মূল চিত্রনাট্য ও অনূদিত টেক্সট এর মধ্যবর্তী ক্ষেত্রটিতে নির্মিত চলচ্চিত্রটি অবস্থান করে এবং অনুবাদের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। ফলে উক্ত অনুবাদ আর কেবলমাত্র চিত্রনাট্যের অনুবাদ থাকে না, বরং নির্মিত চলচ্চিত্রটিই দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম থেকে লেখ্য মাধ্যমে পুনঃনির্মিত ও প্রতিস্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠে আসে- অটোনমি তুমি কার? চিত্রনাট্যের? নির্মিত চলচ্চিত্রের? না কি অনূদিত টেক্সট, যা মূল চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্র উভয়কে ধারণ করছে, তার? যদি শেষেরটিকে 'অটোনমাস টেক্সট' বলা হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, মূল টেক্সটকে ছাপিয়ে কোনও অনূদিত টেক্সট কি আদৌ অটোনমাস হয়ে উঠতে পারে? এক্ষেত্রে উৎস-টেক্সট কোনটি? নির্মিত চলচ্চিত্র না চিত্রনাট্য? এই পেপারে উপরোক্ত প্রশ্নগুলির যুক্তিনিষ্ঠ উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

ম্যাস্কুলাঁ-ফেমিনাঁ-র ইংরেজিতে নির্মিত চিত্রনাট্য ও তার বাংলা অনুবাদ

গোদার পরিচালিত ম্যাস্কুল্যাঁ-ফেমিনাঁ চলচ্চিত্রটি (১৯৬৬) ফরাসি ভাষায় নির্মিত। এই চলচ্চিত্রের পূর্ব-কাঠামো হিসেবে তিনি কোনও পরিকল্পিত চিত্রনাট্যের পরিকল্পনা করেননি। বরং চলচ্চিত্রটির নির্মাণে তাঁকে সহায়তা করেছিলো চলচ্চিত্রটির প্রধান সিকোয়েন্সগুলির সম্পর্কে নিজের তৈরি করা কিছু নোটস, কারণ চলচ্চিত্রের শুটিং বিষয়টি তাঁর কাছে কোনও পূর্বপরিকল্পিত পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণমাত্র ছিলো না। গোদার সেই বিকল্প ধারার পরিচালকদের একজন, শুটিং এর সময় যাঁরা আপাত অনিশ্চিত সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবায়িত করে তুলতে চাইতেন। অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে নিরন্তর ছুটে চলা-ই গোদার-কৃত চলচ্চিত্রের প্রাণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী ফরাসি সমাজের বিদ্রোহী সন্তান গোদার তাঁর চলচ্চিত্রে দৃশ্যমান বর্তমানকে সচেতনভাবে অস্বীকার করতে চান এবং "ফিল্মে আক্রমণ-ব্যঙ্গ-মস্করা অর্থাৎ সমালোচনার মাধ্যমে শিল্পী হিসেবে সামাজিক সেতুবন্ধনের চেষ্টা করেন" (মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৩)। একটা ঘুণধরা ফরাসি সমাজের নৈতিক অধোগতি, শ্রমিক অসন্তোষ, "মার্ক্স-কোকাকোলার সন্ততি"-দের নিরন্তর বিদ্রোহ- এই সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটই চলচ্চিত্রটিকে অতিমাত্রায় বাস্তবনিষ্ঠ করে তুলেছে। সর্বপ্রকার স্থিতাবস্থার চূড়ান্ত বিপ্রতীপে অবস্থান করে, স্থিতাবস্থার সর্বপ্রকার ইলিউশন ও প্রচলিত বুর্জোয়া নৈতিকতার ধারণাকে নিরন্তর সমালোচনায় বিদীর্ণ করার প্রয়াস চলচ্চিত্র-স্রষ্টা গোদারকে যথার্থভাবে সংজ্ঞায়িত করে।

ইংরেজি অনুবাদটিতে প্যান, টিল্ট, ডলি ইত্যাদি ক্যামেরা-সংক্রান্ত ডিটেলস এর উপস্থিতি এবং লং-শট, মিডিয়াম-শট, ক্লোজ-আপ ইত্যাদি চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত যান্ত্রিক পরিভাষার মুহুর্মুহু উপস্থিতি রয়েছে। ফিল্ম অর্থাৎ চলচ্চিত্র যে কেবল নান্দনিকতার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা গভীরতর জীবনসত্যের পরিচায়ক- দর্শককে বৌদ্ধিক চেতনার এই সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করার এই সচেতন অভিপ্রায়ই গোদার-রীতিকে নিজস্বতা দেয়। গোদার (১৯৮৩) বলেন, “I had finally come to be contemptuous of the cinema, saying to myself: It doesn’t matter how it is filmed, provided that it is true. I had lost my cinephile approach.”

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রোভ প্রেস থেকে প্রকাশিত ম্যাস্কুল্যাঁ-ফেমিনাঁ-র ইংরেজি চিত্রনাট্যটিকে বাংলায় অনুবাদ করেন, যা নীল সরস্বতী প্রকাশন থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়, তার ফলশ্রুতি হিসেবে ছাত্র-যুবসমাজের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, মে-১৯৬৮-র অকাল বসন্তের প্রেক্ষাপট এবং নবতরঙ্গ-ধারার চলচ্চিত্র দর্শন- বিষয়গুলিকে ১৯৭০-৮০র দশকের মধ্যবিত্ত বাঙালি জনসমাজে (যেখানে গোদার আদৌ পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন না) প্রাসঙ্গিক করে তোলার প্রচেষ্টায় এই অনুবাদ। একথা সত্য যে, ফ্রান্স ও ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ব্যবধান দুস্তর। তবু সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি যুবসমাজ প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলো। দুই দেশের ছাত্র ও যুবসমাজের এই সমসাময়িক দুইটি আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক চরিত্রের যথেষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও এই অনুবাদ তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙলির বিশ্ববীক্ষার সহায়ক হয়েছিলো।

তথ্য বর্ণন ও বিশ্লেষণ

অনুবাদ প্রক্রিয়ায় অনুবাদক উৎস-টেক্সট অর্থাৎ মূল চিত্রনাট্যের গঠনকাঠামো বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। অনূদিত অর্থাৎ লক্ষ্য-টেক্সটে প্রত্যেকটি শট-এর সময়সীমার উল্লেখ এই বিষয়টির সাক্ষ্য বহন করে। উৎস-টেক্সটে থাকা চলচ্চিত্রের নিজস্ব টেকনিকাল পরিভাষা ও বিষয়সমূহকে যথাসম্ভব অবিকৃত অবস্থায় বজায় রেখে অনুবাদক চলচ্চিত্রটিকে টেক্সট হিসেবে পঠনে আগ্রহী পাঠকসমাজকে যথাযথ সহায়তা প্রদান করেছেন। এছাড়া অনূদিত টেক্সটে প্রত্যেকটি শট-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং ক্যামেরার মুভমেন্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণও রয়েছে। এভাবে উক্ত টেক্সটটি হয়ে উঠেছে পর্দায় দেখানো চলচ্ছবির সার্থক পূর্বকাঠামো।

অনুবাদের ফলে 'Title' শব্দটি 'লিপিচিত্র'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। 'শিরোনাম' এর পরিবর্তে 'লিপিচিত্র' শব্দের ব্যবহার সঙ্গত ও যথার্থ; কারণ, অনুবাদ প্রক্রিয়ায় চলচ্চিত্রের চিরাচরিত দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম লিপি অর্থাৎ লেখ্য মাধ্যমের অঙ্গীভূত হয়েছে।

উৎস-টেক্সটের 'gun-shot' শব্দটিকে 'বন্দুকের শব্দ' হিসেবে তর্জমা করা হয়েছে। বন্দুকের শব্দের তীব্রতা বোঝাতে উৎস-টেক্সটে 'gun-shot' শব্দের সঙ্গে 'rings out' এই ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হলেও লক্ষ্য-টেক্সটে এরকম কোনও বাড়তি ক্রিয়াপদ অনুবাদক ব্যবহার করেননি। বাংলা ভাষায় 'বন্দুকের শব্দ' এই বাক্যাংশটিই তীব্রতাকে ধারণ করতে সক্ষম হওয়ায় কোনও অতিরিক্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োজন হয়নি।

এরপর আমরা পলের আবৃত্তি করা মূল কবিতা এবং তার অনুবাদ দেখবো।

উৎস-টেক্সট (ইংরেজি)	**লক্ষ্য টেক্সট (বাংলা)**
Never do two glances meet. Not a Trace of life. Silence. Emptiness. Heat. The light dims.	দুজনের তাকানো কখনো মেলে না। জীবনের স্পর্শ নেই। নীরবতা। শূন্যতা তাপ। আলো নিভে আসে।

দুটি কবিতাই সমাজ-বাস্তবতাজনিত হতাশাকে সার্থকভাবে প্রতিভাত করতে সক্ষম। কিন্তু কবিতা দুইটির ভিতর শৈলীগত কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। না-সূচক শব্দগুলি ইংরেজিতে বাক্যের প্রথমে এবং বাংলায় বাক্যের শেসে ব্যবহৃত হয়েছে। না-সূচক শব্দকে বাক্যের প্রথমে ব্যবহার ইংরেজিতে নৈরাশ্যের মাত্রাবৃদ্ধির সহায়ক। বাংলায় বাক্যাংশকে শব্দের আদি বা অন্তে ব্যবহারের স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও গাঠনিক কাঠামোর দিকে খেয়াল রেখে অনুবাদক তা করেননি। 'Silence', "Emptiness', 'Heat'- প্রভৃতি ইংরেজি শব্দগুলি তাদের এক-শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যা মূল কবিতাটিতে শব্দের যে অনাধিক্য রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ইংরেজি 'dims' শব্দটি অনুবাদের ফলে 'নিভে আসে' তে পরিণত হয়েছে। বাংলায় 'dims' শব্দকে 'নিভে আসে' এই কমপ্লেক্স-প্রেডিকেট দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। 'আসে' এই লাইট-ভার্বটি 'নিভে' ক্রিয়াপদের কাল ও প্রকার অর্থাৎ 'ক্রমিক উজ্জ্বলতা হ্রাসের' বিষয়টি নির্দেশ করে।

ইংরেজি ভাষায় মধ্যমপুরুষে কেবলমাত্র 'you' ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রচলিত। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে তুচ্ছার্থক/সম্মানার্থক এই প্রকারভেদটির অস্তিত্ব থাকায় অনুবাদক এর সদব্যবহার করেছেন।

উৎস-টেক্সট (ইংরেজি)	লক্ষ্য টেক্সট (বাংলা)
Madeleine: Yes, why? Do you know me?	মাদলেইন- হ্যাঁ, কেন বলুন তো? আপনি চেনেন আমাকে?
Paul: Yes, I told you so.	পল- আমি তো বললাম তোমাকে
Paul: You are still sleeping in the car.	পল- তুই এখনও গাড়িতে ঘুমোচ্ছিস?

এরপর আলোচনায় আসবে উৎস-টেক্সট এবং লক্ষ্য-টেক্সটে ব্যবহৃত ইতর-শব্দগুলির কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। মূল টেক্সটে এই ইতর-শব্দগুলি যে অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, বাঙালি সমাজে সেই অনুষঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দই অনুবাদক ব্যবহার করেছেন।

উৎস-টেক্সট (ইংরেজি)	লক্ষ্য-টেক্সট (বাংলা)
Pig/Pigs	শুয়োরের বাচ্চা/হারামিগুলো
Slut	খানকি
Asses	বানচোতের দল

ইতর-শব্দগুলি প্রত্যেকটি ভাষা ও সংস্কৃতির নিজস্ব সম্পদ। তাই 'Pig/Pigs' শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ 'শুয়োর/শুয়োরগুলো' হলেও এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় যেহেতু 'শুয়োরের বাচ্চা/হারামি' শব্দের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে, তাই অনুবাদক সেটিই ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি 'Slut' এবং বাংলা 'খানকি' শব্দের যথেষ্ট অর্থগত সাদৃশ্য রয়েছে- একাধিক অবৈধ সম্পর্কে আসক্ত মহিলা। ইংরেজি 'Asses' শব্দের আক্ষরিক অর্থের সঙ্গে 'বানচোতের দল' শব্দের আপাতভাবে কোনও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও প্রসঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় অনুবাদক ওই বাক্যাংশ টি ব্যবহার করেছেন। একই ভাবে উৎস-টেক্সটের 'Bustard' শব্দটি অনুবাদে 'গান্ডু'-তে রূপান্তরিত হয়েছে।

লক্ষ্য-টেক্সটে এমন কিছু কিছু শব্দ অনুবাদক নিয়ে এসেছেন উৎস-টেক্সটে যাদের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বাংলায় মানুষজনের রোজকার বার্তালাপে শব্দগুলি যেহেতু বহুল ব্যবহৃত হয়, তাই লক্ষ্য-টেক্সটের সাযুজ্য বিনষ্ট হয়নি।

উৎস-টেক্সট (ইংরেজি)	লক্ষ্য-টেক্সট (বাংলা)
Paul: Okay, but it’s now five after ten	পল- কিন্তু শালা, এখন দশটা পাঁচ
Robert: Good. Then I am fine.	রবের- মাইরি! তাহলে ঠিক আছে।

'শালা' শব্দটি সংস্কৃত 'শ্যালক' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ 'স্ত্রীর ভাই'। কিন্তু বর্তমানে অর্থের সম্প্রসারণ ও অবনমনের ফলে শব্দটি ইতর-শব্দে পরিণত হয়েছে এবং দুইটি অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। ঠিক তেমনি, 'মাইরি' শব্দটিও জোরের সঙ্গে কিছু বলার ক্ষেত্রে কথ্য বাংলায় বহুল ব্যবহৃত হয়। "No ass these days”- এই বাক্যের ভাষান্তরে অনুবাদক "ন্যাড়া আর কবার বেলতলায় যাবে?”- এই বাংলা প্রবাদটি আংশিক পরিমার্জনসহ ব্যবহার করেছেন। কথ্য বাংলার সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখতে 'Friday’ শব্দটি অনুবাদে 'শুক্কুরবার'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। অনুবাদের ফলে 'breasts’ শব্দটি 'মাই'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। অপরিচিত ভদ্রমহিলার স্তনমর্দনে যে নিষিদ্ধ যৌনানন্দের ইঙ্গিতবহ, অনুবাদে সেই বিষয়টিকে তুলে ধরতেই এই চলিত বাংলা শব্দের সচেতন ব্যবহার।

এর বিপরীত দৃষ্টান্তও রয়েছে। পল এবং মাদলেইন- দুই প্রেমিক-প্রেমিকার কথোপকথনের ভাষা, বই এবং ম্যাগাজিনের কোনও বর্ণনার ভাষা উৎস-টেক্সট এবং লক্ষ্য-টেক্সটে সমভাবে উপমা ও অলঙ্কারপ্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যদি আমরা কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেখি-

উৎস-টেক্সট (ইংরেজি)	লক্ষ্য-টেক্সট (বাংলা)
“And her fleur-de-lys slip finally came off”.	“অবশেষে সে মেলে ধরলো তার দলিত কুসুম।"
“She had thighs, big thighs, like satin”.	"উরুদেশ কদলীবৃক্ষের মত"
“Mad with love and care”	"আদরে আদরে উন্মাদিনী"

পল এবং মাদলেইন এর মধ্যে প্রেম তথা অনুরাগ-সমন্বিত ভাব আদানপ্রদানের যে ভাষা, সেখানে প্রচ্ছন্ন যৌন ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও উৎস এবং লক্ষ্য-টেক্সট- কোথাওই তা অশ্লীল হয়ে ওঠেনি। উভয়ক্ষেত্রেই তা কাব্যিক, অলঙ্কার-সমৃদ্ধ। অনুবাদক নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রেমের ভাষাকে কাব্যসুষমা দান করেছেন।

উৎস-টেক্সট (ইংরেজি)	লক্ষ্য-টেক্সট (বাংলা)
Sparkling teeth	হাস্যোচ্ছল দন্তপংক্তি
Precision of her frame	দেহের নিখুঁত ছন্দ
Artistic sensitivity	শিল্পিত সূক্ষ্মতা
Paul: Because...because I think you’re pretty. Because of tenderness.	পল- যেহেতু...যেহেতু আমার মনে হয় তুমি খুব সুন্দর। খুব কোমল সেজন্য।
Paul: Yes, I would, I would like to sleep with you.	পল- হ্যাঁ আমি, আমার তোমার সঙ্গে রাত কাটালে ভালো লাগবে।
Paul: I like your breasts very much	পল- তোমার বুক দুটো আমার খুউব ভালো লাগে।
“I like Paul being in love with me. Eventually I’ll make it with him.”	"পল আমার প্রেমে পড়লে আমার ভালো লাগবে। আস্তে আস্তে আমিও ওকে ভালবাসতে পারব।"
“The stars are falling, Madeleine”	"নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়, মাদলেইন, নক্ষত্রের মতো হৃদয়"

প্রেমিকার দেহবল্লরীর প্রশংসায় প্রেমিক কুণ্ঠাহীনভাবে যে যৌন-ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে, উপমার সার্থক প্রয়োগে তা কোথাও অশ্লীলতায় পর্যবসিত হয়নি। অর্থাৎ, প্রেমানুরাগের যে চিরাচরিত ভাষা, ক্ষেত্রবিশেষে উপস্থিত প্রচ্ছন্ন যৌন ইঙ্গিত তার কাব্যময় প্রকাশের গতিকে উৎস এবং লক্ষ্য-টেক্সট কোথাওই রুদ্ধ করেনি। উৎস-টেক্সটের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে অনুবাদক বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে উপমা ও রূপকের চয়ন ও ব্যবহারে চূড়ান্ত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফরাসি সমাজে যৌনতার মতো তথাকথিত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনার ক্ষেত্রে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রতিবেশ বর্তমান ছিলো, উৎস-টেক্সট এবং লক্ষ্য-টেক্সটে কথোপকথন প্রসঙ্গে তার নিদর্শন তুলে ধরেছে উঠে এসেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

উৎস-টেক্সট (ইংরেজি)	**লক্ষ্য-টেক্সট (বাংলা)**
Paul: Do you know any of the practical ways of not having children? Elsa (laughs)- There are quite a few, yes (she laughs). I know some but I'd rather not name them.	পল- আপনি জন্ম নিরোধের ব্যবহারিক পদ্ধতি সমূহের কোনটার সঙ্গে পরিচিত? এলসা (হেসে)- বেশ কয়েকটা আছে, হ্যাঁ। আমি কতকগুলোর খবর জানি কিন্তু নাম করা বাদ থাকুক।
Paul (voice over): "To prevent having children, do you prefer swallowing pills or putting something in your vagina?	পল (আরোপিত স্বর)- জন্ম নিরোধের জন্য আপনি কি পিল খাওয়া পছন্দ করেন না যোনির অভ্যন্তরে কোনকিছু প্রবিষ্ট করানোকে শ্রেয় ভাবেন?
Catherine: For me...for me sexuality is first of all skin, then uh...	ক্যাথরিন- আমার কাছে, আমার কাছে যৌনতা প্রথমে শরীরের ব্যাপার। তারপরে, আ...

যৌনতা, জন্ম নিরোধ, কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল, কন্ডোম ইত্যাদি নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় তৎকালীন ফরাসি জনসমাজ যে আদৌ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো না, "কিন্তু নাম করা বাদ থাকুক" ভাববাচ্যে কথিত এই স্পষ্ট ঘোষণায় অনুবাদক তা ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। তখনকার ফরাসি সমাজ যৌনতা সংক্রান্ত যে ট্যাবুতে আক্রান্ত ছিলো, তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমাজ-বাস্তবতায় তা এখনও অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক। তাই অনুবাদক লক্ষ্য-টেক্সটে ইংরেজি শব্দগুলির অবিকল আক্ষরিক অনুবাদ করে উৎস-টেক্সটের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ফ্রান্সের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে ব্যাপক প্রভাব ফেলে গতানুগতিক ধ্যানধারণার প্রতি শ্রমিক-ছাত্র-যুবসমাজের তীব্র ক্ষোভ। এর ফলশ্রুতিতে ট্রেড-ইউনিয়ন ও বামপন্থা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং জনমানসে বিপ্লবী মানসিকতার অভাবনীয় জাগরণ ঘটে। সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নকশালবাদী, অতি-বামপন্থী রাজনৈতিক ভাবধারা যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে ছাত্র ও যুবসমাজে, প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ এবং সমাজ পরিবর্তনের তীব্র অভীপ্সাই ছিলো তার মূল ভিত্তি। ফলে বাঙালি পাঠকসমাজ এই দুই আন্দোলনকে সমান্তরালভাবে পর্যবেক্ষণ করে উভয়ের চরিত্র নির্ধারণ করতে সমর্থ হবেন।

উৎস-টেক্সট (ইংরেজি)	লক্ষ্য-টেক্সট (বাংলা)
Robert: It's a kind of a movement, you know: perpetual rebellion. I can't put up with all you put up with. That's why I am active in the union.	রবের- এটা হচ্ছে একটা আন্দোলন , বুঝলি, একটা অবিরাম বিদ্রোহ। তুই যা যা মেনে নিস আমি তা পারি না। সেজন্যই আমি ট্রেড-ইউনিয়ন করি।
Paul (voice over): Times had changed. This was the era of James Bond and Vietnam. A great wave of hope had risen in the French Left with the approach of the December elections.	পল (আরোপিত স্বর)- জমানা বদলে গেছে। এটা জেমস বন্ড আর ভিয়েতনামের যুগ। আসন্ন ডিসেম্বর নির্বাচনের সম্ভাবনা ফরাসি বামপন্থীদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।
Catherine: This is what one calls a revolution and it is not a play on words but the revolutionary spirit,"	ক্যাথরিন- একেই বলা হয় বিপ্লব এবং এটা কথার ফুলঝুরি নয়, কিন্তু বিপ্লবী মানসিকতার প্রশ্ন।

উক্ত নির্বাচনের ফলাফল বাস্তবে ফরাসি বামপন্থীদের হতাশ করলেও এখান থেকেই মে-১৯৬৮ এর অকাল বসন্তের প্রেক্ষাপট নির্মাণ গতিপ্রাপ্ত হয়। এক অস্থির রাজনৈতিক ও সমাজ-অর্থনৈতিক পরিবেশে মার্ক্সীয় চিন্তাধারার বিস্তার কীভাবে বিপ্লবের পটভূমি নির্মাণে সার্থক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, মূল চিত্রনাট্য এবং অনুবাদ- দুইটি টেক্সটই তার সাক্ষ্য বহন করে।

উৎস-টেক্সট এবং লক্ষ্য-টেক্সট উভয়েই বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রের প্রতি একাধারে সমালোচক ও পরিচালক গোদারের অসন্তোষ ও বিরূপ মনোভাবকে পরিস্ফুট করেছে।

উৎস-টেক্সট (ইংরেজি)	লক্ষ্য-টেক্সট (বাংলা)
Paul (voice over): This wasn't the film we'd dreamed of. This wasn't the total film that each of us carried within himself…the film that we wanted to make, or, more secretly, no doubt…that we wanted to live.	পল (আরোপিত স্বর)- এ ছবি আমাদের রক্তে ছিল না। এ ছবি সে ছবি নয় যাকে আমাদের প্রত্যেকে অন্তর্গতভাবে বহন করে চলেছে…সে ছবি নয় যা আমরা নির্মাণ করতে চেয়েছি, অথবা, আরো অধিকতর ভাবে যার মধ্যে বাঁচতে চেয়েছি।

চলচ্চিত্রের দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমটিকে গোদার বর্তমান সমাজবাস্তবতার নিরিখে প্রচলিত সমাজকাঠামোর গঠনমূলক সমালোচনা এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের বিস্তারের অস্ত্র হিসেব সচেতনভাবে ব্যবহার করতে আগ্রহী- অনুবাদটি দরদী পাঠককে এই গভীরতর সত্যের উপলব্ধিতে সহায়তা করে।

শেষ-কথা

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় তাঁর অনুবাদের ক্ষেত্রে উৎস-টেক্সট হিসেবে যে টেক্সটটি ব্যবহার করেছেন, সেটি একটি অনূদিত টেক্সট। ফলে অনুবাদকের প্রাপ্য স্বাধীনতার যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষায় এমন একটি টেক্সট প্রস্তুত করেছেন যেটি ফরাসি ও বাংলা-র ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক

বৈশিষ্ট্যের সার্থক মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। অনুবাদ হয়ে উঠেছে সমাজ-বাস্তবতার নির্মোহ পর্যবেক্ষণের অমোঘ রাজনৈতিক অস্ত্র।

জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের উদ্ধৃতিকে সুচারুরূপে ব্যবহার করে তিনি এই অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সচেতন পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, বাংলা অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে (১৯৮৩) চলচ্চিত্র নির্মাণের (১৯৬৬) প্রায় দেড়-দশক পর। তাই, অনুবাদের গ্রহণযোগ্যতার পিছনে চলচ্চিত্রের সাফল্যের কার্যকরী ভূমিকাটিকে অস্বীকার করা চলে না। ১৯৭০-৮০'র দশক থেকে অনুবাদকর্মে সংস্কৃতির যে ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, আলোচ্য অনুবাদটি সেই ধারারই বাহক- একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্র উভয়েই আলোচ্য ক্ষেত্রে যৌথভাবে উৎস-টেক্সটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অনূদিত টেক্সট অনুবাদকের সচেতন বা অবচেতন ইচ্ছাক্রমে উৎস-টেক্সটের শৈলীকে অনুসরণ করে চলে-আলোচনা ও উদাহরণসহ ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই সত্যই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিশেষে অটোনমির প্রশ্নটিকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যেতে পারে। অনূদিত টেক্সটটি অনুবাদকের একক কৃতিত্বে যেভাবে দুই বিপরীতধর্মী সংস্কৃতি ও ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নির্ভরতার উপযোগী প্রতিবেশ নির্মাণের মাধ্যমে অবলীলায় বহন করে চলেছে; তার ভিত্তিতে টেক্সট-দুইটিকে উৎস-টেক্সটের আপাত প্রাধান্যের ধারণার বিপরীতে পরস্পর নির্ভরশীল দুইটি স্বতন্ত্র টেক্সট হিসেবে গণ্য করা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জী

Bakhtin, M. (2003). *Estetica de criacao verbal*. Sao Paolo: Martins Fontes.

Bassnett, S., & Lefevere, A. (1998). *Constructing Cultures: Essays on Literary Translation*. Clevedon: Multilingual Matters.

Bassnett, S., & Trivedi, H. (2002). Of Colonies, cannibals and vernaculars. In S. Bassnett, & H. Trivedi, *Post-colonial translation* (p. 2). London: T & F.

Bhabha, H. K. (1990). The Third Space. In J. Rutherford, *Identity, Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart.

Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. New York: Routledge.

Eco, U. (1979). *A Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.

Foucault, M. (1977). *Language, Counter-memory, Practice.* Ithaca: Cornell University Press.

Gentzler, E. C. (1993). *Contemporary Translation Theories*. New York: Routledge.

Godard, J.-l. (Director). (1966). Masculin Feminin [Motion Picture].

Godard, J.-l. (1969). *Masculine Feminine: a film by Jean-luc Godard*. New York: Grove Press Inc.

Godard, J.-l. (1983). *Masculin Feminin*. Kolkata: Neel Saraswati Prakashan.

Mukhopadhyay, S. (2020). *Bhramyoman Nidra o Santrasta Pratibedan*. In J.-l. Godard, Pierrot Le Fou. Kolkata: Boichitra.

Mukhopadhyay, S. (1983). *Keno Masculin Feminin*. In J.-L. Godard, Masculin Feminin (pp. 11-14). Kolkata: Neel Saraswati Prakashan.

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

নির্জ্ঞান এবং ভাষা: জাঁক লাকাঁর(বি)নির্মাণ

কৃষ্ণ শিঞ্জিনী দেব
ইন্সটিটিউট অফ ল্যাংগুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ, কলকাতা

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received 30/04/2023
Accepted 06/05/2024

Keywords:
বিনির্মাণবাদ,
মনোবিশ্লেষণ,
নির্জ্ঞান,
ভাষা

Guest Editors
Agniv Dutta
Ratul Ghosh
Patitpaban Pal

Organised by: শব্দ /ʃɔbd̪o/

A B S T R A C T

সোস্যুরের মতে, শব্দ এবং অর্থের সম্পর্ক যাদৃচ্ছিক এবং আপতিক। মানবসত্তার আত্মনিষ্ঠতা ভাষা দ্বারাই সংজ্ঞায়িত, তাই মানুষ এবং ভাষাকে বিছিন্ন ভাবে দেখা প্রায় অসম্ভব। মনবিশ্লেষক জাঁক মারিল এমিল লাকাঁ (১৯০১-১৯৮১) নব-ফ্রয়েডবাদের সূচনাবিন্দুটি চিহ্নিত করে 'অহম্' এর স্বায়ত্তরূপের অধিকারকে মনোবিজ্ঞান এবং দর্শনের জগৎ থেকে চিরনির্বাসিত করেছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিক সোস্যুরের যুগান্তকারী শব্দযুগ্মকের (সংকেতক এবং অর্থ) আলোকে ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। লাকাঁর বিশ্লেষণানুযায়ী, মানুষ কথা বলার সময় 'সংকেতক'-এর একটি সংস্থার মধ্যে প্রবেশ করে, যার দরুণ সে সংস্থার মধ্যে নিজেকে, অপরকে এবং নিজেদের ভূমিকাকে চিনে নিতে পারে। জুলিয়া ক্রিস্তোভা প্রস্তাবিত 'সাংকেতিক' এবং 'প্রতীকী' স্তরের পার্থক্যের সঙ্গে তুলনা চলে লাকাঁকথিত মানবমস্তিষ্কের দ্বৈতাবস্থা- 'পরিকল্পনামূলক' এবং 'প্রতীকীমূলক' অবস্থানের। শিশুর ব্যক্তি হয়ে ওঠার যাত্রাপথে নির্জ্ঞানের গড়ে ওঠার প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন –"The Unconcious is structured like a Language." এই বিবৃতিটিই মনোবিজ্ঞানী এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে সামগ্রিকভাবে শব্দশ্লেষরূপে প্রতিভাত হয়েছে। ফ্রয়েড কথিত ডিফেন্স মেকানিজমের দুটি পদ্ধতি – ঘনীভবন (condensation) এবং স্থানান্তরকরণ (displacement) বা রোমান ইয়াকবসনের 'রূপক-আলংকারিক' এবং 'লাক্ষণিক' ভাষাশৈলীর উপাদানের সঙ্গে ইংরাজি সাহিত্যে ব্যবহৃত দুটি অলংকার metaphor এবং metonymy-র তুলনা করে লাকাঁ নির্জ্ঞান, স্বপ্ন ও সাহিত্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। মানুষের নির্জ্ঞানে কোন ভাবনা কীভাবে গড়ে ওঠে, ভাষার অন্বয়ে তা কীভাবে প্রকাশ পায়, সর্বোপরি সাহিত্যে কীভাবে রূপক এবং কাল্পনিকতার সংমিশ্রণে নির্মিত হয়, তাঁর প্রবন্ধে সবটাই বিবৃত হয়েছে। ফ্রয়েডবাদকে লাকাঁ বিনির্মিত করেছেন উত্তর-আধুনিক তথা উত্তর-গঠনবাদের কাঠামো মেনে। নির্জ্ঞান ভাষার মত গঠিত হলে, নির্জ্ঞানকে ভাষার মত পাঠ করা সম্ভব, সুতরাং সাহিত্যকেও নির্জ্ঞানের মত ভাবা সম্ভব। লাকাঁর তত্ত্বে ভাষা একটি পূর্বনির্ধারিত, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, ভাষিক বা subject তার কার্য, কারণ নয়। লাকাঁ 'signifiance' নামে একটি পরিভাষার উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা শব্দের তাৎপর্যের নতুন একটি দিক উপস্থাপিত হয়েছে।তাঁর মতে, নির্জ্ঞান আসলে দ্যোতক এবং দ্যোতিতের কার্তেসীয় অক্ষের বিভাজক মাত্র, যার দ্বারা শব্দ এবং অর্থের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, লাকাঁর মনোবিশ্লেষণের পদ্ধতির মূল নিহিত রয়েছে ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান তথা অনুমানে। তাঁর বিবিধ রচনার সার্বিক পাঠের মাধ্যমে মনোবিজ্ঞান এবং ভাষাতত্ত্বের আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্কের উদবর্তন এবং তাঁর লেখনীতে ফরাসি শব্দ 'langue' (বা কোন বিশেষ ভাষা) ও 'langage'(বা ভাষার সাধারণ ব্যবস্থা)কীভাবে ভাষার প্রতীকীচরিত্র এবং কাল্পনিকের অর্থজ-দৃশ্যজ উড়ানকে অতিক্রম করে 'real unconcious'-এ উপনীত হয়েছে, তা আলোচনা করাই আমাদের নিবন্ধের মূল লক্ষ্য।

email id:krishnashinjineedeb25@gmail.com

এক

আমরা যখন কথা বলি, তখন নিজের জন্য ‘আমি’ সর্বনাম ব্যবহার করি এবং যার সঙ্গে কথা বলি তাকে ‘তুমি’ বলি। কিন্তু সেই ‘তুমি’ যখন উত্তর দেন, তিনি তখন ‘আমি’ হয়ে যান, আমাকে ‘তুমি’ সম্বোধন করেন। অর্থাৎ ‘আমি’ বা ‘তুমি’ আত্মিক অবস্থান মাত্র, ব্যক্তি নয় – এই ধারণাকে প্রাথমিকভাবে মেনে নিলেই কথা বলা সম্ভব। আবার, কোন ব্যক্তি যখন বলে ‘কাল আমি বাড়ি যাব’, তখন এই ঘোষণার ‘আমি’ অহম্ (Ego) এবং ঘোষণার ব্যক্তি (Subject of enunciation) এই দুই বিষয়ীর বিভাজন নির্দেশ করে। কথা বলার সময় ভাষার পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থায় প্রবেশ করে মানুষ নিজের অবস্থানকে চিনে নেয়।

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকদের মতে শব্দ এবং অর্থ সম্পর্কটি নৈসর্গিক, শব্দ ক্ষমতাবান এবং অর্থ নিত্য, তাদের মধ্যবর্তী সম্পর্ক নিত্য এবং অপরিবর্তনশীল। যদিও পরবর্তীকালে নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকরা এই তত্ত্বের সঙ্গে কখনই একমত হননি। তাঁদের মতে, শব্দের সঙ্গে অর্থ নৈসর্গিক সম্পর্কে আবদ্ধ হলে প্রতিটি ভাষায় সব শব্দের নাম ও অর্থ একই হত, মধু বললেই মিষ্টি স্বাদ জিভে টের পাওয়া যেত, কিন্তু তা হয় না। অন্যদিকে বৌদ্ধদর্শনে অপোহ-তত্ত্ব অনুযায়ী, শব্দের কোন বস্তুক্ষমতা কখনই থাকে না, তাই অর্থ প্রভেদমূলক এবং নঞর্থক। শব্দ মানুষের মাথায় তৈরি হওয়া পরিকল্পিত বিম্ব। বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙনাগের (৪৮০–৫৪০) ব্যাখ্যায়, শব্দ একটি বিকল্প, নেতিবাচক প্রকৃতিই যার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থের আপেক্ষিক পার্থক্য অধিক ব্যবহারের জন্যে বোঝা যায় না, কিন্তু তা সর্বদাই অনুভূত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রতীচ্যের ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুরের (১৮৫৭-১৯১৩) ভাষা দর্শনের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। তিনিও মনে করতেন, ভাষার পরিকল্পিত বিশ্বের মধ্যে শব্দ এবং বস্তুর কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই, অর্থের ব্যক্তিকতা কেবলমাত্র বিভেদাত্মকতায় আছে। শব্দ এবং অর্থের সম্পর্ক যাদৃচ্ছিক এবং আপতিক। দ্যোতক (signifier) এবং দ্যোতিত (signified) উভয়েই ব্যক্তিনিষ্ঠ। নৈয়ায়িকদের মতে, শব্দ কেবল উচ্চারিত ধ্বনি বা সোস্যুরের ভাষায় পারোল (parole) নয়, ধ্বনিতাত্ত্বিক ছাঁচে তৈরি করা একটি মানসিক অবধারণ ও ভাষাব্যবস্থা, অর্থাৎ সোস্যুর কথিত লাঙ্-এর (lang) অঙ্গ।

দুই

পেশায় মনোবিশ্লেষক জাঁক মারিল এমিল লাকাঁ (১৯০১-১৯৮১) নব-ফ্রয়েডবাদের সূচনাবিন্দুটি চিহ্নিত করে অহম্-এর (Ego) স্বায়ত্তরূপের অধিকারকে মনোবিজ্ঞান এবং দর্শনের জগৎ থেকে চিরনির্বাসিত করেছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিক সোস্যুরের যুগান্তকারী শব্দযুগ্মকের আলোকে ফ্রয়েডের অবচেতন তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। লাকাঁ নবতর দৃষ্টিতে ফ্রয়েডকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ফ্রয়েডের মুখ্য অন্তর্দৃষ্টি অচেতন বা নির্জ্ঞানের (unconscious) অস্তিত্ব প্রমাণ করা নয়, বরং অবচেতনের কাঠামো কীভাবে মানবচেতনের বিবিধ প্রক্রিয়ায় পুনর্ব্যবহৃত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে লাকাঁ বিষয়ীর সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। ইংরেজি ‘language’ শব্দটি দুটি ফরাসি শব্দ ‘লাঙ্’ (‘langue’) এবং ‘লাঁগাজ’-এর (‘langage’) সঙ্গে সম্পর্কিত। ‘langue’ হল কোন নির্দিষ্ট ভাষা, যেমন বাংলা, ফরাসি বা ইংরেজির আলোচনা এবং ‘langage’ হল কোন নির্দিষ্ট ভাষা ব্যতিরেকে সাধারণ ভাষাব্যবস্থার আলোচনা। লাকাঁর বিশ্লেষণ ‘Langue’-র চেয়েও বেশি ‘Langage’ নির্ভর। ১৯৩৬-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লাকাঁর মনোবিশ্লেষণের পরিধিতে ভাষাভাবনা বিক্ষিপ্ত হলেও এই সময়েই সোস্যুরের তত্ত্ব আলোচনা করে ‘Rome Discourse’ প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন যে, ‘Parole’ এবং ‘Langage’ এর মধ্যে উপাদানগত বিশেষ পার্থক্য নেই, সোস্যুরের আলোচ্য প্রকৃত যুগ্মক হল ‘Parole’ এবং Langue’।

এরপর ১৯৫৩-৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে প্যারিসে প্রায় আটশোটি সেমিনারে লাঁকা বক্তৃতা দেন। এখানেই তিনি আলোচনা করেন যে, মানুষের অবচেতন ভাষার ন্যায় গঠিত। তিনি সোস্যুরের প্রস্তাবিত

ভাষার একক চিহ্নের (sign) পরিবর্তে ভাষার একক হিসেবে দ্যোতককে (signifier) নির্বাচনের প্রস্তাব রাখেন। 'মিরার স্টেজ' (১৯৪৯) প্রবন্ধে লাকাঁ বলেন, শিশু জন্মের পর থেকে বাস্তব দশায় (real stage) থাকে, যেখানে সর্বতভাবে তার দৈহিক প্রয়োজন এবং মায়ের সাহচর্যের দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হয়। ছয় থেকে আঠেরো মাসের অন্তর্বর্তী সময়ে তার আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখার অভ্যাস তৈরি হয়, যার ফলে শিশু তার দেহজ সংস্থানকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন একক একটি সংস্থা বলে চিহ্নিত করতে পারে। এখান থেকেই তার আত্মানুসন্ধান শুরু হয়, যা পরবর্তীতে অপর ব্যক্তি, অপর সংস্কৃতি ইত্যাদি বিবিধ অপরের (other) নিরিখে আত্মকে (self) বিচার করার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। শিশুর কাছে তার নিজের প্রতিবিম্বই হয়ে ওঠে আদর্শ সত্তা (Ideal I), যাকে সে দেখতে পেলেও কখনই নিজে হয়ে উঠতে পারে না, ফলে একটি অভাবজনিত বাসনা (lack desire) তার মধ্যে আজীবন কাজ করে এবং সে সর্বদা অপর হতে চায়। কাল্পনিক দশা (imaginary stage) থেকে ভাষার প্রতীকী দশায় (symbolic stage) উন্নয়ন ঘটে এই সময়েই। মানুষের মন দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে – তার মনের একটি জ্ঞানের দিক, চেতন (Conciousness), যেটি গম্য অংশ এবং একটি দুর্গম অংশ, যা নির্জ্ঞান (Unconcious) নামে পরিচিত। মানুষের চেতনস্তরে রাখা জ্ঞানের রক্ষার্থেই নির্জ্ঞান অন্ধকার থাকে। কাল্পনিক দশায় সত্তা একক, সুসঙ্গত একটি সংস্থা হিসেবে থাকলেও অপরের (the Other) উপস্থিতির উপলব্ধি ঘটতেই সত্তা দ্বিখণ্ডিত হয়, বিষয় এবং বিষয়ীর জগতের সঙ্গে ভাষার জগতেও শিশুর অনুপ্রবেশ ঘটে। লাকাঁর মতে, ভাষারও একটি প্রতীকগত মাত্রা (symbolic dimension) এবং কাল্পনিক মাত্রা (imaginary dimension) রয়েছে। প্রতীকগত মাত্রায় থাকে সত্য/ পূর্ণ কথন (true/ full speech) এবং দ্যোতক (Signifier)। সত্য কথন অর্থপূর্ণ, বিষয়ীর বাসনার নিকটবর্তী –

Full speech is speech which aims at, which forms the truth such as it becomes established in the recognition of one person by another. Full speech is speech which performs (qui fait acte).১

কল্পিত মাত্রায় রয়েছে দ্যোতিত (signified), অর্থ (signification) এবং শূন্য কথন (empty speech), যার তাৎপর্য থাকলেও অর্থ অনুপস্থিত –

The subject seems to be talking in vain about someone who...can never become one with the assumption of his desire.২

তিন

মনোবিজ্ঞানের জগতে লাকাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা The Mirror stage-এর তত্ত্বগত ধারণাকে উপস্থাপিত করা। তাঁর মতে, আত্ম (ego) হল বিষয় (object), বিষয়ী (subject) নয়। ছয় থেকে আঠেরো মাসের শিশু আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে, তার শারীরিক বিবিধ অসহায়তাকে অতিক্রম করে। বিষয়ী থেকে আত্ম-এর ধারণা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে এইসময়েই তার ভাষাশিক্ষারও সূচনা হয়। এপ্রসঙ্গে ভাষার মধ্যে উপস্থিত অবশ্যম্ভাবী উপাদান, মেটাফর (Metaphor) এবং মেটানেমি (Metonymy) কীভাবে তৈরি হয়, সেই কৌশলের আভাস মেলে ফ্রয়েড কথিত স্বপ্নের ব্যাখ্যার। এর থেকে আরেকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় – যেহেতু নির্জ্ঞানের গঠন ভাষার মত এবং নির্জ্ঞানের হদিশ মেলে স্বপ্নে, তাই স্বপ্ন, ভাষা এবং নির্জ্ঞানে কিছু সাধারণ কলাকৌশল উপস্থিত। শিশুর চেতনা কার্য হলে তার কারণ হল উপলব্ধি (perception)। প্রথম থেকেই ইগো দ্বিখণ্ডিত; উপলব্ধি দ্বারা সৃষ্ট কাল্পনিক মাত্রা (imaginary dimension) এবং ভাষার দ্বারা সৃষ্ট প্রতীকী মাত্রা (symbolic dimension) চেতন স্তরে অভিন্ন হলেও নির্জ্ঞানস্তরে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্বপ্ন নির্জ্ঞানের অংশ নয়, কিন্তু অজান্তেই স্বপ্নের কাঠামো নির্জ্ঞানের গঠনকে প্রকাশ করে ফেলে। লাঁকা স্বপ্নের চিন্তা এবং ঘটনার

মধ্যবর্তী সম্পর্ককে গঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানের দ্যোতক-দ্যোতিতের সম্পর্কের সমীকরণের সঙ্গে যুক্ত করেন।

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নে অভিক্রান্তি (Displacement, জার্মানে Verschiebung) এবং ঘনীভবন (Condensation) ঘটে। ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন বিশ্লেষণে অভিক্রান্তি স্বপ্নচিন্তা এবং স্বপ্নদৃশ্য, যুক্তি এবং অমূলদ ভাবনা চেতন এবং নির্জ্ঞানের দ্বান্দ্বিকতা বোঝায় –

When a common element between two persons is represented in a dream, it is usually a hint for us to look for another, concealed common element whose representation has been made impossible by the censorship. A displacement is regard to the common element has been made in order as it were, to facilitate its representation.৩

যদিও নির্জ্ঞানকে যুক্তিহীন বলা ভুল, স্বপ্নের যুক্তিহীনতা তৈরি হয় চেতন চিন্তার স্তরে তার ব্যাখ্যা করতে গেলে, নির্জ্ঞানের তার উৎপাদনের সময়ে নয়। ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন অলংকার (figure of speech) – যেমন এলিপসিস (ellipsis), প্লিওনাজম (pleonasm), হাইপারবাটন (hyperbaton), সিলিপসিস (syllepsis), অ্যাপোজিশন (apposition), ক্যাচারসিস (catachresis), অ্যান্টোনোমাসিয়া (antonomasia) ইত্যাদি স্বপ্নের মুখ্য চারপ্রকার গঠন – ঘনীভবন (condensation), অভিক্রান্তি (displacement), প্রত্যাবৃত্তি (regression) এবং পুনরাবৃত্তির (repetition) ভাষিক রূপ। এই অলংকারগুলি অতিসংক্ষেপে আলোচনা করা যাক –

- ইলিপসিস একটি আন্বয়িক গঠনে একটি শব্দ লোপ করা, যার ফলে তাৎপর্য বদল না করেও আন্বয়িক গঠনে একটি ফাঁক তৈরি হয়। যেমন – আজকে জলখাবারে লুচি। (‘খাওয়া হবে/ বানানো হবে’ অনুক্ত, যদিও অর্থ বোঝা যাচ্ছে।)
- প্লিওনাজমে তাৎপর্য তৈরি করতে এক ধারণাকে বোঝাতে একাধিক শব্দকে পুনরাবৃত্তি করা হয়, যেমন – জ্বলন্ত আগুন বা আমি আমার নিজের কানে কথাটা শুনেছি।
- সিলপসিসে একটি শব্দকে একটি নির্দিষ্ট অন্বয়ের পরিসরে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সেখানে ব্যাকরণগতভাবে একটি শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত শব্দের সামঞ্জস্য তৈরি হলেও অন্য শব্দের সঙ্গে হয় না, ফলে যুক্তির মধ্যে অযৌক্তিকতা তৈরি হয়। যেমন – ওর চাকরিটি গেছে, সঙ্গে মাথাটাও। এখানে, মাথা খারাপ হওয়াটা, গেছে ক্রিয়া দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।
- অ্যাপোজিশন হল বাক্যে একটি শব্দকে বোঝাতে অপর শব্দের ব্যবহার, অর্থাৎ এটিকেও পুনরাবৃত্তি বলা চলে। যেমন – রাবণ, লঙ্কার অধিপতি, রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এখানে ‘রাবণ’ এবং ‘লঙ্কার অধিপতি’ একই ব্যক্তি।
- ক্যাচারেসিস কোন শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগ, যেমন – ‘ন্যাংচাদার হাহাকার’ গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় টেনিদাকে দিয়ে বলিয়েছেন, কুরুবক কোন ফুল নয়, বরং ‘এক ধরনের বক – খুব খারাপ, বিচ্ছিরি ধরনের বক।’
- অ্যান্টোনোমাসিয়া কোন নাম বিশেষ্যের পরিবর্তে পদের ব্যবহার, যেমন – ‘জাতির জনক’ বললে মহাত্মা গান্ধীকে বোঝানো হয়।

এই অলংকারগুলি প্রাথমিক অভিক্রান্তি এবং ঘনীভবনে ব্যবহৃত হয়, যা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের গঠনেও সক্রিয়। নির্জ্ঞানে দৃশ্যগত অধঃক্ষপ (visual residue, জার্মানে Sachvorstellung), শ্রবণগত অধঃক্ষেপ (auditory residue, জার্মানে Wortvorstellung) স্বপ্ন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিনিধিত্বের জন্য উদ্বেগ (concern for representability, জার্মানে Rücksicht auf Darstellbarkeit) সৃষ্টি করে। এই তিনের সমন্বয়ে স্বপ্নের দ্বৈত অন্তলির্খন (double inscription, জার্মানে Niederschrift) ঘটে, যার প্রতিক্রিয়ায় ঘনীভবন, অভিক্রান্তি, অবদমন এবং পুনরাবৃত্তি হয়ে

থাকে। স্বপ্নের মধ্যে অভিক্রান্তি হওয়ার দরুণ চেতনস্তরের যুক্তির সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয়, ফলে চেতন অবস্থায় স্বপ্নকে যুক্তির সাপেক্ষে বিকৃত মনে হয়। ভাষার ক্ষেত্রে এটি মেটাফর এবং মেটানেমি, উভয় কাব্যিক উপাদানেরই প্রাথমিক প্রক্রিয়া। মেটাফরের ক্ষেত্রে যা নির্জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটায় এবং দ্যোতনা বিকৃতি ঘটিয়ে নতুন তাৎপর্য তৈরি করে, মেটানমির ক্ষেত্রে তাই একেবারেই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আরেকটি পদ্ধতি ঘনীভবন দুটি বিপরীত এবং বিযুক্ত ধারণাকে একই গঠনে যুক্ত করে। ‘the diachronic combined into the synchronic’, একটি স্বপ্নদৃশ্যে একাধিক দৃশ্যগত বা শ্রবণগত স্মৃতির ঘনীভবন হতে পারে। ভাষায় synecdoche অলংকারেও একটিমাত্র শব্দ একাধিক শব্দ বা ভাবনার পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার হয়, যেমন – রাজপুত্র রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করলেন (বিবাহ অর্থে)। ঘনীভবনে আলাদা আলাদা দুটি অপ্রকাশ্য ভাবনা প্রকাশ্য স্বপ্নে জায়গা করে নেয়। এমতাবস্থায় অন্তর্লীন উপাদানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ স্বপ্নদৃশ্যের কোন যোগ থাকে না। অভিক্রান্তিতে প্রতিটি স্বপ্ন উপাদান অনুষঙ্গের অসংখ্য পংক্তিমালায় দূরে বিসর্পিত। ঘনীভবনও আসলে একপ্রকার অভিক্রান্তি, সুতরাং এটিও মেটাফর এবং মেটানেমির নির্মাণের অংশ। এই তত্ত্ব থেকে প্রমাণিত হয়, স্বপ্ন চিত্রনির্ভর ভাষা এবং স্বপ্নের গঠন নির্জ্ঞানের মত হলে, নির্জ্ঞানের গঠন ভাষার মতই।

চার

লাকাঁ এই সিদ্ধান্তের অনুবর্তী আরেকটি প্রস্তাবনা পেশ করেন – ভাষার প্রাথমিক একক চিহ্ন নয়, ভাষার একক হল দ্যোতক, কেননা দ্যোতকই –

Subjected to the double condition of being reducible to ultimate differential elements and of combining according to the laws of a closed order.৪

লাকাঁ বলেন, দ্যোতকগুলি দ্যোতনার শৃঙ্খল (Chain of signification) দ্বারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। মেটানেমির নিয়মে এই শৃঙ্খল যোজিত। চিহ্নের ধারণায় একটি শব্দ একটি বিষয়কে বোঝায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্যোতকের প্রতিস্থাপন করে বিষয়ীর উপস্থাপনা করা হয়ে থাকে। একটি দ্যোতক (master signifier, S1) অন্য দ্যোতক (S2) এর বিষয় উপস্থাপন করতে পারে মাত্র, কোন দ্যোতক-ই বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করতে পারে না। সোস্যুরের মতে, দ্যোতক এবং দ্যোতিত একটি কাগজের সম্মুখ এবং পৃষ্ঠের মত অবিচ্ছিন্ন –

Language can also be compared a sheet of paper: thought (signified) in the front and the sound (signifier) the back; one cannot cut the front without cutting the back at the same time; likewise in language, one can neither divide sound form thought nor thought form sound; the division could be accomplished only abstractly, and the result would be either pure psychology or pure phonology.৫

কিন্তু লাকাঁ বর্ণনা করেন, এই সম্পর্ক কোন বন্ধন নয়, স্ফোটন, যা দ্যোতনার বিরুদ্ধে বাধা হিসেবে কাজ করে। তাঁর যুক্তিক্রমানুযায়ী, দ্যোতক দ্যোতিতের পূর্বজ, দ্যোতকের শৃঙ্খলের টানাপোড়েনে দ্যোতিত সৃষ্টি হয়। দ্যোতিত তৈরি হওয়া পরেও তা দ্যোতকের নিচে যেন পিছলে যেতে থাকে, দুই স্তরের দোলাচলে একটি স্থির অর্থের সম্ভাবনা তৈরি হয়। দ্যোতনা তাই দ্যোতক এবং দ্যোতিতের অচ্ছেদ্য বন্ধন নয়, একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে দ্যোতকের শৃঙ্খল দ্যোতিত এবং অর্থের ভ্রম সৃষ্টি হয়। এই কাজে সাহায্য করে দুটি লক্ষণা (trope) – মেটাফর এবং মেটানেমি। দ্যোতনা একটি মেটানেমিক প্রক্রিয়া কারণ একটি দ্যোতনা সর্বদা অপর দ্যোতনাকে নির্দেশ করে। অর্থ কোন একটি নির্দিষ্ট দ্যোতকের মধ্যে থাকে না, দ্যোতনার শৃঙ্খলে থাকে –

It is the chain of the signifier that the meaning insists, but none of these elements consists in the significance of which it is at the moment capable. Every real signifier

is, as such, a signifier that signifies nothing. The more the signifier signifies nothing, the more indestructible it is.৬

আবার দ্যোতনা মেটাফরিক-ও বটে কারণ এটি দ্যোতকের সীমানা পেরিয়ে দ্যোতিতের এলাকায় প্রবেশ করে। লাকাঁ দ্যোতিতের প্রসঙ্গে বলেন, তা আসলে দ্যোতকের ক্রিয়ারই ফল। দ্যোতিতের বাস্তব অস্তিত্ব নেই, মেটাফরের দ্যোতনার দ্বারা সেটি উৎপন্ন হয় দ্যোতনার শৃঙ্খলে–

One sees in effect that if here the signifier is a melting pot in so far as it bears witness to a presence that is past, and that inversely in what is signifying, there is always in the fully developed signifier which the word is, there is always a passage, namely something which is beyond each one of the elements which are articulated, and which are of their nature fleeting, vanishing, that is the passage from one to the other which constitutes the essential of what we call the signifying chain, and that this passage qua vanishing, is this very thing which can be trusted.৭

পাঁচ

এখন লাকাঁর মতে দ্যোতিত কী, এবিষয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। এর উত্তরে বলা যায়, দ্যোতিত, অর্থ বা বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব এক জিনিস নয়, বরং –

The signified is something quite different – it's the meaning, and I explained to you by means of Saint Augustine, who is as much of a Linguist as Monsieur Benveniste, that it always refers to the meaning that is to another meaning. The system of Language, at whatever point you take hold of it, never results in an index finger directly indicating a point of reality; it's the whole of reality that is covered by the entire network of language. You can never say that this is what is being designated, for even were you to succeed you would never know what I am designating in this table – for example, the colour, the thickness, the table as object, or whatever else it might be.৮

দ্যোতিত দ্যোতকের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। যত বেশি দ্যোতক সৃষ্টি করা যায়, তত বেশি পরিমাণে দ্যোতিত সৃষ্টি হয়। দ্যোতনা কোন স্বয়ংক্রিয়, একক প্রক্রিয়া নয়। এই সেমিনারের বক্তৃতার পরবর্তী অংশে তিনি ব্যাখ্যা করেন –

If I designated something by pointing to it, no one will ever know whether my finger is designating the object's colour or its matter, or whether it is designating a stain or crack, etc. You need words, discourse, to discern this. Discourse has an original property in comparison with pointing. But that's not where we shall find the fundamental reference of discourse. Are we looking for where it stops? Well then, it's always at the level of this problematic term called being.৯

নিবিড় পাঠে দ্যোতনার চিহ্ন দেখে লাকাঁ মন্তব্য করেন, একজন মনোসমীক্ষকের দ্যোতক এবং দ্যোতিতের অন্তর্বর্তী মূলীগত পার্থক্য এবং তাদের অনপরিপাতিত শৃঙ্খলের সজ্জা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এরপর তিনি দুটি শৃঙ্খলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন –

The first network, that of the signifier, is the synchronic structure of the material of language insofar as each element takes on its precise usage therein by being

different from the others; that is the principal of distribution that alone regulates the function of the elements of language (langue) at its different levels, from the phonemic pair of oppositions to compound expressions, the task of the most modern research being to isolate the stable forms of the latter.
The second network that is of the signified is the diachronic set of pronounced discourses, which historically affects the first network, just as the structure of the first governs the pathway of the second. What dominates here is the unity of signification, which turns out to never come down to a pure indication of reality (réel) but always refers to another signification. In other words, signification comes about only on the basis of taking things as a whole (d'ensemble)
Its mainspring cannot be grasped at the level at which signification usually secures its characteristics redundancy, for it always proves to exceed the things it leaves indeterminate within it.
The signifier alone guarantees the theoretical coherence of the whole as a whole. Its ability to do so is confirmed by the latest development in science, just as, upon reflection, we find it to be implicit in early linguistic experience.
These are the foundations that distinguish language from signs. Dialectic derives new strength from them.১০

অর্থ সর্বদাই এগোচ্ছে অন্য অর্থের দিকে। কিন্তু সেই অর্থের শেষ অজানা, দ্যোতক কেবলই বিষয়ীকে অন্য দ্যোতকের দিকে প্রেরণ করে। এইভাবে লাকাঁ চিহ্ন এবং দ্যোতকের ধারণার ভিত্তিগত পৃথকীকরণ করেন। বিষয়ী দ্যোতকের কারণ (cause) নয়, ফল (effect) – কেননা, বিষয়ীর ভাবনাকেই এক দ্যোতক থেকে অপর দ্যোতকে চালনা করা হয়। এভাবেই ভাষায় মেটাফর সৃষ্টি হয়। একটি দ্যোতিতকে প্রথমে উহ্য রাখা হলে তা স্থিরবিন্দুতে (the anchoring point) অবস্থান করে, এই পর্যায়ে দ্যোতনা সৃষ্টি হয় এবং দ্যোতক এবং দ্যোতিতের ভেদরেখা মুছে নির্জ্ঞান, 'অভাব' (absence) হিসেবে উপস্থিত হয়। এই ধরনের অর্থ তৈরির প্রক্রিয়াকে লাকাঁ চিহ্নায়নের significance বা signifying-এর বদলে 'signifiance' বলে নির্দেশ করেছেন। এটি একটি উৎপাদন প্রক্রিয়া, যেখানে সীমারেখা অতিক্রম (crossing the bar) ঘটে না, দ্যোতক এবং দ্যোতিতের বাধা মানে না। সিগনিফিয়েন্সে অযৌক্তিকতা ও নির্জ্ঞানের উপস্থিতি এবং দ্যোতিত তথা বিষয়ীর, এমনকি সত্তার অনুপস্থিতি ধারণ করে, কারণ এই অনুপস্থিতির উপস্থিতিতেই সিগনিফিয়েন্সের অর্থ বিধৃত। লাকাঁ ফ্রয়েডের স্বপ্নে ঘনীভবনকে (condensation, জার্মানে Verdichtung) মেটাফরের সঙ্গে তুলনা করেন এবং প্রতিস্থাপন (displacement, জার্মানে Verschiebung) দ্বারা মেটানেমির চিহ্নায়নের হস্তান্তরকে নির্দেশ করেন –

লাকাঁর মেটাফর এবং মেটানেমির সঙ্গে যথাক্রমে ফ্রয়েড কথিত স্বপ্নের কৌশল – ঘনীভবন এবং অভিক্রান্তি, সোস্যুরের গঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানে দুই ভাষার শব্দের অন্তর্বর্তী সম্পর্ক সিনট্যাগমেটিক এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য শব্দের সম্পর্ক প্যারাডিগমেটিক রুশ প্রকরণবাদী রোমান ইয়াকবসনের (১৮৯৬-১৯৮২) সাদৃশ্য এবং সংলগ্নতার ধারণার তুলনা করা যায়। দুইটি অক্ষের নিরিখে ভাবলে, মেটানেমি আনুভূমিক রেখা বরাবর ক্রিয়াশীল; এটি অবদমন বা রিপ্রেশনের সীমা লঙ্ঘন করে না, ফলে দ্যোতিত বা দ্যোতনার নির্মাণে সমস্যা হয়না। বাসনা যেমন কালক্রমে বদলে যায়, তেমনি এই রেখা বরাবর অগ্রসরণের ফলে দ্যোতনার অর্থচ্যুতি ঘটে। অন্যদিকে, মেটাফর উলম্ব রেখা বরাবর ক্রিয়াশীল;

এক্ষেত্রে একটি দ্যোতনা অপর দ্যোতকের স্থান অধিগ্রহণ করে, এখানে একটি দ্যোতকের দ্যোতিত লোপ পায় এবং সেই অনুপস্থিত দ্যোতিতের জায়গায় অপর দ্যোতক জায়গা করে নেয়। আমরা একটি দ্যোতককে তার সংলগ্ন দ্যোতকের মাধ্যমে চিনতে পারি।

ছয়

একটি গ্রন্থাগারে ডিউয়ি ডেসিমাল প্রক্রিয়াতে সাজানো গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট তাকের নির্দিষ্ট কোন স্থানে একটি বই না থাকলেও, প্রত্যেকটি বইটির জন্য একটি করে স্থান পূর্বনির্ধারিত। হেগেল কথিত বাতিলকরণের (cancellation, জার্মানে Aufhebung Sublation) ধারণা গ্রহণ করে লাঁকা দেখান, কোন দ্যোতকের প্রধান ধর্ম হল তার পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা, কারণ প্রতিটি দ্যোতক প্রতিস্থাপনযোগ্য, একটি দ্যোতক অপর একটি দ্যোতকের অর্থ প্রকাশ করতে পারে, সেটাই তাদের মৌলিক ধর্ম। তিনি এর সঙ্গে অনুপস্থিত দ্যোতকের (absent signifier) কথাও বলেন, যার দ্বারা মেটাফর এবং মেটানেমির ধারণাকে বোঝা সম্ভব। তিনি স্যোসুরের চিহ্ন=দ্যোতক/দ্যোতিত (S/s) ধারণা থেকে সরে এসে ধ্বনিনির্ভর দ্যোতকের শৃঙ্খলকে বিমূর্ত দ্যোতকের শৃঙ্খলের উপরে বসান, যাদের মধ্যবর্তী সংযোগে দ্যোতিতের অর্থ তৈরি হয়। কথন এবং চিন্তার দ্যোতকদ্বয়ের সম্পর্ক থেকে কথনে নির্জ্ঞানের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। মেটাফর একটি বস্তুর নামের বদলে অন্য নাম ব্যবহার করা সত্ত্বেও চিহ্নায়ন করতে সক্ষম হয়, কিন্তু দুটি নামের সমাহারেই উদ্দিষ্ট ভাব স্পষ্ট হতে পারে। যেমন – শেক্সপিয়ারের As You Like It (১৬২৩) নাটকে জ্যাকুয়ার স্বগতোক্তি –

All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances; ১১

এখানে মঞ্চের ধারণা ‘পৃথিবী’ চিহ্নের ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, চিহ্নায়নে প্রতিস্থাপন (signifying substitution) ঘটেছে। মেটাফরের নোঙরবিন্দুতে (anchoring point) যুক্তি অযৌক্তিকতা তৈরি করেছে। এখানে দ্যোতিত দ্যোতককে অনুসরণ করেছে, তাই চিহ্নায়নের একক হল স্বতন্ত্র দ্যোতক। ‘পৃথিবী’ নামক চিহ্নের ভাবের উপরে ‘মঞ্চ’-এর ধারণা প্রযুক্ত হয়ে কথন এবং ভাবের মধ্যবর্তী দূরত্ব সংযুক্ত হয়েছে।

অন্যদিকে মেটানেমির ক্ষেত্রে একটি নামের পরিবর্তে তার সঙ্গে আপাত সম্পর্কহীন শব্দের প্রতিস্থাপন দেখা যায়। ‘The mouth of the river’ এই মেটানেমিতে প্রাথমিক দ্যোতিত, জল কখনোই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, প্রতিস্থাপিত দ্যোতকের চিহ্নায়নের জন্য রয়ে গেছে। লাকাঁ মেটাফর এবং মেটানেমির ক্রিয়াকে গাণিতিক সূত্রে প্রকাশ করেছেন এইভাবে –

$f(S'/S) \approx S(+)s.$

এখানে S' মেটাফরের প্রথম দ্যোতক, S দ্বিতীয় দ্যোতক, (+) হল দ্যোতক এবং দ্যোতিতের বাধা অতিক্রম করা, চেতন এবং অচেতনের ভাষার সংযোগ ঘটানো। এর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক দ্যোতক লোপ পায় এবং মেটাফর ক্রিয়াশীল হয় -

$S/\$'\cdot\$'/x \rightarrow S(U/s)$

এখানে দ্যোতক, অজ্ঞাত চিহ্নায়ন, মেটাফর দ্বারা সৃষ্ট দ্যোতিত (ভাব), এবং $\$'$ হল প্রতিস্থাপিত দ্যোতিতের বিলোপ। মেটানেমির ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপিত দ্যোতিত চিহ্নায়নের পর্যায়ে উপস্থিত থাকে।

$f(S\ldots S')S \approx S(-)s$

সীমা অতিক্রম না করার দরুণ দ্যোতক এবং দ্যোতিতের ভেদরেখা অক্ষুণ্ণ থাকে চিহ্নায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রতিরোধ লক্ষ করা যায়। 'Mouth of the river' যুক্তিহীন মন্তব্য কিন্তু 'All the world's a stage' নয়। এভাবে চিহ্নায়ন একটি স্বতন্ত্র গাণিতিক প্রকাশ হয়ে ওঠে।

সাত

লাকাঁর মতে, বিষয়ী ভাষার কারণ নয়, তার প্রভাবে গড়ে ওঠা একটি ধারণা। লাকাঁ বিষয়ীকে প্রাথমিকভাবে তিনভাগে ভাগ করেছেন –

1. নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ী (Impersonal Subject). It, যার সম্পর্কে কথা বলা হয়।
2. নামহীন, পারস্পরিক বিষয়ী (Anonymous Reciprocal Subject), যা অন্য যেকোন অপরের সমান এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য, অপরের যোজ্যতা দ্বারাই চিহ্নিত।
3. ব্যক্তিগত বিষয়ী (Personal Subject), যে আত্মকথন দ্বারা অনন্য।

এই বিভাজন পরবর্তী সময়ে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে বিষয়ী (subject) এবং আত্ম-র (ego) ধারণা তৈরি করছে, যেখানে আত্ম কল্পিত মাত্রা এবং বিষয়ী প্রতীকী মাত্রার অংশ। লাকাঁর বিষয়ী হল নির্জ্ঞানের বিষয়ী, তার চিহ্ন হল ক্যাপিটাল এস (S)। যদিও ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে তিনি $ চিহ্নটি ব্যবহার করতে থাকেন, কারণ তাঁর মতে বিষয়ী অবশ্যম্ভাবীভাবে একটি খণ্ডিত ধারণা। বিষয়ী ভাষার মধ্যে কোন একটি উপস্থাপনের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিতভাবে উপস্থিত, এমনকি তার অভাবও একধরনের উপস্থিতি হতে পারে। এই আত্ম-উপস্থাপন ভাষার বিবিধ দ্যোতকের সাহায্যে বিষয়ী লাভ করে এবং উপলব্ধির দর্শনে তা ধরা পড়ে। প্লেতোর (আনুমানিক ৪২৭/৪২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ – ৩৪৭/৩৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) শিল্পের মত তারাও thrice removed form the reality, ভাব থেকে বস্তু এবং বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। বিষয়ীর আত্মজ্ঞান থাকে না, ফলে ভাষায় সর্বদাই দ্বিখণ্ডিত বিষয়ী উপস্থিত থাকে। ইক্রিস-এ (১৯৬৬) লাকাঁ বলেন –

The effect of language is the cause introduced into the subject. By virtue of this effect, he is not the cause of himself. His cause is the signifier, without which there would be no subject in the real. But this subject is what this signifier represents, and it can never represent anything except for another signifier, to which, from the point on, the listening subject is reduced.১২

ফলে, আমরা বিষয়ীর কথা বলি না, সে নিজের কথা বলে-

We don't speak to the subject. That speaks of him, and it is there that he apprehends himself –and all the more necessarily so since, before he disappears as a subject beneath the signifier that he becomes because of the sole fact that that addresses him, he was absolutely nothing.১৩

নব পরিভাষায় একেই লাকাঁ signifiance বলেছেন। সোস্যুর দেখিয়েছিলেন, চিহ্ন কোন শব্দ/ নাম/ বস্তু নয়, একটি ধ্বনি বা চিত্র এবং ভাবের সংযোজক মাত্র। দ্যোতক হল ধ্বনি বা চিত্র এবং ভাবটি দ্যোতিত। অর্থ দ্যোতক এবং দ্যোতিতের আন্তঃসম্পর্কের উপরে নির্ভরশীল নয়, কোন নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে অন্যান্য দ্যোতকের নিরিখে উদ্দিষ্ট দ্যোতকের অবস্থানের উপরেও নির্ভর করে। লাঁকার মতে, দ্যোতকের চলন অর্থ তৈরি করলেও তা তৈরি করে নির্জ্ঞানে, দ্যোতনার শৃঙ্খলে তার আভাস পাওয়া যায় মাত্র। এখানে দ্যোতিতের অনুপস্থিতি বা দ্যোতিতের দ্যোতকে পরিণত হওয়াই মূল কথা, যেখানে চিহ্নায়ন তাৎপর্য গঠনের পরিবর্তে তাৎপর্য গঠনের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে মাত্র। তাঁর মতে বিষয়ীর বিলোপ ঘটে রূপান্তরিত হয় দ্যোতকে, এই বিষয়ীর বিলোপ ঘটে দ্যোতক এবং দ্যোতিতের সীমারেখায়, যা থেকে significance তৈরি হয়।

আট

গঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞাপক শৃঙ্খলের (signifying chain) ধারণা লাকাঁ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। দ্যোতক এবং দ্যোতিতের দ্বান্দ্বিক চলনে বিমূর্ত দ্যোতকের শৃঙ্খল তৈরি হয়, যাকে লাকাঁ বলেছেন –

Synchronic structure of the language material in so far as in that structure each element assumes its precise function by being different from the others.১৪

তাঁর মতে দ্যোতিতের শৃঙ্খল হল –

Diachronic set of the concretely pronounced discourses, which reacts historically on the first, just as the structure of the first governs the pathways of the second.১৫

স্যোসুরের লাঙ্ ও পারোলের ধারণার চেয়ে এই ধারণা খানিক আলাদা, এককালিক ভাষাবিজ্ঞান কথন ও ভাষার মধ্যে অবস্থিত শব্দের অবস্থান এবং সংস্থা নিয়ে আলোচনা করে এবং কালগত ভাষাবিজ্ঞান তাদের সংযোগ নয়, কোন সংস্থাবিহীনভাবে তাদের প্রতিস্থাপনকে নির্দেশ করে। লাঙ্ পারোল দ্বারা নির্ধারিত, যেমন দ্যোতিত দ্যোতকের দ্বারা নির্ধারিত হয়। লাঙ্-এ এমন কিছু থাকতে পারে না, যা পারোলে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন কথন বা লেখনীতে এমন দ্যোতক থাকে না যার অর্থ দ্যোতিতে প্রকাশ হয়নি। সোস্যুর লাঙ্ বলতে বোঝাতে চেয়েছেন যেকোন ভাষার অমূর্ত ব্যবস্থা (abstract system), যে ব্যবস্থার সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট ভাষা বলা বা বোঝা যায়। পারোল হল ভাষার বাস্তবিক ব্যবহার বা বাক, যা ভাষিকের অধিকারে থাকে। লাকাঁর মতানুসারে ভাষার প্রতীকীকরণ সামাজিক ব্যবস্থায় সহভাগী হওয়ার মানুষ তার ব্যক্তিসত্তা থেকে সরে যায়। ইদ বা অবচেতন মনের বিক্ষুব্ধ আবেগ ইগোকে স্থিরতা থাকতে দেয় না। মিরর স্টেজে পরাবর্তক স্তরে ব্যক্তির আধার বিচলিত হয়ে পড়ে। উত্তর গঠনবাদে ব্যক্তির এই উচ্ছেদ এবং অর্থের একক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর গঠনবাদের প্রায় সমস্ত অবধারণ গঠনবাদের, কেবল একটি পার্থক্য রয়েছে সোস্যুরের ভাষা দর্শনে চিহ্ন দ্যোতক এবং দ্যোতিতের সমুচ্চয়, চিহ্ন এদের সাহায্য ভাষার একক হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। কিন্তু উত্তর গঠনবাদে এই জোড় খুলে অর্থের একক এবং নিশ্চিত নির্ধারণ লোপ পেয়েছে। অর্থের ঐক্যের নিরসনের ফলে উত্তর গঠনবাদে অর্থের প্রধাগত ধারণার বিপরীতে অগণিত সম্ভাবনা খুলে গেছিল। এমতাবস্থায় লাকাঁর বিশ্লেষণ সাহিত্যের পাঠে মনোবিশ্লেষণের স্বরূপকে বদলে দেয়। লাকাঁ শব্দের নিশ্চিত অর্থের ধারণাকে ভেঙে দেন, দ্যোতক হয়ে ওঠে ভাষার একক, দ্যোতিতের অভাব এবং দ্যোতনার বিনির্মাণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইত্যপূর্বে সাহিত্যকে ব্যবচ্ছেদ করে তার অন্তর্গত অবচেতনের উৎপ্রেরক সম্পর্কে আলোকপাত করত মনোবিজ্ঞান। কিন্তু লাঁকা সাহিত্যের উপাদান ব্যবহার করে মনোবিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব নিরসন করলেন, প্রমাণ করলেন অবচেতন ভাষার ন্যায় গঠিত, তাই ভাষিক কাব্যিক উপাদান ব্যবহার করে অবচেতনকেও পাঠ করা যেতে পারে। ভাষাগত চিহ্ন একটি অভাব বা অনুপস্থিতির দ্যোতক এবং জাঁক লাকাঁ ভাষাবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের যুগ্ম সহায়তায় ভাষার গঠনবাদী রূপটি বিনির্মাণ করে উত্তর-আধুনিক পাঠে নবতর সংযোজন করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. Lacan, Jacques. (1988). *The Seminar. Book I. Freud's Papers on Technique*, 1953-54. Trans. John Forrester. New York: Nortion; Cambridge: Cambridge University Press, p. 107

২. Lacan, Jacques. (1977). *Écrits: A Selection*. Trans. Alan Sheridan. London: Tavistock Publications, p. 45

৩. Freud, Sigmund. (1913). *The Interpretation of Dreams*. Trans. Brill, A. A. New York: The Macmillan Company, p. 357

৪. Lacan, Jacques. (1977). Ibid. p. 152

৫. de Saussure, Ferdinand. (1915 [1966]). *Course in General Linguistics*. trans. Wade Baskin. New York: McGraw-Hill, p.113

৬. Lacan, Jacques. (1993). *The Seminar. Book III*. The Psychoses, 1955-56. Trans. Russell Grigg. London: Routledge, p. 185

৭. Lacan, Jacques. (1993). *The Seminar. Book V*. 1968. Trans. Russell Grigg. London: Routledge, p. 8-10

৮. Lacan, Jacques. (1993). *The Seminar. Book III*, 1955-56 . 1968. Trans. Russell Grigg. London: Routledge, p. 32

৯. Ibid, p.137

১০. Lacan, Jacques. (1977). Ibid, p. 414-415

১১.Shakespeare, William. (1623). *As You Like It*, Act II, Scene VII, Line 139. *Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories, & Tragedies*: Published According to the True Original Copies. London: Printed by Isaac Iaggard, and Ed [ward] Blount. p. 194

১২. Lacan, Jacques. (1977). Ibid, p. 835

১৩. Jacques Lacan, Écrits (Paris: Editions du Seuil, 1966), translated in Joël Dor.

১৪. Lacan, Jacques. (1977). Ibid, p. 126 to the Reading of Lacan, pp. 138–139.

১৫.'The Freudian Thing' (La chose Freudienne, 1956) as translated by Anthony Wilden in Jacques Lacan, The Language of the Self: The Function of Language in Psychoanalysis (Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1968), p. 122, note 85

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

ভুল বুঝি: শিক্ষা ব্যবস্থাতে analogy সৃষ্টি এবং তার ত্রুটির বিশ্লেষণ

আত্রেয়ী মুখার্জি
আই আই টি খড়গপুর

ARTICLE INFO

Article history:
Received 23/04/2023
Accepted 07/05/2024

Keywords:
counterfactuality theory,
cognitive grammar model,
analogy

Guest Editors
Agniv Dutta
Ratul Ghosh
Patitpaban Pal

Organised by: শব্দ /ʃɔbd̪o/

ABSTRACT

ভাষা সম্বন্ধে তর্কটি শুরু হয় মানুষের যে কোনো ভাষা তৈরি করার ক্ষমতা বা I-language এর বৈশিষ্ট্য খুঁজতে গিয়ে। Sapir-Whorf hypothesis অনুযায়ী ভাষাতে তৈরি করা বৈশিষ্ট্যসূচক বর্গ এবং বিভাগগুলো বর্ণনা করার system এর বাইরে যা আছে, সেটাকে information-এ রূপান্তরিত করার সময় শুধু প্রভাব ফেলে। কিছু ভাষাবিদ মনে করেন যে ভাবনা বা thought, ভাষার থেকে স্বাধীন রুপে খানিকটা চেতনার পর্যায় মানুষের চেতনে বিদ্যমান। Ascent routine নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে মানুষ দেখেছে যে মানুষের mind যেটাকে বাংলায় মোটামুটি চেতন বলা যেতে পারে, ভাষার শ্রেণী এবং বিভাগের মধ্য দিয়ে নিজের বর্ণনা নিজে করতে সক্ষম। সেটা কতটা ঠিক বা সত্য হতে বাধ্য সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।এই প্রশ্নগুলো তখন গুরুতর হয়ে ওঠে যখন আমরা কোন কিছু বোঝাতে analogy ব্যবহার করি। Analogy তৈরি করার ক্ষেত্রে, যিনি তৈরি করছেন তিনি proposition থেকে সেটা তৈরি করছেন(post festum analogy)। সেখানে তার mind এর কাছে রয়েছে কিছু সুস্পষ্ট বিভাগ এবং সেগুলোকে কোন একটা নিয়মে সম্পর্কিত করার রীতি। সে তার চেতনের মধ্যে সঞ্চিত knowledge বা কোন কিছুর জ্ঞান হিসেবে একটি প্রতিরূপ বা representation এর বিবৃতি দিচ্ছে সেগুলির সাহায্যে। আবার যে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করছে, সে সেই category গুলোর, নিজের চেতনে থাকা representation এর মাধ্যমে, চিত্র তৈরি করছে(heuristic analogy)। এই দুটি proposition এর মধ্যে যা পার্থক্য সম্ভব সেগুলি এমন দুর্বোধ্যতা তৈরি করতে পারে যেগুলো সাধারণ intelligence test গুলোতে এবং বাচ্চাদের ক্লাসের পরীক্ষার ফলেরও মারাত্মক ত্রুটি প্রকাশ করে।এই সূত্রে আমরা যদি Wason এর card selection test এ দেওয়া প্রশ্ন এবং তার সঠিক প্রত্যাশিত উত্তর এর বিশ্লেষণ করি; দেখা যাবে যে সেই উত্তরটা subject এর কিছু বর্গগত system of knowledge এর উপেক্ষা আগের থেকে ধরে নেয় বা presuppose করে কিন্তু সেটা প্রশ্নটা দেওয়ার সময় স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয় না সেরকমটা শুধু নয় নয়, হয়তো সম্ভব ও নয়। এই পেপারে রাখা প্রস্তাব, counterfactuality র theory এবং Ronald Langacker এর cognitive grammar এর model এর মাধ্যমে প্রমাণ করার প্রয়াস করবে যে wason এর card selection test এ দেওয়া condition এবং hypothesis থেকে প্রত্যাশিত উত্তরে পৌঁছন অযৌক্তিক। তার থেকে confirmation bias এর প্রমাণিকরণ ত্রুটিপূর্ণ। এটার থেকে আমরা এটাও দেখতে পাই যে কিভাবে সাধারণত technical writing বা academic writing এর রীতিতে অন্তর্নিহিত দ্ব্যর্থতা এবং অস্পষ্টতা পক্ষপাতের প্রবণতা তৈরি করতে প্রভাব ফেলে।

email id:atrayee1994mukherjee@kgpian.iitkgp.ac.in

ভূমিকা

ভাষা, চিন্তার এক ধরনের প্রতিরূপ। ভাষা সম্পূর্ণরূপে মানুষের চিন্তার বর্ণনা করতে পারে কিনা সেটি বিতর্কিত সমস্যা এবং এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। ভাষার system বা ব্যাকরণ (grammar) কে যদি যন্ত্রের metaphor দিয়ে দেখা এবং বিশ্লেষণ করা যায় (এটা ধরে নিয়ে যে এ ধরনের বিবরণ খুবই reductive) তার মধ্যে রয়েছে structure-এর টুকরো (মৌখিক ভাষাতেও এটি শুধু আওয়াজগুচ্ছে সীমিত নয়, structure বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে যে কোন কিছু হতে পারে) এবং সেই টুকরো গুলোর সাথে সম্পর্কিত, উল্লেখিত গঠন রীতির system-এর, বাইরে কিছু। ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, structure এর সাথে সম্পর্কিত এ সব বিষয়বস্তুর যদি একটা set তৈরি করা যায়, যেখানে প্রত্যেক সদস্য এই যুক্তি দিয়ে আবদ্ধ যে সেই সদস্য কাঠামোগত system এর বাইরে অধিষ্ঠিত এবং এই system- এ, structure-এর টুকরো গুলোর সাথে এদের সকলের কোন সম্পর্ক আছে; তাহলে এই set-এর প্রত্যেক সদস্যকে ভাষাবিজ্ঞান বা ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে "মানে" বা "meaning" বলা যায়।

প্রত্যেকটা structure-এর system যেমন অনেক সম্ভাব্য ব্যবস্থার মধ্যে নিয়মবহির্ভূতভাবে একটি নির্বাচিত ব্যবস্থা, structure-এর সাথে সম্পর্কিত "মানে" বা "meaning"-ও একটা system এবং অনেক সম্ভাব্য ব্যবস্থার মধ্যে নিয়মবহির্ভূতভাবে একটি নির্বাচিত ব্যবস্থা। প্রত্যেকটা structure-এর system একইভাবে , তার বাইরে যা যা রয়েছে তাদের মধ্যে, formal বা প্রচলিত প্রথানুযায়ী সীমানা তৈরী করে না। প্রত্যেকটা system একই বস্তু, বিষয়, ঘটনা ইত্যাদি চয়ন করতে বাধ্য নয় এবং মোটামুটি এক ধরনের কিছু হলেও, সীমানাও যে একই বৈশিষ্ট্য-গুচ্ছ চয়ন করে কাটা হবে তার কোন মানে নেই। "Meaning" এর system কে, ভাষাতত্ত্বে এবং ভাষাবিজ্ঞানে দেখার এবং বিশ্লেষণ করার বহু দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

যেকোনো একটা বা একাধিক system এর মধ্যে কোন structure-এর টুকরোর সাথে সম্পর্কিত মানে জানার জন্য কোন ব্যক্তিকে অন্য সম্পর্কিত structure- এর টুকরোর সাথে সম্পর্কিত "meaning" এর ব্যাপারে আগের থেকে জানতে হবে।এটিকে ভাষাতত্ত্বে "circularity of meaning problem" বলা হয়। মানব প্রজাতির cognitive (এখানে জ্ঞানভিত্তিক বা জ্ঞান সূচক বলাটা আরেকটু সংকুচিত একটি সেট বোঝায় যদিও অনুবাদ হিসেবে সেটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য) দক্ষতার মধ্যে প্রাথমিক এবং মৌলিক হল সেটি, যেটি তাকে অনেক এলোমেলো আলাদা আলাদা জিনিসের মধ্যে এক ধরনের বা এক প্রকারের জিনিস সনাক্ত করার ক্ষমতা দেয়। একই প্রকারের বিষয়-বস্তু-ঘটনা বারংবার ঘটলে মানব প্রজাতির জ্ঞানীয় ক্ষমতা সেটিকে একই ধরনের বিষয়-বস্তুর-ঘটনার পুনরাবৃত্তি বলে চিনতে পারে। এখানে প্রকাশ পায় তার type বা প্রকার বোধ, তার আদর্শ সৃষ্টি করার সক্ষমতা এবং ভাষার মাধ্যমে সে ক্ষমতার ব্যবহার করা যেটি সাধারণত পৃথিবীর অন্য পশু পাখির মধ্যে এখনো অবধি পাওয়া যায়নি। যদিও Sarah নামক এক শিম্পাঞ্জি, যাকে মানব সৃষ্ট প্রতীকী ব্যবস্থার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল; সে সম্পর্ক জাতীয় বিষয়ের বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি সনাক্ত করার ক্ষমতা দেখায়(Premack 1978)। কিন্তু এ ধরনের ভাবমূলক সম্পর্কের ধারণার পুনরাবৃত্তি চিনতে পারার জন্য শিম্পাঞ্জি টাকে মানুষের তৈরি প্রতীকী ব্যবস্থা শিখতে হয়েছে। নিজস্ব শিম্পাঞ্জি সমাজে নিজেদের চালিকাশক্তির ভিত্তিতে তারা না এ ধরনের system তৈরি করার প্রয়োজন মনে করেছে, না তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব হয়েছে।

এই আদর্শ সৃষ্টি করার ক্ষমতার মধ্যে পরছে প্রতীক সৃষ্টি করার ক্ষমতা। এক প্রকারের বিষয় বা বস্তুর বা ঘটনার গুচ্ছের মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা সদস্য একেবারে অভিন্ন নয়। তাদের মধ্যে কোন একটি মিলের

(সেটি সব সময় সরাসরিভাবে মানব ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ না ও হতে পারে) ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে তাদেরকে একই গুচ্ছে ফেলার যুক্তি। এর মানে ক্ষমতা হিসেবে দেখতে গেলে, আলোচ্য ক্ষমতা আসলে কোন বিষয়কে বা বস্তুকে বা ঘটনাকে বা সম্পর্ককে, কোন এক নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেটির বৈশিষ্ট্যেকে ভাঙার। তারপর কোন এক বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়ে, প্রত্যেক সদস্যের প্রতিনিধি হিসেবে একটি প্রতীক বা abstraction তৈরি করা, যেটিকে আমরা বলব "concept" বা "schema"। এ ধরনের বস্তুসম্পর্কহীন, ভাবমূলক একটি সারাংশ প্রকারের বিষয় কল্পনা করা এবং সেটিকে প্রকাশ করার জন্য একটা বা একাধিক স্ট্রাকচারের টুকরো ব্যবহার করার ক্ষমতা কে আমরা "Analogy" তৈরি করার ক্ষমতা বলে থাকি।

Douglas Hofstadter তর্ক করেছেন যে আসলে মানব প্রজাতির সকল cognitive ক্ষমতার মূলে হলো এই "analogy" তৈরি করার ক্ষমতা (Hofstadter, 2001. Ch- 15)। এই analogy তৈরি করার ক্ষমতাকেও বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা যায়। এই নিবন্ধ analogy-র একটি সীমিত কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবে। শিক্ষা ব্যবস্থায়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং ছাত্রদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা বিচার করার জন্যে তৈরি করা পরীক্ষাগুলোতে, ব্যবহার করা প্রয়োগসিদ্ধ ভাষার System কতটা কোন ধারণা একটি চেতনার systemথেকে আরেকটি চেতনার সিস্টেমে বহন করতে সক্ষম বা অক্ষম সেটি এই গবেষণা পত্র একটি মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উদাহরণ দিয়ে যাচাই করবে।
ভাষার বিবর্তন আসলে যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বার্থেই কিনা এটি একটি জটিল বিতর্কের বিষয়। মানব মস্তিষ্কে কিছু এমন আছে কিনা যা শুধু ভাষার বিকাশের কারণেই বিদ্যমান এটি বলা মুশকিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক মডেলই রয়েছে। সেগুলো প্রেরক, গ্রাহক, বার্তা, মাধ্যম, এনকডিং (encoding) এবং ডিকোডিং (decoding), আওয়াজ , প্রসঙ্গ এবং প্রতিক্রিয়া দিয়ে শুধু ঘটমান বিষয়টা কে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম তবে কোনটাই ভাষার বিবর্তনকে ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনা। যদি সত্যিই ঘটমান বিষয়টা যোগাযোগ স্বার্থে এরকম মডেল(model) দিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করতে সক্ষম হয় তাহলে সেটি সময়ের সাথে পাল্টাতে থাকবে কেন?
Fodor, language of thought hypothesis এ প্রস্তাব রেখেছেন যে আসলে ভাষা বিবর্তিত এবং বিকশিত হয়েছে একটি জ্ঞানীয় যন্ত্র হিসেবে (Fodor, 1975, 2008)। মানব মস্তিষ্কের এবং কাজেই চিন্তার বিবর্তন হতে থাকে, এবং তার পরিসংখ্যানগুলির চরিত্রায়ন (categorization)করার system যোগাযোগের স্বার্থে বারংবার পুনর্গঠিত হতে থাকে।
তাহলে আমাদের দু ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়:

ক) মানবজাতির বিষয়-বস্তু- ঘটনার প্রাচুর্য কেন পৃথিবীর অন্য সজ্ঞান জীবজন্তুর ভাষা দ্বারা যোগাযোগ্য নয়? তারা এই অসীম পরিমাণ থেকে কেন বঞ্চিত? শুধু মানব মস্তিষ্কেরই কেন এত বিশাল বিষয়বস্তুর সম্ভার, যেটার জন্য এই ধরনের system এর প্রয়োজন?

খ) যদি এই ধরনের system যোগাযোগের জন্য তৈরি হয় তাহলে এই system দিয়েই মিথ্যা বলা সম্ভব কিভাবে? (Reboul, 2015)System টা কি তাহলে যোগাযোগের জন্য তৈরি নয়? না মানব যোগাযোগ system বলতে আমরা কি বুঝি সেটাকেই আমাদের খতিয়ে দেখা দরকার।

Szamado এবং Szathmary(2006) তে দেখিয়েছেন যে এই দু ধরনের প্রশ্নের কোন যথাযথ উত্তর এখনো অবধি পাওয়া যায়নি। যদি শুধু structure-এর টুকরোর সাথে সম্পর্কিত system এর বাইরের বিষয়-বস্তু-ঘটনা দিয়ে সংযুক্ত যৌগিক structure- টার অর্থ বার করার চেষ্টা করা হয়, তা দিয়ে

কোনভাবে বক্তার উদ্দেশ্য সহিত তার বাক্যের মানে অনুমান করা যায় না। এর থেকে বোঝা যায় যে ঘটমান বিষয়টাতে encoding-decoding প্রক্রিয়ার বাইরেও আরো অনেক কিছু আছে। তাই শুধু একা এই মডেলটা ভাষা বিষয়ের আকৃতির একাংশ ধরলেও পুরো বিষয়টাকে বর্ণনা করতে অক্ষম। এই প্রসঙ্গে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাষাতত্ত্বের দর্শন এবং ভাষাবিজ্ঞান, দুটোই মেনে নিয়েছে।
ভাষার বিবর্তন নিয়ে যারা কাজ করেছেন, এটি অনেক পরে বিবেচনা করে দেখা হয়েছে যখন Scott Phillips, 2015 এ ভাষা বিবর্তনের নতুন এক দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করেন। ওনার মতে সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা code model দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবর্তন কোন সামাজিক, জৈবিক বা সংস্কৃতিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়।

প্রত্যেক যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে signal থাকে। এছাড়া ও মানব যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক একটি ক্ষমতা রয়েছে। এটিকে উনি বলেছেন ostensive communication system। মানব বক্তা এবং শ্রোতা শুধু signal আদান প্রদান করেন সেরকমটা নয় সেখানে একে অপরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে কিছু অনুমাপক (measurer) সৃষ্টি হয়। যা শ্রোতা বোঝে সেটা শুধু স্ট্রাকচারের টুকরোর অর্থ নয় বরঞ্চ স্ট্রাকচারের টুকরোর অর্থ এবং প্রসঙ্গ এবং তার অনুমানের system এর ফলাফল। এর দ্বারা কিছু linguistic conventions প্রতিষ্ঠা হয়। 1989 এ Grice, natural meaning এবং non-natural meaning এর মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেন। যেটি natural সেটির ভিত্তি কোন ধরনের সাংসারিক, প্রাকৃতিক কার্যকরণের বা causality র মধ্যে রয়েছে। এটি factive হয় তখন যদি - ক এর অর্থ গ হয় তাহলে ক কে গ entail করে অর্থাৎ যা তথ্য ক এর মধ্যে রয়েছে সেই তথ্যটা গ - এর মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে non natural meaning কে আমরা factive বলতে পারিনা কেননা - ক এর অর্থ গ হলে ক এর মধ্যে যা তথ্য আছে সেই তথ্য গ -তে থাকতে বাধ্য নয়।

Grice, "মানে" বিষয়টাকে স্ট্রাকচারের টুকরোর সাথে সম্পর্কিত ধারণা বাদেও আরো বেশি শ্রোতার ওপর প্রভাব টাকেও এর মধ্যে ধরে দেখেছেন। Grice এর মতে শ্রোতার ওপর বক্তব্যের প্রভাব টাই বক্তব্যের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এই প্রাথমিক উদ্দেশ্য যখন শ্রোতা বুঝতে পারে, তার সেই বোধটা, অপেক্ষাকৃত দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

Millikan বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান এর পরিপ্রেক্ষিতে Grice এর non natural meaning (Grice, 1957,1969,1982) এর মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন। Millikan এর মতে 'মানে' Meaning বিষয়টা একেবারেই প্রচলিত একটা বিষয় এবং সেখানে encoding-decoding মডেলটাই যথেষ্ট। ওর মতে Natural meaning, non natural meaning থেকে আলাদা শুধু factivity দ্বারা, এখানে কর্তৃত্বের বা agency-র প্রশ্ন আসেনা। তার ফলে এখানে মনস্তাত্ত্বিক কোন দিক নেই। যদিও Millikan বলছেন যে একটি চিতা বাঘের বিপদ আশঙ্কায় তৈরি আওয়াজকে কোনদিনও মানব ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব নয় কিন্তু এখানে তার মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তিনি খুব স্পষ্টভাবে বোঝাননি (Millikan, 2013)। মানব ভাষার system-e - "এখানে বিপদ আছে এবং তোমাকে সবচেয়ে কাছের গাছটিতে উঠে যেতে হবে"-এ ধরনের উক্তিতে রয়েছে মানব চিন্তার বা মানব-বুদ্ধির কিছু মাপকাঠি, যা দিয়ে সে কোন জায়গা কে স্পষ্ট ভাবে উদ্দেশ্য করতে পারে এবং তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে পারে যেমন "তোমার কাছে" বা "তোমার থেকে দূরে"। এগুলো কতটা encoding-decoding মডেল দিয়ে বর্ণনা করা যায় সেটা উনি খুব স্পষ্টভাবে বোঝাননি। signal একটা গোটা জিনিস যেটির কোন টুকরো হয় না, যেগুলোকেও signal বলা যেতে পারে। তাই সম্পূর্ণরূপে মনস্তাত্ত্বিক দিকটাকে অবহেলা করা হয়তো

ঠিক নয়। তাছাড়াও এই ধরনের মতবাদের আরো কিছু সমস্যা রয়েছে যেগুলো Anne C. Reboul দেখিয়েছেন।

একটা semantic unit সবসময় যোগাযোগের কাজে লাগে না। ঘটমান বিষয়টা এবং মানব মস্তিষ্কের যাবতীয় আগের যত অভিজ্ঞতা তার মস্তিষ্কে connect (কোন একটা যুক্তিতে তৈরি বিষয়ের সাথে আরেকটি বিষয়ের সম্পর্ক তৈরি হলো) করে। সেখানে রয়েছে তার -
>সংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা
>সামাজিক অভিজ্ঞতা
>কোন এক নির্দিষ্ট শাখার অনুযায়ী সামাজিক গোষ্ঠী ব্যবস্থার একটা কাঠামো ধরে নিয়ে আনুষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা
>ভৌগোলিক অভিজ্ঞতা
>অবস্থাগত অভিজ্ঞতা

কোন একটা সময় একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রসঙ্গ,স্থান, কাল, পাত্র ছাড়াও রয়েছে এতগুলো আরো গুণক, যার দ্বারা তৈরি হচ্ছে সেই মুহূর্তে একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়া। তাহলে বলা যায় যে এটি "doubly articulated"বা এই প্রক্রিয়াতে দু ধরনের উচ্চারণ হচ্ছে।
যদি ধরে নিই শুধু মৌখিক ভাষা আমাদের এই মুহূর্তের কার্যক্ষেত্র, তাহলে একটা স্বরের দলকে আমরা একসাথে করতে পারি যেখানে রয়েছে-
-- আওয়াজের বা শব্দের স্বর,
-- নমুনা অনুযায়ী আওয়াজ গুচ্ছ কে সাজানোর একটা স্তর,
-- প্রত্যেকটি আওয়াজ গুচ্ছের সাথে system এর বাইরে কিছু সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে যেখানে সেই স্তর,
-- এবং সেই স্তর যেখানে যৌগিকভাবে যন্ত্রটা এবং system এর বাইরে যা আছে (কাঠামো অনুযায়ী তৈরি শ্রেণীবিন্যাস), তা একসাথে যুক্ত হচ্ছে।

এছাড়াও, আরেকটি স্তরগুচ্ছ তৈরি হচ্ছে।একটা semantic একক কিন্তু এটা যোগাযোগ প্রক্রিয়ার কাজে লাগছে না কারণ যোগাযোগটি হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর গুচ্ছগুলোকে ব্যবহার করে।
যদি আমরা সবচেয়ে ছোট একটা স্ট্রাকচারের টুকরো ধরে নি, যেটার যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে একটা মানে আছে, তাহলে সবচেয়ে ছোট হলো morpheme। মানব মস্তিষ্ক যেভাবে ট্যাক্সোনমি দ্বারা কোন জিনিসের ব্যাপারে জ্ঞান কে শ্রেণী বা জাতিতে ভাগ করে সেই প্রত্যেকটি ভাগের সব সময় অন্য ভাগের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। একটি কাজের এমন সম্পর্ক রয়েছে কর্তার সাথে যে কর্তা ছাড়া সাধারণত কাজ কে চিন্তা করা মুশকিল। আবার শুধু যদি কোন সত্তা বা ঘটনা বা অবস্থার ব্যাপারে চিন্তা করা যায় তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটির অস্তিত্বের ব্যাপারে(এখানে অনঅস্তিত্বের ব্যাপারে কথা বলতে গেলেও যে অস্তিত্ব ধরে নিতে হয় সেটাও অস্তিত্ব category- তে ধরে নেওয়া হচ্ছে) চিন্তা করতে হয়, যেটি একটি কাজ।

তাই যদি আমরা প্রত্যেকটি semantic একককে একটি প্রস্তাব হিসেবে দেখি তখন নতুন ধরনের বাক্য তৈরি করার ক্ষমতা নিয়ে একটি প্রশ্ন ওঠে। যেহেতু আমাদের মানব ভাষা ব্যবস্থার কাঠামো অনুযায়ী এক ধরনের আওয়াজ গুচ্ছ সাজাবার নকশা, একটা স্ট্রাকচার দেয় যেখানে বারবার পুনরাবৃত্তি (এখানে বারবার এবং পুনরাবৃত্তি দুটি একসাথে লেখা হলো কারণ স্ট্রাকচারটি বারংবার একটি পুনরাবৃত্তিকেও পুনরাবৃত্ত হওয়ার সুযোগ দেয়) করার একটা জায়গা রয়েছে সেখানে একটি নতুন

ধরনের উক্তি বোঝার জন্য প্রত্যেকটি উক্ত স্ট্রাকচারের টুকরো আগে থেকে জানার প্রয়োজন হয় না। কোন মানুষই বা সব মানুষ মিলেও থিওরিটিক্যালি সব সম্ভাবনা দিয়ে corpus তৈরি করার ক্ষমতা রাখেনা। যদি সেটা না হয় তাহলে আমরা "infinity" বিভাগকে এটির বর্ণনায় কিভাবে আনতে পারি? (Li and Hombert, 2002, p, 196). এটিকে আরেকটু খতিয়ে দেখলে এই সম্ভাবনা বিষয়টির কোন epistemic প্রমাণ নেই। যে জিনিস metaphor বা পুরোটাই মানব প্রকল্পিত construct এমন একটা স্তরে, আদর্শিক (idealistic) আকৃতির মত (এখানে আকৃতি শব্দটি বেছে নেওয়ার কারণ হল এই যুক্তিতে আমরা শুধু বিস্তারিত ভৌগোলিক স্থান এর মাত্রার (dimension) epistemic প্রমাণ পেয়েছি) যেখানে স্ট্রাকচার এর সাথে কোন স্ট্রাকচারের সিস্টেমের বাইরের কিছুর মানব অভিজ্ঞতায় সম্পর্ক নেই। এই ধরনের category, যেখানে আমরা সম্ভাবনা জাতীয় বস্তুর কল্পনা করি, সেগুলো counterfactually তৈরি হয়। সম্ভাবনা তৈরি করার structure, structure এর বাইরে যা আছে তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখে না, যেটা আসলে কোন এক যুক্তির ভিত্তিতে আরেকটি structure এর সাথে যোগাযোগ রাখে, যেটা structure এর বাইরে কিছুর সাথে যোগাযোগ রয়েছে।

তাই Millikan এর কাঠামোতে ত্রুটি হল এই যে সবকিছুই প্রচলন থেকে শেখা সম্ভব নয়। মানব মস্তিষ্ক যে ধরনের আচরণ উক্তি হিসেবে তৈরি করে সেগুলো সব তার অভিজ্ঞতা নয়। উনি ধরেছেন সব ধরনের অভিজ্ঞতা, প্রসঙ্গ, স্থান, কাল, পাত্র মিলে একটি বিভাগকে, তার সাথে যুক্ত হয়েছে উক্তির শ্রোতা বা স্থান-কাল এর উপর ভরসার মাত্রা তৈরি করার ক্ষমতা বা সেটির উপর প্রভাব ফেলার ক্ষমতা (illocutionary force) (Millikan, 1984,2004,2005) এবং এটির সাথে যুক্ত হচ্ছে যুক্তিগতভাবে সম্পর্কিত উক্তি গুলোর system(scalar implicature) (Millikan,2005)।
পুরো যন্ত্রটার দ্বারা তৈরি আদর্শিক জিনিসটার আসলে একটি প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের illocutionary force থাকতে পারে। তারমানে যান্ত্রিক ফলের বাইরে ও কিছু একটা রয়েছে যা এই যান্ত্রিক ফলটির সাথে সম্পর্কিত।

Millikan 'proper function' বলে একটি বিভাগ তৈরি করেছেন। এই বিভাগে আমরা দেখব একটা জিনিসের নির্দিষ্ট কর্মকে। নির্দিষ্ট কর্ম একজন সত্তা নিরন্তর(অন্তত এক বারের চেয়ে বেশি) করে যায়। Millikan বলেছেন যে আসলে এটা দেখার প্রয়োজন যে কেন সেটি সত্তার বা স্ট্রাকচারের নির্দিষ্ট কর্ম। যদি সেটা সবসময় নাও হয়, প্রচলিত হওয়ার কারণে (দুটি মস্তিষ্কের যোগাযোগ সম্ভব হলে সেটি প্রচলিত, কোন ভাবে) সেটি নিশ্চয়ই কিছু সময় ধরে performative বা speech act ধরনের জিনিস তৈরি করেছে। Millikan এর কাঠামোটার ফ্রিকোয়েন্সি (frequency) বা পুনরাবৃত্তির হারের সাথে সম্পর্ক আছে। Millikan ভাষা বিবর্তন বা সময়ের সাথে পরিবর্তন হওয়ার কারণ বলেছেন -যে কোন একটা স্ট্রাকচারের টুকরো যখন অন্য একটি কাজ করতে শুরু করে দেয় তখন দ্বিতীয় কাজটি আগের কাজটিকে প্রতিস্থাপন করতে পারে বা স্ট্রাকচারটির আরেকটি কাজ হয়ে একই সাথে চলতে পারে।
Reboul এখানে first occasion argument লিখেছেন যে যদি তাই হতো তাহলে প্রথম বার যখন সেটাকে ব্যবহার করা হয় তখন কিভাবে শ্রোতা সব অভিজ্ঞতা, প্রসঙ্গ সবকিছু নিয়ে বক্তার কথা বুঝতে পারে? (Reboul, 2015)।

যদি কোন উক্তি দ্ব্যর্থক হয় তখন ভাষার যান্ত্রিক পর্যায়ে যা ফল আছে তার বাইরেও, যে বিষয়গুলি গুণক সেগুলো দিয়ে, সেই স্ট্রাকচারের টুকরোর মানে বোঝা হয়। তৃতীয় আরেকটি বড় সমস্যা হল যে প্রথমবার যখন সেই উক্তিটি ব্যবহার করা হচ্ছে তখন তার ফলে কি হচ্ছে সেটা কি করে বোঝা যায়? এটাই যে এ ধরনের উক্তির উত্তর হতে পারে, সেটা কিভাবে বোঝা যায়?

Anne C Reboul তাই তর্ক করেছেন যে ভাষা আসলে যোগাযোগের কারণে তৈরি হয়তো হয়নি। এটি আসলে তৈরি অন্য কিছুর জন্য হয়েছিল এবং যোগাযোগ এটার একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (Reboul, 2015)।

Scott- Philips বলেছেন যে আমাদের দুটি বিভাগ দরকার। একটি হলো natural code আরেকটি conventional code. (Scott- Phillips, 2015). Code model দ্বারা তৈরি এরকম কিছু স্ট্রাকচার বা code আছে, আবার কিছু code এমন আছে যেগুলোকে বলা হবে ভাষাগত বা 'linguistic code', যেখানে কোন জিনিসের মানে বুঝতে গেলে অনেক ধরনের অনুমান প্রয়োজন। যে ধরনের স্ট্রাকচার কোন একটা ছাচ বা নমুনা অনুযায়ী তৈরি সেরকম অনেক কিছু linguistic code এর মধ্যে রয়েছে কিন্তু সেই বিভাগে আরো অনেক ধরনের গুনক রয়েছে।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি 1966) Peter Cathcart Wason একটি ধাঁধা তৈরি করেন। এই ধাঁধাটি খুবই বিখ্যাত একটি ধাঁধা যেটি আসলে subject এর deductive reasoning পরীক্ষা করার জন্য তৈরি হয় অর্থাৎ যেকোনো একটা প্রতিষ্ঠিত সূত্রের জ্ঞান ব্যবহার করে কোন একটা ঘটমান বিষয়ের ব্যাপারে অনুমান তৈরি করার ক্ষমতা পরীক্ষা করে। এই নিবন্ধটি এই ধাঁধাতে তৈরি শর্তাধীন প্রস্তাবের স্ট্রাকচারটিকে আরেকটু খতিয়ে cognitive grammar এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবে। সাবজেক্ট কে চারটে কার্ড দেওয়া হয়। তাদের উপর A, K, 4 এবং 7 লেখা রয়েছে। যিনি পরীক্ষা করছেন তিনি দুটো বাক্য ব্যবহার করেন, একটি বাক্য একটি ঘটনার বিবরণ।
"If a card has a vowel on one side, then it has an even number on the other side."
অর্থাৎ যদি একটা কার্ডের একদিকে vowel বা ইংরেজি স্বরবর্ণ থাকে তাহলে অন্য দিকটিতে জোড় সংখ্যা থাকবে।
এই প্রস্তাব বা Proposition গঠন করা হয় if x then y বা যদি ক হয়, তাহলে গ হবে এ ধরনের যুক্তিসম্মত (logical) ভাষার অর্থাৎ গণিত যুক্তির স্বার্থে তৈরি করা ভাষার ছাঁচে।
তারপর সাবজেক্ট কে একটি বাক্য ব্যবহার করে নির্দেশ দেওয়া হয়-

"What are the minimal cards you should turn to confirm your hypothesis?"
অর্থাৎ সবচেয়ে কম card উল্টে উপরের দেওয়া প্রস্তাবকে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করতে হবে তাহলে ন্যূনতম কত কার্ড উল্টানো উচিত।

এই এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল ১২৮ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। তাদের মধ্যে ৫৯ জন বলেন যে দুটো কার্ড উল্টাতে হবে, A এবং 4।
৪২ জন বলেন যে শুধু A উল্টালেই হবে।

এই ধাঁধার একটি "সঠিক" উত্তর রয়েছে, যেটি আমাদের বিন্যাসের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। Wason এখানে বলেছেন যে সঠিক উত্তর A এবং 7 কার্ড দুটো উল্টানো। এর যুক্তি উনি দেখিয়েছেন যে যদি 7 লেখা কার্ডটির উল্টোদিকে জোড় সংখ্যা থাকে তাহলে hypothesis ভুল প্রমাণ হবে।

প্রথমেই যখন আমরা hypothesis এ দেওয়া proposition টা দেখব তখন চোখে পড়বে "one side" বা এক দিক এবং "other side" বা অন্য দিক, এই দুই শব্দগুচ্ছ। কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত ঘটনা এমন হয় যেখানে কার্ডগুলি এমন ভাবে রাখা রয়েছে যেখানে একটি

দিক নিরীক্ষণ করা যায় এবং অন্য দিকটি দেখতে গেলে উপস্থাপিত ঘটনাকে পরিবর্তন করতে হয় কার্ডগুলি উল্টে। এই প্রস্তাবের semantic গঠন এমন যে কোন উপস্থাপিত ঘটনার প্রামানিক তথ্যের ইঙ্গিত এখানে নেই। এই proposition টা এটি প্রতিষ্ঠিত করে যে কার্ড গুলির এক দিক এবং উল্টো দিক আছে (এই proposition টা presupposed হল) এবং এই দুটো দিকেই তথ্য রয়েছে যেটির মধ্যে আমরা একটি প্যাটার্ন আছে কিনা সেটি সুনিশ্চিত করতে চাই। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবের schema অর্থাৎ এক টুকরো কাগজ যেটির দুটো পিঠ থাকে তার কাঠামোর বিবরণ, বা structural description কে elaborate বা সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। আমরা জানতে পারছি যে কার্ড গুলির দুটো পিঠে তথ্য কেমন ধরনের আছে। লক্ষ্য করতে হবে যে এখানে কার্ড জাতীয় বস্তুগুলির কাঠামোকে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করা হয়েছে বিশদভাবে তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। Constructional schema-র ধরন একটি object বা বস্তুর (এখানে এটি হচ্ছে কার্ড যেটার দুপিঠে তথ্য আছে) elaborate বা সম্প্রসারিত করা। এখানে profiled (ধারণামূলক ভিত- এর কাঠামো থেকে একটি ছোট অংশের গুরুত্ব পাওয়াকে Langacker, profile করা বলেছেন।{Langacker, p.7}) বৈশিষ্ট্য হলো বস্তুটির পদার্থবিদ্যার বস্তুগত বিবরণ। কিন্তু যেটি এখানে প্রতিষ্ঠিত নেই সেটি হল vantage point.

নির্দেশ বাক্যের গঠনের ধরন আবার অন্যভাবে কিছু উপস্থাপিত ঘটনাকে মেনে নেয়। সেটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল vantage point| কার্ডগুলি একভাবে রাখা আছে এবং উল্টো পিঠে কি তথ্য রয়েছে তা জানার জন্য উপস্থাপিত ঘটনার পরিবর্তন প্রয়োজন। এখানে "one side" বা একদিক এবং "other side" অন্য দিক schema তে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে একটি vantage point বা অনুকূল অবস্থান। Direction of mental scanning (langacker, p.6) বা পর্যবেক্ষকের, পর্যবেক্ষণ করার অভিমুখ সুনির্দিষ্ট হচ্ছে যখন তার কাছে উল্টো পিঠ ধারণাটি তৈরি হচ্ছে।

Logical language বা গণিতের স্বার্থে তৈরি ভাষাতে, if x then y, বা যদি ক হয় তাহলে গ হবে এই তথ্যের ভেতর কিন্তু এই তথ্য অকাট্যভাবে নেই যে গ হলেও ক হবে। বরঞ্চ এই ভাষার স্ট্রাকচারে এমনটা রয়েছে যে, ক হলে তো গ হবেই, তবে ক না হলেও গ হতে পারে। শুধু এমনটা হতে পারে না যে ক হয়েছে তবে গ হয়নি। যেমন ভাবে ভাষার বাইরের উপলব্ধিমূলক যা রয়েছে সেটা কে কোনোভাবেই কোন এক agent বা কর্তা যে দেখছে, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পারে না। যেকোনো পদার্থ নিরীক্ষণ করার একটি প্রক্রিয়া (পর্যবেক্ষক কর্তা ধরে নিয়ে) স্বয়ংক্রিয়ভাবে point of view প্রতিষ্ঠা করে। তাই যুক্তির ভাষার গঠন vantage point বা পর্যবেক্ষণ করার অভিমুখ কে বাদ দিয়ে তৈরি নয়। এই ভাষার structure গুলোকে ব্যবহার করলে, স্ট্রাকচারটি নিজেই vantage point প্রতিষ্ঠা করে দেয় যে ক- এর দিক থেকে দেখা শুরু করতে হবে। এটি হলো trajector(Langacker, 2008, p.7) এবং পর্যবেক্ষণ করা, এখান থেকে শুরু হবে এবং proposition এর বাকি অংশটি এটির অনুষঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। Wason এর hypothesis প্রস্তাবটির trajector হল সেই কার্ডগুলি যেখানে ইংরেজি স্বরবর্ণ আছে। যে দিকটা পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে সেটি profiled vantage point কারণ সেই কার্ডের পিঠ কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে উপস্থাপিত ঘটনা হিসেবে, যেগুলির উপর কোন একটি পরিবর্তন আনার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে A, K, 4 এবং 7 রয়েছে। Hypothesis এর প্রস্তাবের অনুযায়ী যদি দেখা যায় স্বরবর্ণ আছে তাহলে সেটিকে ঘুরিয়ে জোড় সংখ্যা পেতে হবে। এখানে একটি কার্ডে স্বরবর্ণ রয়েছে তাই সেটাই আমাদের পর্যবেক্ষক হিসেবে trajector, এবং সেটির উল্টো পিঠে জোড় সংখ্যা আছে কিনা তা দেখলেই চলে। 7 লেখা কার্ডটির উল্টো পিঠে যদি একটি স্বরবর্ণ থাকে তাহলে কোনোভাবেই hypothesis এর প্রস্তাবটা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে না কারণ নির্দেশ বাক্য (আমাদের দ্বিতীয় premise বা প্রস্তাব), hypothesis বাক্যের সাথে

একীভূত (united) হলেও, কোথাও এমন তথ্য দেওয়া নেই যে বিজোড় সংখ্যা উল্টে স্বরবর্ণ পাওয়া যাবে না।

যদি শুধু hypothesis-এর প্রস্তাব কে ঠিক বা ভুল প্রমান করতে হয়, যেটির কোনো vantage point প্রতিষ্ঠিত নেই তাহলে A লেখা কার্ডটি উল্টালে জোর সংখ্যা পাওয়া এবং 4 লেখা কার্ড টি উল্টে স্বরবর্ণ পাওয়া একমাত্র hypothesis প্রস্তাব কে মেনে প্রাসঙ্গিক কেননা অন্য কিছু হলে কি হতে পারে বা হতে পারেনা তা নিয়ে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। নির্দেশ বাক্য অনুযায়ী নির্দেশ বাক্যকে ধরার, ঠিক বা ভুল প্রমাণ করতে, নির্দেশ কিন্তু দেয়া নেই | Hypothesis বাক্য এবং নির্দেশ বাক্য একীভূত (united) হলে, এবং hypothesis এর proposition- এ যে ধরনের structure ব্যবহার হয়েছে, সেই structure এর নিয়মমাফিক, উত্তর ও সেই structure দিয়েই হওয়া উচিত। তাহলে প্রশ্ন এবং উত্তর adjacency pair তৈরি করতে পারে। এই দুটি কে একসাথে ধরলে শুধু A লেখা কার্ডটিকে উল্টালে প্রমান সক্ষম |

Wason এখানে confirmation bias বোঝানোর জন্য আরও কিছু বাস্তবিক পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে analogically আগের সমস্যাটির অনুরূপ আরেকটি সমস্যা রাখেন।
মনে করুন আপনি হোস্টেলের ওয়ার্ডেন। একদিন রাতে একটি ঘরে গিয়ে আপনি দেখলেন
Someone drinking beer, কোন একজন মদ্যপান করছে
Someone drinking coke, কোন একজন কোকাকোলা পান করছেন
Someone who is 16 years old, কোন একজনের ষোল বছর বয়স।
Someone who is 21 years old, কোন একজনের একুশ বছর বয়স

Verify or receive the assertion that if someone is drinking beer they must be over 18.

একটি দাবি রয়েছে যে-যদি কেউ মদ্যপান করে তাহলে তার বয়স ১৮ বছরের বেশি হতে হবে। ঘটমান বিষয়টি যাচাই করে দেখতে হবে যে এই দাবি সত্যি না মিথ্যা।
এখানে কিন্তু কোথাও এই তথ্য দেওয়া হয়নি যে সেই ঘরটাতে আসলের চার জন ছিল না দুজন ছিল না তিনজন ছিল না তার বেশিও লোকজন ছিল। এই চার ধরনের সম্ভাবনায় কিন্তু নির্দিষ্ট উত্তর পাল্টে যায়।
তাই যদি এই সমস্যার সমাধান এইটি হয়ে থাকে যে শুধু যেই "someone" beer পান করছেন, তার বয়স যাচাই করতে হবে তখন বিনা তথ্যেই আমরা এটা ধরে নিচ্ছি যে সেই ঘরটাতে শুধু দুজনই ছিল এবং দেওয়া তথ্য আসলে দুজন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হিসেবে আলাদাভাবে দেওয়া চারটে তথ্য। সেখানে এই সম্ভাবনাটাও আছে যে যিনি মদ্যপান করছেন তিনি-ই কোকাকোলাও পান করছেন। এবং এখানে শুধু যাচাই করতে হবে যে সেই ব্যক্তি আসলে ১৬ বছর বয়সের কিনা।
যদি এমনটা না হয় তাহলে এটাও যাচাই করা দরকার ছিল যে ১৬ বছরের ব্যক্তি beer পান করছেন কিনা কেননা যে কেউ একজন মদ্যপান করছেন এবং যে ১৬ বছর বয়সের ব্যক্তি তারা আলাদা দুজন। এবং যিনি মদ্যপান করছেন তার বয়স কত সেটা আমরা জানি না যেমন তেমনি জানিনা যে যার বয়স ১৬ বছর সে মদ্যপান করছে কিনা।
এখানে এই ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয় যে আসলে এই সমস্যাটিতে, আগের সমস্যার সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মিল নেই। এখানে উপস্থাপিত ঘটনা আলাদা করে প্রতিষ্ঠা করতে হয়নি এবং তার

উপর কোন পরিবর্তনও প্রয়োজন নয়। তাই যাচাই করার প্রক্রিয়া খুব স্পষ্ট নয়। এই সমস্যায় যেই linguistic variable ব্যবহার হয়েছে সেগুলি কিভাবে এবং কোন set এ mapped হচ্ছে সেটি স্পষ্ট নয়। আলাদা আলাদা রকমের mapping, আলাদা আলাদা সঠিক উত্তর তৈরি করছে। দ্বিতীয় সমস্যা কে আগের সমস্যার উপমা বলার জন্য যতগুলো স্পষ্ট সাদৃশ্যের mapping দরকার ততগুলো নেই। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এবং এভাবেই বিবৃত, যে আগের সমস্যার চাইতে এটি কম বিমূর্ত (less abstract), কেননা এখানে রয়েছে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য যেগুলো ঘটমান বিষয়টিকে আরো বাস্তবিক সুস্পষ্ট আকার দিতে করতে সাহায্য করা উচিত যেহেতু আমরা variable x জাতীয় জিনিস না ধরে জাগতিক বস্তু বিষয় নিয়ে কাজ করছি। এক্ষেত্রে ৯০% subject একইভাবে ঘটমান বিষয়টির বৈশিষ্ট্য গুলিকে কল্পনা করেছেন এবং কিছু জিনিস যা প্রশ্নে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত নয় সেগুলো (ধরে নেওয়া যেতে পারে কিছু যৌথ জ্ঞানীয় অভিজ্ঞতার কারণে) একইভাবে presuppose করেছেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে যে ভাষাগত স্ট্রাকচারগুলি দিয়ে সমস্যাগুলি তৈরি, সেগুলির semantic value, দ্বিতীয় সমস্যাতে আরও অনেক বেশি ক্ষেত্রে অস্পষ্ট।

সাধারণত বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায়, সেটা কোন একটা ক্ষেত্রের হতে পারে যেমন অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বা পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে সার্বজনীন বুদ্ধিমত্তার কোন পরীক্ষায়(যেখানে পরীক্ষার্থী বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত), সমস্যা বিবৃতি যখন natural language ব্যবহার করে হয় যেখানে পরিণতি (consequence) একটা বড় অংশে non natural meaning এর উপর নির্ভরশীল, সেখানে এ ধরনের যুক্তি বিচ্ছেদ খুব অসাধারণ কিছু ঘটনা নয়। ভাষাতে অনেক ধরনের অনুমান কোন এক ক্ষেত্রের যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত। সেখানে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ একই ধরনের কিছু propositions মেনে নেয় বা presuppose করে এবংসেটা সম্পূর্ণ ঘটনাচক্রে হয়।

পরীক্ষকের (গণনাকারী যন্ত্র ব্যবহার করে বা না করে বা বহুনির্বাচনী প্রশ্নের বা multiple choice questions এর ক্ষেত্রেও) অজান্তেই কিছু ডোমেইন নির্দিষ্ট পক্ষপাত রয়ে যায় (বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার কারণে যেগুলো মানুষের জ্ঞানীয় যন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে সেটাকে কোন এক আকৃতি দেয়), যার ফলে পরীক্ষার্থীর কাকতালীয়ভাবে একই রকমের পক্ষপাত না থাকলে এ ধরনের পরীক্ষায় সঠিক উত্তরে পৌঁছানো খুব সহজ ব্যাপার হয়ে ওঠে না। এখানে লক্ষ্যনীয় এটাই যে বিকল্প গুলো প্রত্যেকটাই সমানভাবে সম্ভাব্য। কোনটিকে বেছে নেওয়ার বিশেষ কোনো যুক্তি নেই। multiple choice প্রশ্নে প্রত্যেকটাই counterfactually সেই পক্ষপাত বা bias থেকেই তৈরি হচ্ছে। এরফলে শ্রেণীকক্ষে বৈষম্য তৈরি হয়, এবং অনেক সময় এই পরীক্ষাগুলির ভিত্তিতে অযৌক্তিকভাবে একটি নির্দিষ্ট "সঠিক" চিন্তার ক্ষেত্র এবং "সঠিক" মানসিকতার খোঁজে কিছু জ্ঞানীয় ক্ষমতাকে অন্য ক্ষমতাগুলির থেকে সামাজিকভাবে বেশি কাম্য বা শ্রেষ্ঠ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এ ধরনের প্রত্যাশিত সংগতি অপ্রাকৃত (unnatural)। এই "সঠিক" নির্বাচন কৃত্রিমভাবে শিখতে হয় কেননা বহু ক্ষেত্রেই এই "সঠিক" counter-intuitive বা বিপরীত স্বজ্ঞাত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ তৈরি করার প্রচেষ্টায় বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, বহু চেতনার system কে বিবেচনা করার যোগ্য মনে করে না। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে মানব সম্ভাব্য চিন্তাশক্তির অবক্ষয় দেখা যায় যেখানে ছাত্র সমস্যাটির ব্যাপারে না চিন্তা করে পরীক্ষকের মানসিকতা বা bias অনুমান করতে থাকতে বাধ্য হয়। এর ফলে পরীক্ষক বা পর্যবেক্ষক না থাকলে, কেবল সমস্যাটির ব্যাপারে চিন্তা করার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রের তৈরি হয় না।

গ্রন্থপঞ্জি

Fodor, J. A. (1975). *The Language of Thought*. New York: Thomas Y. Crowell Company.

Gentner, Dedre, et al. *The Analogical Mind*. MIT Press, 2001.

Grice, H. P. *"Meaning." The Philosophical Review*, 1957, pp. 66: 377-388.

Millikan, R. G. (1984). *Language, Thought and Other Biological Categories*. Cambridge, MA: Bradford Books.

Millikan, R. G. (2004). *Varieties of Meaning: The 2002 Jean Nicod Lectures*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Millikan, R. G. (2005). *Language: A Biological Model*. Oxford: Clarendon Press.

Millikan, R. G. (2013). *"Natural information, intentional signs and animal communication," in Animal Communication Theory: Information and Influence*, ed. U. E. Stegmann (Cambridge: Cambridge University Press), 3316–3603. (Kindle edition).

Reboul AC (2015). *Why language really is not a communication system: a cognitive view of language evolution*. Front. Psychol. 6:1434. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01434.

Scott-Phillips, T. (2015). *Speaking Our Minds: Why Human Communication is Different, and How Language Evolved to Make it Special*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wason, P. C. (1968). *"Reasoning about a rule". Quarterly Journal of Experimental Psychology*. 20 (3): 273–281. doi:10.1080/14640746808400161. PMID 5683766. S2CID 1212273

Wason, P. C. (1966). *"Reasoning". In Foss, B. M. (ed.). New horizons in psychology. Vol. 1.* Harmondsworth: Penguin. LCCN 66005291.

Wason, P. C., & Shapiro, Diana (1971). *"Natural and contrived experience in a reasoning problem". Quarterly Journal of Experimental Psychology*. 23: 63–71. doi:10.1080/00335557143000068. S2CID 7903333.

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

বিমল করের 'দেওয়াল': ভাষাশৈলী

কৌশিক কর্মকার
মহারাজা নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received 20/04/2023
Accepted 08/05/2024

Keywords:
ভাষাশৈলী,
সংলাপ,
বর্ণনা,
দ্বিভাষিকতা,
শব্দ ব্যবহার

Guest Editors
Agniv Dutta
Ratul Ghosh
Patitpaban Pal

Organised by: শব্দ /ʃɔbd̪o/

ABSTRACT

কথাসাহিত্যের অন্তর্নিহিত গঠনবিন্যাসকে নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে উদঘাটন করার অন্যতম আশ্রয় শৈলীবিজ্ঞান। শৈলীবিজ্ঞানের প্রকরণসমূহের মাধ্যমে কোন সাহিত্যিক অধিবাচনের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ সম্ভবপর। সুনির্দিষ্ট ভাষা প্রয়োগের অমোঘ কৌশলে কীভাবে রচনার বিষয়বস্তু স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণময় হয়ে ওঠে তা খুঁজে দেখা হয় শৈলীবিজ্ঞানের পরিসরে। অর্থাৎ সাহিত্যের বক্তব্য বিষয়কে লেখকের ভাষা ব্যবহার কী উপায়ে সমধিকভাবে পরিস্ফুট করে তুলছে, কীভাবে পাঠকের কাছে তা এক অদম্য আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়ে ওঠে, সেই অন্দরের রহস্যকে উন্মোচন করার প্রক্রিয়া শৈলীবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়। শৈলীবিজ্ঞানের বিভিন্ন মানকের উপর ভিত্তি করে সাহিত্যের ভাষা শৈলী বিশ্লেষিত হয়ে থাকে। ধ্বনিগত, রূপগত, অন্বয়গত, শব্দার্থগত স্তরে শৈলীগত বিশিষ্টতা পর্যালোচিত হয়। পাশাপাশি উপভাষা ব্যবহার, দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহার, দ্বিভাষিকতার প্রয়োগ ইত্যাদি ভাষাগত বৈশিষ্ট্যও এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সাহিত্যের অধিবাচন (discourse) যা লেখক-পাঠকের মধ্যে ভাষাগত সংজ্ঞাপন (communication) তৈরি করে, তাকে শৈলীবিজ্ঞানে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়: ক) বর্ণনাধর্মী অধিবাচন ও খ) সংলাপধর্মী অধিবাচন। বর্ণনাধর্মী অধিবাচনে যেখানে লেখক তাঁর নিজের ভাষায় কথা বলেন, সংলাপধর্মী অধিবাচনে আখ্যানের চরিত্রকে তার ভাষায় কথা বলতে দেন। তাই সংলাপধর্মী অধিবাচনেই কোন চরিত্র তার দেশ-কালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিসহ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সংশ্লিষ্ট চরিত্রকে পাঠক অনুধাবন করতে পারে তার ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে। অন্যদিকে বর্ণনামূলক অধিবাচনে লেখকের সঙ্গে পাঠকের খানিকটা অন্তরঙ্গ সংযোগ গড়ে ওঠে। বিমল কর তাঁর 'দেওয়াল' উপন্যাসে উভয় অধিবাচনেরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সংলাপের সঙ্গে সংগতি রেখে বর্ণনার ভাষাতেও প্রতিধ্বনিত হয় লড়াইয়ের সুর। উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিভাষিকতার প্রয়োগ, কোড সরণ, পুনরুক্তি, বিশেষ শব্দ ব্যবহার, মালা বিশেষণ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার মধ্য দিয়ে লেখকের রচনারীতি কীভাবে শৈলীগত সার্থকতা অর্জন করেছে, আলোচ্যপত্রে তা নিবিড়ভাবে পর্যালোচিত হবে।

email id:koushikk31@gmail.com

ভূমিকা
তিন পর্বে লেখা উপন্যাস ‘দেওয়াল’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সময়ের কাহিনি। কলকাতা শহরের প্রেক্ষাপটে নিম্নমধ্যবিত্ত একটি পরিবারের অনিঃশেষ জীবন সংগ্রামের লড়াইকে কেন্দ্রে রেখে সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে উপন্যাসটিতে। লেখক তাঁর স্মৃতিকথা ‘উড়ো খই’-এর পাতায় জানিয়েছেন যুদ্ধকালীন সময়ে কলকাতা শহরে বোমা পড়ার আতঙ্কে শহর ছেড়ে পালানো, বিয়াল্লিশের আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কালোবাজারি ইত্যাদি নানাবিধ কারণে মানুষের অজস্র ক্লেশ, দুঃখ উপন্যাসের পরিসরে স্থান পেয়েছে।১ অসংখ্য পত্রপত্রিকা, লিফলেট, অ্যানুয়াল রেজিস্টার থেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য-উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন লেখক।২ নিজে যুক্ত ছিলেন যুদ্ধকালীন কলকাতায় গড়ে ওঠা এআরপি বাহিনীর সঙ্গে। সে কারণে তাঁর স্বীয় অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারও ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এআরপিতে থাকার সময় একটি শীতকালীন নাইট ডিউটির অভিজ্ঞতা উপন্যাসে হুবহু বিবৃত হয়েছে বাসু চরিত্রের মধ্য দিয়ে। যা থেকে অনুধাবন করা যায় উপন্যাসে অঙ্কিত বাসু চরিত্রটির কার্যক্রম অনেকাংশেই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আধারে নির্মিত। হয়তো সে কারণেই লেখক বইয়ের ভূমিকায় ‘বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ’ এর আদলে ব্যক্ত করেছেন অনিবার্য সাবধানবাণী:
‘এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এই উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক, কোথাও কোনও মিল ঘটে গেলে সেটা আকস্মিক বলেই ধরতে হবে। বলা বাহুল্য, যে-অঞ্চল মুখ্যত এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল - সেই অঞ্চলের একটি গলির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।’৩
অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে গলির নাম ছাড়া আর সকলই উপন্যাসে অপরিবর্তিত রয়েছে।

বাসু চরিত্রটি উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। কেবল সংলাপ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কীভাবে কোন চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হতে পারে তার সার্থক দৃষ্টান্ত আলোচ্য চরিত্রটি। বর্ধমানের গ্রাম থেকে বাবা-মা-দিদি-বোনের সঙ্গে সে কলকাতায় এসেছিল। কালক্রমে কলকাতা শহরে তার বন্ধুবৃত্ত গড়ে ওঠে; ম্যাট্রিক অনুত্তীর্ণ হয়ে পাড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় সময় অতিবাহিত করতে থাকে; পরবর্তীকালে সংসারের জাঁতাকলে পড়ে সিভিক গার্ড, এআরপিতে কাজ নেয়। তবে আদ্যন্ত তার চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় একটি বেপরোয়া অকুতোভয় মনোভাব; এই পৃথিবীর যাবতীয় সংস্কার, মূল্যবোধের বিরুদ্ধে সে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে; তাকে অস্বীকার করার পণ করেছে সে। তার ব্যবহৃত সংলাপগুলিতে তার মনোভাবের পরিচয় ফুটে ওঠে–

ক। ‘আরে লে, আমায় খতম করেনেবালা এখনও মার পেটে।’
খ। ‘আলবাত নিচ্ছি। বাপের বেটা হোস তো বল শালা আর-একবার - তোর দাঁত গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে যাব।’
গ। ‘ঠিক বলেছিস মাইরি। আমি শালাই যত ভেবে মরছি ওই খচরি ছুঁড়িটার জন্যে। আর ও মজা লুটছে। বেইমান কাঁহাকার। যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। তুই জানিস গৌরে, ওর বাপটা আবার বাবার বহুৎ পাওনা টাকা মেরে দিয়েছে। এখন শালা কচ্ছপ নবাবী ফলায়, বড়লোকি চাল মারে। সেই বাপের মেয়ে তো, মদো মাতাল মাগিবাজের রক্তে জন্ম, ও আর আলাদা কী মাল হবে?’
ঘ। ‘তাস খেলতে কে যায় রে ওখানে, গৌরে; তুই-ই বল, যাই তো শালা একটু কান্‌কি মারতে, তা পটলিই যদি আঁট মেরে যায়, কী ফায়দা গিয়ে?’
ঙ। ‘কেন, প্রেমসে খাব-দাব, মাঞ্জা চড়াব, কাপ্তেন হয়ে ঘুরবো-আর-’
চ। ‘আর না মাইরি, গণ্ডা কয়েক মাগি রাখব।’

ছ। 'এই খেলাম-, সে শালা কখন কোন জন্মে খেয়েছি তাও তো পোঁদটুকু ঠেকিয়ে দিলি, তুই গৌরে বাপ কো বেটা, বেনের বাচ্চাই।'
জ। 'আমরা শালা বউবাজারের ছেলে, পোয়াতির পেটে হাত বুলোলে ছেলেমেয়ে বুঝতে পারি।'
ঝ। 'ন আনা কী বে?'
ঞ। 'লাহিড়ী মশাইটা কোন মক্কেল বে?'
ট। 'এমন চান্স পেয়ে তুই শালা থারটি রুপিজের ঘণ্টা মারছিস! হ্যাত- এক নম্বরের ভীতু তুই, একটা মাগি। বুঝলি!'
ঠ। 'খোচে বোম মেরে গেলি যে-!'
ড। 'জীবন ভোর কেবল শালা ধান্ধায় থাকো। বেশ্যা মাগিদের মতন।'
ঢ। 'চাকরিটা ও শালা জবার দাদাকে পাইয়ে দিল।... জবাটা বেশ টাটকা মাল হয়ে গেছে তো, কাবলে টোপ মারল।'
ণ। 'মেয়েরা খুব কিপ্পিস হয় বুঝলি না, আমাদের মতন লেলা নয়।'

বাসুর ব্যবহৃত সংলাপের মধ্য দিয়ে তার প্রবল বেপরোয়া ও উদ্ধত ভাব মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও তার শীর্ষে আসীন ভদ্রশ্রেণির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অনাস্থার পরিচায়ক এই সকল বাক্যবন্ধ; যেন তথাকথিত ভদ্র শ্রেণির ভাষা কাঠামোকে চূড়ান্তভাবে নস্যাৎ করার মধ্য দিয়ে এক ধরনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনুভব করেছে সে। সেই সঙ্গে স্ল্যাং বা অপশব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মানসিক উত্তেজনার প্রশমন তথা মোক্ষণ ঘটেছে। সংসারের অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে পীড়িত, প্রেমে ব্যর্থ, বেকারত্বের জ্বালায় অতিষ্ঠ বাসু যথেচ্ছ স্ল্যাং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উক্ত অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে যেকোন উপায়ে মুক্তি পেতে চেয়েছে; পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। তাই কেবল বাসুর সংলাপেই নয়, সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তার মনের ভাবনাতেও একই ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে

ক। এই লোকটা সেদিন বেকায়দায় বাড়ির মধ্যে পেয়ে খুব চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝেড়ে দিলে বাসুর ওপর। খুব গরম দেখিয়ে নিলে। কী করবে বাসু, নেহাতই মিনুদির বাবা, পরের বাড়ি – চুপচাপ সব শুনতে হল, হজম করতেও হল। অন্য কেউ হলে এই রোয়াব সেদিন বের করে দিত বাসু। দাঁতের পাটি গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ত। কপাল জোরে বেঁচে গেছে সেদিন শালা কচ্ছপ। এই বেইজ্জতি বাসু সহজে ভুলছে না। রাস্তায় ঘাটে পাই একদিন তোমায়, বাসু বলছিল মনে মনে, খাতির-টাতির নয়, দরজা তো আমার বন্ধ করে দিয়েছ, আবার কী, তোমায় দেখে নেব, আমিও ফটিক দে লেনের বাচ্চা।
খ। কেদারডাক্তারের খুব কপাল, চিনে পাড়া একচেটে করে রেখেছে বুড়োটা; এন্তার লুটছে, ছ'ছটা মেয়ের একটার বিয়ে দিয়েছে - বাকি পাঁচটার জন্যে জমিয়ে যাচ্ছে। কেষ্টকালী মার্কা কাছেই মেয়েগুলো জানলা খুলে বসে থাকে, বাপ কবে বর ধরে আনবে! নন্টে একটার সঙ্গে ক'দিন খুব মাঞ্জা লড়েছিল, তারপর কেটে দিল।
বাসুর আড্ডার অপরাপর সদস্য গৌরাঙ্গ, পঞ্চানন, নন্তু প্রমুখের বাক্যালাপে কমবেশি একই রকম ভাষিক উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়

ক। 'রোয়াবি নিচ্ছিস কীসের বে?'
খ। 'হ্যাঁ খাসি হয়ে গেছে স্রেফ।'
গ। 'তুই বড় আন্টসান্ট বাত বলিস।'
ঘ। 'তুই এক নম্বরের হারামি হয়ে গেছিস বাসু। এক্কেবারে মাড়োয়ারি।'
ঙ। 'তোর তোয়াজে আমি মুতে দি।'

উপরোক্ত উদাহৃত বাক্যগুলিতে বেশ কিছু অপশব্দ বা স্ল্যাং লক্ষ করা যায়। যদিও কোন ভাষা সংবিধিতে এ জাতীয় কোন অপশব্দ বা ইতর শব্দের স্থান স্থায়ী নয়; তার অবস্থান ভীষণভাবে পরিবেশ কেন্দ্রিক তথা সংস্কৃতি কেন্দ্রিক। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে বাসুর সংলাপে পুনরাবৃত্ত ভাবে উঠে আসা 'মাগি' শব্দটি। এই শব্দটি বর্তমান মান্য চলিত বাংলায় (SCB) একটি অপশব্দ হিসেবে পরিগণিত হলেও প্রান্তিক গ্রামীণ সমাজে তা একটি সাধারণ বিশেষ্য ছাড়া কিছু নয়; এমনকি উনিশ শতকের মান্য চলিত বাংলাতেও তা অপশব্দ ছিল না কারণ তৎকালীন সাহিত্যে শব্দটির বারংবার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।৪ একই কথা প্রযোজ্য বাসুর সংলাপে উল্লিখিত 'পোঁদ' শব্দটি প্রসঙ্গেও সমাজের নিরক্ষর, দরিদ্র ও গ্রামীণ মানুষ যখন বলে, 'পোঁদের কাপড় জোটে না, তার আবার বাবুয়ানি কত!' তখন 'পোঁদ' কথাটা তার ভাষার নিজস্ব শব্দ। সেখানে তা বদকথা হিসেবে গণ্য নয়। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ঘরে, বা শিক্ষিত ও শিষ্টসমাবেশে যদি কেউ সাধারণ আলাপের মধ্যে 'পোঁদ' কথাটা বা তার সঙ্গে জুড়ে আরও কোনো কোনো কথা ব্যবহার করে, এক ধরনের চমক বা আঘাত তৈরি করার জন্য, তখনই সেটা হবে বদকথা।৫

অর্থাৎ স্থান-কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপশব্দের মর্যাদা বা অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। কিছু শব্দ যা একসময় মান্য শব্দ ভাণ্ডারের অন্তর্গত ছিল বর্তমানে তা অপশব্দ হিসেবে গণ্য হতে পারে; আবার কিছু শব্দ যা এককালে অশিষ্ট হিসেবে বিবেচিত হত, কালের নিয়মে তা শিষ্ট ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে।

উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৪১ সালের মাঝ থেকে ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই আজ থেকে সাত দশকেরও বেশি সময় আগে যুবসমাজের মধ্যে প্রচলিত রকের ভাষার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। গৌরাঙ্গ-বাসুর কথোপকথনে পৌনঃপুনিকভাবে উচ্চারিত 'আন্টসান্ট' শব্দটি যেমন বর্তমানে খুব একটা প্রচলিত নয়। 'কিপ্পিস'ও খুব বেশি শোনা যায় না। ভাষার পরিবর্তমান ধর্মের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আড্ডার ভাষারও বদল ঘটেছে। বর্তমান প্রজন্ম যেমন খণ্ডিত শব্দ বা মুণ্ডমাল শব্দের ব্যবহারে অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত। তবে অপশব্দের অভিধানে যৌনতার অনুষঙ্গযুক্ত শব্দসমূহের স্থায়িত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি, এগুলি সহজে অপ্রচলিত হয় না; কারণ অপশব্দের অভিধানে অপরাপর উপাদানের চেয়ে এগুলির অশ্লীলতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে অধিক। স্ল্যাং এর মূল লক্ষ্যই হল শিষ্ট ভাষাকে ব্যঙ্গ করা ও নতুনত্বের চমক তৈরি করা।৬ এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে যৌনতা ও যৌনবিষয়ক স্ল্যাং এর কোন বিকল্প নেই। এছাড়াও অপশব্দের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মেটাফর তথা রূপক নির্ভর অপশব্দ। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অপশব্দ প্রযুক্ত হচ্ছে তিনি হলেন উপমান এবং অপশব্দে উল্লিখিত প্রাণিবাচক বা বস্তুবাচক অংশটি হল উপমেয়। মূলত উপমানের শারীরিক বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে এজাতীয় অপশব্দগুলি নির্মিত হয়ে থাকে। ভাষাবিদ্ পবিত্র সরকার মেটাফর নির্ভর অপশব্দের একটি শ্রেণিবিন্যাস করেছেন।৭ উপন্যাসে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকে এগুলির কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

<u>মেটাফর-নির্ভর গালি</u>:

ব্যক্তিবাচক:

১। শ্রেণি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়: মাড়োয়ারি, মেথর, বেনে

২। আত্মীয়নাম: শালা

৩। পশুপাখি ইত্যাদির নাম: কচ্ছপ, খাসি

৪। অপার্থিব বস্তু, কল্পিত জীব: শয়তান

এই প্রসঙ্গে যেটি লক্ষণীয় তা হল মেটাফর নির্ভর অপশব্দে যৌনতার অনুষঙ্গ যুক্ত অপশব্দের চেয়ে অশ্লীলতার মাত্রা অনেকখানি কম; যে কারণে মেটাফর নির্ভর অপশব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রও অনেক বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত। সে কারণে পারিবারিক পরিসরেও এজাতীয় শব্দের সাবলীল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে রত্নময়ী সন্তান বাসুকে বিভিন্ন সময়ে 'মেথর', 'হতচ্ছাড়া', 'হারামজাদা', 'লক্ষ্মীছাড়া', 'শয়তান' ইত্যাদি সম্বোধনে অভিহিত করেছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আলোচ্য শাব্দিক উপাদানগুলি যখন সাধারণ স্তর থেকে অপশব্দের স্তরে উপনীত হচ্ছে, তখন একটি বাড়তি অর্থ যুক্ত হচ্ছে। অপশব্দের উক্ত দৃষ্টান্তগুলি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের স্তরে সীমায়িত হলেও কিছু স্ল্যাং বাক্যের আধারে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন: 'আঁট মারা', 'কান্‌কি মারা', 'মুতে দেব' -এই ধরনের দৃষ্টান্তগুলিতে মূলত বক্তার ইচ্ছার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। 'আঁট মারা' বা 'কান্‌কি মারা' মনুষ্যেতর প্রাণীর শারীরিক ক্রিয়ার অনুসরণে গঠিত: 'কানকি মারা-র সঙ্গে মাছে কাৎ হয়ে কানকো ফুলিয়ে শ্বাস নেওয়ার বোধহয় সঙ্গতি আছে।'৮ আবার ধ্বনিগত স্তরেও অপশব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন: উপন্যাসে বন্ধু গৌরাঙ্গকে বাসুর 'গৌরে' সম্বোধন। সাধারণভাবে নামের এ জাতীয় ধ্বনিবিকৃতির মধ্য দিয়ে অবজ্ঞাসূচক ভাব প্রকাশিত হলেও এক্ষেত্রে বন্ধুত্বের নৈকট্যই প্রমুখিত হয়েছে।

বাসু-গৌরাঙ্গদের এহেন কথোপকথনে কখনও কখনও বিভিন্ন ভাষার ভাষিক উপাদান একইসঙ্গে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মূলত তাদের ভাষাব্যবহারে বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি ত্রিভাষার উপাদান প্রযুক্ত হয়েছে। কেবল তাদের সংলাপেই নয়, উপন্যাসের সংলাপনির্ভর অধিবাচনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিভাষিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে চরিত্রের ভাষাব্যবহারে কোডের সরণ (code-shifting) ঘটে। 'সমাজভাষাবিজ্ঞানে কোড পরিভাষাটি নিরপেক্ষভাবে বোঝায় ভাষা, উপভাষা বা বুলি, অর্থাৎ যে কোনো ভাষাকেন্দ্রিক সংজ্ঞাপনের যে কোনো সংক্রিয়াকে বলা হয় কোড।'৯ এই কোড সরণের প্রক্রিয়াটি দু'ভাবে ঘটতে পারে: ১। কোড মিশ্রণ (code-mixing) ও ২। কোড পরিবর্তন (code-switching)। কোড মিশ্রণের ক্ষেত্রে পরস্পর ভিন্ন একাধিক ভাষার ব্যাকরণগত বিভিন্ন স্তরে সাযুজ্যপূর্ণ মিশ্রণ ঘটে; কিন্তু কোড পরিবর্তনে এই ধরনের কোন মিশ্রণ ঘটে না, একটি ভাষার বাক্যের সঙ্গে অপর ভাষার বাক্যের সহাবস্থান ঘটে। যেহেতু শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেই দ্বিভাষিক, তাই চরিত্রের ব্যবহৃত সংলাপে কোড মিশ্রণের যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে এই দুটি ভাষার মধ্যে একটি ভাষা যেটি বক্তার নিজের ভাষা বা মাতৃভাষা (L1) সেই ভাষাটি অপর ভাষাটির তুলনায় সে ভালোভাবে জেনে থাকে। অর্থাৎ তার কাছে এক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা বাংলা ভাষার তুলনায় দুর্বল বা sub-ordinate রূপে বিবেচিত হবে। ভাষা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই বিষয়টি অসম দ্বিভাষিকতা বা sub-ordinate bilingualism নামে পরিচিত।১০ উপন্যাসে উল্লিখিত কোড মিশ্রণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যেতে পারে:

ক। 'তোর এই ফটিক দে লেনের ছেলেগুলোর মধ্যে কালচারের ছিটেফোঁটাও নেই।'
খ। 'কোনও রকমের স্যাবোটেজেই আমি সমর্থন করি না।'
গ। 'শেষ পর্যন্ত অ্যাকটিভলি তুমি যে এই মুভমেন্টে জয়েন করবে-'
ঘ। 'একটু তলিয়ে দেখো দেবু- কাগজের এডিটোরিয়ালের নাকিকান্না-'
ঙ। 'তুই ফরনাথিং চেল্লাচ্ছিস-'

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে ব্যাকরণগত এককের মিশ্রণ ঘটেছে। এখানে লক্ষণীয় ইংরেজি 'কালচার' শব্দের সঙ্গে বাংলা '-এর' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে; তৈরি হয়েছে সঙ্কর শব্দ। এখানে সঙ্করায়ন প্রক্রিয়া (hybridization) কাজ করেছে। কোড মিশ্রণের ক্ষেত্রে এটি অন্যতম স্বীকৃত একটি প্রক্রিয়া। এর

পাশাপাশি কোড পরিবর্তনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে; যেখানে এক ভাষায় কথা বলতে শুরু করে সম্পূর্ণরূপে অপর ভাষায় চলে যাওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যায়। কোন ব্যাকরণগত এককের মিশ্রণ নয়, এক্ষেত্রে গোটা একটি বাক্য অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে

ক। ‘দেয়ার শুড বি নো সিকরেট মুভমেন্ট। ইট ইজ এ সিন। -আর যারা করবে তারা? উইল কাম টু গ্রিফ।’
খ। ‘মানুষ না খেয়ে মরছে- বা ধরুন মারা যাচ্ছে- ইট ইজ এ কিলিং ইনটেনশনালি, পারপাসলি-’
গ। ‘আত্মরক্ষার মাত্রা শেষ পর্যন্ত আত্মবিনাশ হয়ে দাঁড়াল। দি প্রসেস অফ ডিফেন্স লিডস টু অফেন্স।’

উক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে বাংলা বাক্যের সহাবস্থান ঘটেছে। এগুলি কোড পরিবর্তনের উদাহরণ। উপন্যাসে সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্র বাসু। তার সংলাপেও বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি ত্রিভাষার কোড মিশ্রণ ও কোড পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়:

ক। ‘কাল রাত্রে একটা ফাসট কেলাস স্বপ্ন দেখলাম রে।’
খ। ‘বিজনেস ইজ বিজনেস; নো ফ্রেন্ড, নাথিং। বুঝলি রে!’
গ। ‘এই বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবার তুমি কে? হু আর ইউ?’
ঘ। ‘লাটের মতন কেমন বাত চিত দেখলি দিদির, বলে আমায় তাড়িয়ে দেবে!’

উক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে অনুধাবন করা যায় যে কোন রকম ভাষিক পরিস্থিতিতে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বস্তুত বাস্তবে কথ্য ভাষায় কোড মিশ্রণ বা পরিবর্তনের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই অসচেতনতা বা তাৎক্ষণিকতার কারণে ঘটে থাকে। তবে সাহিত্যের পাতায় এগুলি অত্যন্ত সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয়। কখনো উপন্যাসের কোন চরিত্রকে অধিক মাত্রায় বাস্তবের নিকটবর্তী করে তোলার জন্য, কখনো বা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণিকে তাদের শ্রেণি পরিচয়সহ সাহিত্যে প্রতিফলিত করার তাগিদে বিষয়টি শৈলীগত প্রকৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
দ্বিভাষিকতার আরেকটি অন্যতম অঙ্গ ঋণকৃতি (borrowing)। আপাতদৃষ্টিতে ঋণকৃতি ও কোড মিশ্রণ একই ধরনের ভূমিকা পালন করে বলে মনে হয়; কিন্তু ঋণকৃতির সঙ্গে কোড মিশ্রণের নির্দিষ্ট পার্থক্য আছে:
‘ঋণকৃতি কোনো ভাষার প্রয়োজনে শাব্দিক ফাঁক (lexical gap) পূরণের জন্য সৃষ্টি হয়। কোড-মিশ্রণ শাব্দিক ফাঁক পূরণের জন্য হয় না। এর পেছনে অন্য ধরনের প্রেষণা কাজ করে থাকে। ভাষায় স্বীকৃত শব্দ থাকতেও অন্য ভাষার শব্দ দিয়ে সেখানে তা ব্যবহার করা হয়।’১১
উপন্যাস থেকে ঋণকৃতির কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে

ক। আবার সেই আলো। চকিতে ঝলসে উঠল। প্যারাশুট ফ্লেয়ার।
খ। অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌টের মুখ থেকে গোলাগুলো ঝাঁক বেঁধে বেঁধে আকাশে উঠছে।
গ। যুদ্ধের ফাঁপা বাজারে এই যে নতুন মানি মেকার্স তৈরি হয়ে উঠল এরা দিনে দিনে একটা ভিশাস সার্কেল তৈরি করবে।
এখানে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তার উপযুক্ত পরিভাষা বাংলায় নেই বা লিখনকালে প্রচলিত ছিল না অর্থাৎ এক্ষেত্রে এই শব্দগুলির ব্যবহার অনিবার্য ছিল এবং ভাষার শাব্দিক ফাঁক পূরণের জন্যই তা ব্যবহৃত হয়েছে।

উপন্যাসের সংলাপ ও বর্ণনা উভয় অধিবাচনেই পুনরুক্তি বা recurrence এর একটি বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কোন বিশেষ বক্তব্যকে জোর দিয়ে উপস্থাপন করার তাগিদে পুনরুক্তির প্রয়োগ ঘটানো হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট বক্তব্যটির প্রমুখন ঘটে। কখনও বা পুনরুক্তির মধ্য দিয়ে গদ্যের ভাষা একপ্রকার কাব্যিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে; এক ধরনের মিউজিকাল প্যাটার্নও সৃষ্টি হয় পুনরুক্তির মাধ্যমে।১২ পুনরুক্তি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। উপন্যাসে শব্দগত পুনরুক্তির উল্লেখযোগ্য কিছু দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়

ক। আর পারছি না আমি অমলাদি! অভাব-অভাব-অভাব। সংসারে অভাব যেন বেড়েই চলেছে। অভাবের মধ্যে গলা ডুবিয়ে বসে আছি।
খ। জল-জল-জল। শেষ নেই। সেই বৃষ্টি আর জলের তোড়ে বন্যা হয়ে গেল।
গ। বসে-বসে-বসে- রাত হল। সুচারু আর এল না।
ঘ। না না না। দুশ্চিন্তাটা সুধাকে সহজে ছাড়ে না।
ঙ। ট্রেন ট্রেন ট্রেন। একটা দু'টো স্পেশাল ট্রেনে কি হবে!
চ। ছি ছি ছি। বাবার নাম এমনিতেই ডুবিয়েছিস, আরও ডুবো।
এখানে যথাক্রমে 'অভাব', 'জল', 'বসে', 'না', 'ট্রেন', 'ছি' key-word হিসেবে পুনরুক্ত হয়েছে; যা নির্দিষ্ট বক্তব্যকে প্রমুখিত করেছে। প্রথম দৃষ্টান্তে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুধা সহকর্মীদের অমলাদির কাছে তার আর্থিক দীনতার কথা বিবৃত করেছে যেখানে এক সর্বগ্রাসী অভাবের আর্তনাদ ধ্বনিত হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বন্যার ভয়াবহতাকে প্রমুখিত করা হয়েছে, দিগন্তবিস্তারী জলরাশিকে বোঝানো হয়েছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রতিচ্ছবি পাঠকমনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চতুর্থ ক্ষেত্রে নঞর্থক অব্যয়ের পুনরুক্তির মধ্য দিয়ে নাছোড়বান্দা দুশ্চিন্তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম উদাহরণে বিশ্বযুদ্ধকালীন কলকাতা শহর থেকে জাপানি বোমার ভয়ে জনগণের পলায়ন আকাঙ্ক্ষা ও সেই সূত্রে ট্রেনের অপ্রতুলতার বিষয় নির্দেশিত হয়েছে। সর্বশেষ দৃষ্টান্তটিতে বাসু চরিত্রের প্রতি মা রত্নময়ীর গভীর হতাশা-অবসাদের প্রতিফলক হিসেবে 'ছি' অব্যয়ের পুনরুক্তি ঘটেছে।
অর্থগত পুনরুক্তিও উপন্যাসে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যেতে পারে

ক। মীনাক্ষী যেন জাদুকরী। বাসুকে এমন সব আশ্চর্য অদ্ভুত, আকর্ষণীয় জাদু দেখিয়েছে এক ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে, যার তীব্রতা আর উন্মাদনা এখন বাসুর রক্তে, স্নায়ুতে এবং চেতনায়।
খ। চেহারায়, শিক্ষায়, সহবতে, স্বভাবে বড় সুন্দর ছেলে।
গ। অহিংসা তাঁর মেদ, মজ্জা, জীবন।
ঘ। অশেষ ক্লান্তি, কষ্ট, উদ্বেগ, ভয়, অনিশ্চয়তা থেকে কবে যে মুক্তি পাবে-?
ঙ। রত্নময়ী কাঠ। বিস্ময়ে, আঘাতে, শাসানিতে, মেয়ের কঠোরতায়।
চ। এরা রাক্ষস, এরা পশু, এরা ভিখিরি, ইতর, স্বার্থপর, আত্মসুখী।
ছ। রাগে, বিতৃষ্ণায়, ক্ষোভে রত্নময়ীর গলার স্বর ভাঙা কাঁসার বাসনের শব্দের মতন কটু শোনাচ্ছিল।
জ। জোচ্চুরি, বদমাইশি, গুন্ডামি- কোনও গুণের অভাব নেই।
ঝ। তোমার বিশ্বাস নেই, আশা নেই, শান্তি নেই- এসব কথা আমি অবিশ্বাস করছি না।

প্রথম দৃষ্টান্তে মীনাক্ষী নামক জনৈক নারী বাসুর চেতনা জগতে যে আলোড়ন তুলেছে তার সুতীব্র অনুভূতি পরিস্ফুট করার জন্য 'রক্ত', 'স্নায়ু' ও 'চেতনা' শব্দত্রয়ের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে যা একপ্রকার সর্বাঙ্গীণতাকে ব্যক্ত করেছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কন্যা সুধার হবু স্বামী হিসেবে সুচারুর সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ করেছে রত্নময়ী। তৃতীয় উদাহরণে ‘মেদ’, ‘মজ্জা’, ‘জীবন’ শব্দটি মূলত একটিই অর্থ প্রকটিত করেছে, তা হল অহিংসাই হল উদ্দিষ্ট ব্যক্তির একমাত্র আদর্শ। চতুর্থ দৃষ্টান্তে পাঁচটি শব্দ সুধার জাগতিক বাধা-বিপত্তিকে ব্যঞ্জিত করেছে। একমাত্র মেয়ের কাছে ‘মিথ্যেবাদী’ অপবাদ শুনে রত্নময়ীর চূড়ান্ত বিধ্বস্ত অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে পঞ্চম ক্ষেত্রে। সংসারের জাঁতাকলে পিষ্ট সুধার কাছে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ধরা দিয়েছে নঞর্থকভাবে; তাঁর হতাশা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ষষ্ঠ উদাহরণে উল্লিখিত ছ’টি শব্দের মাধ্যমে। সপ্তম ক্ষেত্রে সাংসারিক জীবনের প্রতি রত্নময়ীর বিতৃষ্ণা স্বরভঙ্গির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। অষ্টম দৃষ্টান্তে বাসুর অপকীর্তি, তার নেতিবাচক ইমেজ ধরা পড়েছে বোন আরতির বয়ানে। শেষ উদাহরণটির মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত নঞর্থকতা, আশাহীনতার ইঙ্গিত ব্যঞ্জিত হয়েছে সুচারুর প্রতি সুধার বয়ানে।

ভাষিক সংজ্ঞাপনে অর্থগত পুনরুক্তির মতই ভূমিকা পালন করে মালাবিশেষণ। কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নীত করার একটি প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় একসঙ্গে একাধিক বিশেষণের সমাগমে। একাধিক বিশেষণের একত্রে অবস্থান শৈলীতত্ত্বে ‘মালাবিশেষণ’ নামে চিহ্নিত। বিশেষ জোর দেওয়ার জন্য যেমন তা ব্যবহৃত হয়, তেমনি কখনও কখনও মালাবিশেষণ গদ্যমধ্যে আবেগের অতিরেক তৈরি করে। উপন্যাস থেকে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করলে বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে

ক। দেবতার মতন মানুষের অধম অক্ষম হীন সন্তান।
খ। নিঃসঙ্গ অসহায় একলা তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।
গ। মা আগের সেই শান্ত সুন্দর শিষ্ট নির্বিরোধ মানুষ আর নেই।
ঘ। এই ছেলেটির ভীষণ নিরীহ, লাজুক, শান্ত এবং শিষ্ট ভাবটাও সুধার অপছন্দ ছিল না।
ঙ। তার ভাষা খুব ঝকঝকে, ধারালো, সংক্ষিপ্ত আর স্বার্থপরের মতন।
চ। হতাশ, অপ্রসন্ন, নিরুপায় হয়ে উমা ভাবছিল

মালাবিশেষণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের মানসিক অবস্থার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মালাবিশেষণের পাশাপাশি উপন্যাসে কিছু অভূতপূর্ব বিশেষণ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। এ জাতীয় বিশেষণ প্রয়োগই লেখকের শৈলীগত স্বতন্ত্রতাকে চিহ্নিত করে

ক। দুটি ঠোঁটের স্তব্ধ নেশা।
খ। মুখে এক বিস্বাদ আর জ্বোরো গন্ধ।
গ। সুধার গলার তীব্র ঘোষণায় যে নগ্ন অধিকারের দাবি প্রকাশ পেল বাসুর তা সহ্য হল না।
ঘ। গ্যাসের দীন আলো।
ঙ। কী গরম চেহারা।

প্রথম উদাহরণটির মধ্য দিয়ে বাসুর কামনামদির অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে; তীব্র সংরাগপূর্ণ একটি পরিবেশ সৃজন করেছেন লেখক ‘স্তব্ধ’ বিশেষণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ‘জ্বর’ থেকে গঠিত ‘জ্বোরো’ গন্ধের বিশেষণ হিসেবে পাঠকের অভিনিবেশ আকর্ষণ করেছে। তৃতীয় ক্ষেত্রে ‘অধিকার’ শব্দটির বিশেষণ হিসেবে ‘নগ্ন’ শব্দের প্রয়োগ নেতিবাচক অর্থের ইঙ্গিতবহ; যা অনেকটাই মাত্রাতিরিক্ত অধিকারের ব্যঞ্জনা বহন করছে। ‘দীন’ শব্দের অর্থ দরিদ্র; চতুর্থ ক্ষেত্রে আলোর প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে তা; আপাতদৃষ্টিতে তা আলোর অনুজ্জ্বলতা, নিষ্প্রভতার দিকে ইঙ্গিত নির্দেশ করলেও বৃহৎ প্রেক্ষাপটে

তা সংসারের অর্থনৈতিক সংকটকে ব্যঞ্জিত করেছে। শেষোক্ত দৃষ্টান্তটিতে বাসুর পুরুষালি দৃষ্টিকোণকে প্রমুখিত করা হয়েছে; উত্তেজক, আকর্ষক শরীরী গঠন অর্থে 'গরম' বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে।

উপন্যাসে এভাবেই বাস্তবতার জীবন্ত পরিবেশ ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সৃজিত হয়েছে। আর এরূপ পরিবেশকে পাঠকের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে ধন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য; যার মাধ্যমে উপন্যাসের পরিসরে বাস্তবের অনুপুঙ্খ বিবরণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ধন্যাত্মক শব্দের সাহায্যে গদ্য মধ্যে phono-aesthetic image গড়ে ওঠে যা একটি অন্যতম শৈলীগত প্রকৌশলও বটে। ধন্যাত্মক শব্দগুলি সাধারণভাবে দু'ভাগে বিভক্ত: ক। ধ্বনির অনুকারক শব্দ (primary onomatopoeia) অর্থাৎ যেগুলি বাস্তব ধ্বনির অনুকরণে গড়ে উঠেছে এবং খ। ধ্বনির অনুকারক নয় এমন শব্দ (secondary onomatopoeia) অর্থাৎ যেগুলি ধ্বনির অনুকরণে নয়, ভাবের অনুষঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উপন্যাসে ধন্যাত্মক শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়

ক। থরথর; খ। ভোঁ-ভোঁ; গ। থমথম; ঘ। চটচটে; ঙ। ফিসফিস; চ। ঘ্যানর ঘ্যানর; ছ। ঘুটঘুটে; জ। ছমছম

ধন্যাত্মক শব্দগুলির মাধ্যমে একদিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে বাস্তবানুগ কথ্যভাষার মেজাজ ফুটে উঠেছে; তেমনই এক প্রকার শ্রুতিময় আবর্ত সংবেদিত হয়ে পাঠকের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আলোড়িত করে তুলেছে।

কথ্য ভাষাশৈলীর সার্থক প্রতিফলন ঘটানোর অপর একটি শৈলীগত অবলম্বন অনুকার শব্দের যথাযথ প্রয়োগ। বাস্তবে অনুকার শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। অনুকার শব্দের নিজস্ব অর্থ না থাকলেও তা শব্দদ্বৈতের অন্তর্গত হয়ে মূল শব্দের অর্থ বৈচিত্র সৃষ্টি করে। সাধারণভাবে মূল অর্থবহ শব্দের প্রথম ধ্বনির পরিবর্তে 'ট', 'ফ', 'স', 'ম' এই চারটি ব্যঞ্জনধ্বনির সূচনার মাধ্যমে অনুকার শব্দ গড়ে ওঠে

ক। প্রণাম-টনাম; খ। চাকরি-টাকরি; গ। দিদি-টিদি; ঘ। বাঁধা-ছাঁদা; ঙ। ঘর-টর; চ। খাব-দাব; ছ। চটে-মটে

অনুকার শব্দ ও দ্বৈত ধন্যাত্মক ছাড়াও শব্দদ্বৈতের আরো দু'রকম গঠন ভাষায় লক্ষ করা যায়: ১। একই শব্দের পাশাপাশি দুবার অবস্থান যাকে শব্দের দ্বিরুক্তি নামে অভিহিত করা যেতে পারে; ২। মূল শব্দের সঙ্গে তারই সমার্থক একটি শব্দ যোগে গঠিত শব্দদ্বৈত। শব্দদ্বৈতের প্রয়োগও ভাষায় বহুল প্রচলিত। উপন্যাসেও তার কোন ব্যত্যয় লক্ষ করা যায় না

ক। দুঃখ-দুঃখ; খ। ঢাকি-ঢাকি; গ। আড়াল-আড়াল; ঘ। চলন-বলন; ঙ। ঠাট্টা-রসিকতা; চ। ডাগর ডাগর; ছ। ফোলা ফোলা; জ। চাল-বেচাল; ঝ। টাকাটা-আধুলিটা; ঞ। আচার-আচরণ

এজাতীয় শব্দদ্বৈত বিশেষ অর্থ বহন করে থাকে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তা প্রবাহমানতা, বিশেষ্যের ক্ষেত্রে বহুত্ববাচকতা, পৌনঃপুনিকতা আর বিশেষণের ক্ষেত্রে তা মাত্রাধিক্য জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সংলাপ রচনায় চরিত্রের কথ্য ভাষা ফুটিয়ে তোলার জন্য অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রবণতাও লক্ষণীয়। দৈনন্দিন জগতে আটপৌরে ভাষা ব্যবহারের অন্যতম উপাদান অর্ধতৎসম শব্দ; এ কারণে চরিত্রের সংলাপে অর্ধতৎসম শব্দের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ করা যায়
ক। রাজপুত্তুর; খ। পেরেমপত্তর; গ। হতকুচ্ছিত; ঘ। বিচ্ছিরি; ঙ। রাত্তির

শাব্দিক পরিসীমাকে অতিক্রম করে বাক্যিক স্তরে নজর রাখলে দেখা যায় উপন্যাসের সংলাপে অসমাপ্ত বাক্য ব্যবহারের ভঙ্গিটি অত্যন্ত সুচারুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষা ব্যবহারের একটি অন্যতম প্রবণতা অসমাপ্ত বাক্য ব্যবহার যা কখনো কখনো সম্পূর্ণ বাক্যের চেয়ে অধিক প্রকাশক্ষম হয়ে ওঠে

ক। ‘‘হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কোথায়-’
খ। ‘তারও বেশি- হাজার হাজার-’
গ। ‘এ-পাড়ায় ওই তো ডাক্তার-’
ঘ। ‘বললাম তো একটা কাজে-’
ঙ। ‘কী আর বলবে-’
চ। ‘আমাদের প্রেস...’
ছ। ‘ললিতবাবু ঠিকই বলেছিলেন। আমি-’
কেবল সংলাপে অসমাপ্ত বাক্য প্রয়োগেই নয়, সংলাপ-পূর্ব বিবৃতি বাক্যের স্বল্প পরিসরে লেখক চরিত্রের সূক্ষ্ম শারীরিক আচরণ (micro-gesture) তথা স্বরভঙ্গী (tone) উল্লেখ করে চরিত্রের ভাবনা, মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন নিপুণভাবে। চরিত্রের অঙ্গভঙ্গি তথা স্বরের বিন্যাসকে ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রায়-ভাষা (para language) নামে অভিহিত করা হয় যা চরিত্র কর্তৃক ব্যক্ত সংলাপে একটি আলাদা মাত্রা উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়

ক। যাবার আগে বেশ রুক্ষ চড়া গলায় বললে, ‘আধ ঘণ্টার বেশি আমি অখানে থাকব না নন্দী।’
খ। অল্পক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে সুধা কেমন সংকোচের সঙ্গে মৃদু গলায় বলল, ‘আমাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে দিতে হবে, কাকাবাবু।’
গ। একটু চুপ করে থেকে সুধা বলল, ‘তবে আরও খানিকক্ষণ পাতা অলটান, আমি আসছি।’
ঘ। ‘এ-সব আবার কেন।’ রত্নময়ী আরতির চুড়ি-পরা দেখতে দেখতে বললেন।
ঙ। ‘মেয়েও বা হবে না কেন?’ সুধা গম্ভীর মুখেই পালটা জবাব দিল।

বিবৃতি বাক্যগুলি সংলাপ অংশের আগে ও পরে উভয় স্থানেই বসে আখ্যানমধ্যে এক প্রকার বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে। এর পাশাপাশি উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে প্রত্যক্ষ সংলাপ যেখানে কোন বিবৃতি অংশ থাকে না কেবল সংলাপ অংশের উল্লেখ থাকে; কোনটি কোন চরিত্রের সংলাপ তা প্রসঙ্গ অনুসরণ করে বুঝে নিতে হয়। প্রত্যক্ষ সংলাপেরই একটি ভিন্নতর উপস্থাপন টেলিফোনিক বা দূরভাষিক সংলাপ; যেখানে বক্তা-শ্রোতার শ্রুতিগত সংযোগ থাকলেও দৃষ্টিগত সংযোগ থাকে না
...হ্যালো- হ্যালো অ্যামবুলেন্স প্লিজ, অ্যামবুলেন্স...? বউবাজার আর.পি. সেক্টর নাম্বার ফাইভ স্পিকিং... হ্যাঁ, বউবাজার। স্যার, আর একটা রিপোর্ট আছে যে, -কী বলছেন- রাত এগারোটা-!
ভাষাগত সংজ্ঞাপন বা সম্পর্ক সাধনের ক্ষেত্রে ভিন্নতার কারণে ভাষারীতি নির্বাচনেও এ ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য ঘটে থাকে।

বর্ণনামূলক অধিবাচনে একটি অন্যতম শৈলীগত প্রকৌশল উপমা প্রয়োগ। উপন্যাসে বেশকিছু উপমার ব্যবহার করেছেন লেখক। যেগুলোর মাধ্যমে এক নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের অভাব, দীনতা, দারিদ্র্যের চিরন্তন রূপ অনেকখানি দর্শনসঞ্জাতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অভাবের তীব্রতম রূপ প্রত্যক্ষ করে তা থেকে যথাযথ দূরত্ব বজায় রেখে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচারের মাধ্যমে এই জাতীয় শিল্পগুণান্বিত উপমা সৃজন সম্ভবপর। এই উপমার জগৎ পাঠককে একপ্রকার উচ্চতর অনুভূতির চেতনায় আবিষ্ট করে রাখে–

ক। এই সংসারটা যা হয়েছে না, করপোরেশনের ময়লাটানা গাড়ি।
খ। রাগে, বিতৃষ্ণায়, ক্ষোভে রত্নময়ীর গলার স্বর ভাঙা কাঁসার বাসনের শব্দের মতন কটু শোনাচ্ছিল।
গ। যে-বেদনা নিবিড় দীর্ঘ ঘন মেঘের মতন কালো হয়েছিল, সেই মেঘ বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে আসে।
ঘ। বারান্দার বাতির মেটে আলো উঠোনের একপাশে হলুদ-ধোওয়া জলের মতন পড়ে আছে।
ঙ। ছুটির বেলায় রাজমিস্ত্রিরা যেমন চুনকামের শেষ কাজটুকু সেরে নেয় দ্রুত হাতে তেমনিভাবে কেউ যেন আসন্ন সন্ধ্যার কালো কালো দাগগুলো ক্ষিপ্রভাবে দেওয়ালে টেনে দিচ্ছিল।
লেখকের বিপুল অভিজ্ঞতার জগৎ এরূপ গভীর অনুভূতিসম্পন্ন উপমার জন্ম দেয় যার মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবন দর্শনের আভাসও সঞ্চারিত হয় পাঠকমনে।

বিমল করের শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে বাংলা-বিহার (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) সীমানা লাগোয়া বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁর স্কুলজীবনও কেটেছে কখনও ধানবাদ, কখনও আসানসোল, কখনও বা কুলটিতে। দুটি ভিন্ন ভাষাভাষী এলাকার সীমানা অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই একটি মিশ্র ভাষা অঞ্চলের পত্তন ঘটে; যেখানে দুই ভাষারই কমবেশি প্রভাব থাকে। এহেন দ্বিভাষিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার দরুন 'কোড-সরণে'র (code-shifting) অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল আশৈশব। তদুপরি আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে, সহপাঠীদের সাহায্যে কিছু অন্যরকম 'ভাষাশিক্ষা'ও ঘটেছিল। স্মৃতিকথা 'উড়ো খই' এর পাতায় এজাতীয় বেশকিছু অভিজ্ঞতার সংকলন ঘটেছে। লেখকের অত্যন্ত কাছের কালোমামা'র সৌজন্যে খুব ছোটতেই তিনি খণ্ডিত শব্দ (clipped word), অনূদিত ঋণ (loan translation) এর ধারণা লাভ করতে পেরেছিলেন
'ইম্‌পিসুল' শব্দটাও মামার মুখে প্রায়ই শোনা যেত। ইমপসিবল্ শব্দটা লেজ খসিয়ে মামা ইমপিসুল করে নিয়েছিল। স্টেশনের পানিপাঁড়েকে বলত, 'ওয়াটার টিকি'।১৩
এছাড়াও শিখেছিলেন আরও দুটি শব্দ: 'এনচ্যানটেড' আর 'হ্যান্ডাহেন্ডি'। কালোমামা'র শব্দসৃজন প্রতিভা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে লেখকের মধ্যে নতুন নতুন শব্দ তৈরির প্রেরণা জেগে ওঠে: রোজ রোজ যে সাইকেল পাংচার হয় অচিরেই তার নামকরণ ঘটে: 'পাঞ্চারাস সাইকেল'। এরপর চলে আসা যেতে পারে বলাইদা'র 'টেঁশো ইংলিশে'। যার ব্যবহৃত সংলাপ কোড পরিবর্তনের সার্থক উদাহরণ:
'রোবিন, হি ইজ ক্যালকাটা বয়! নোজ বক্সিং। চ্যাম্পিয়ন। শেওড়াফুলি চ্যাম্পিয়ন। তুম্‌কো যম্ হ্যায়। ক্যান ইউ ফাইট হিম্!'১৪
পাণ্ডে স্যারের স্ত্রী 'মায়জি'র সংলাপে কোড মিশ্রণ দেখা যায়
'এই কিতনা পানি ফেলেছিস?' 'আই মা!... মিরিচ দিয়েছিস?'১৫
লেখকের অন্তরঙ্গ বন্ধু কালীর সংলাপও এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিযোগ্য:
'শালে চোট্টা কাহাকা, দো পয়সা মে দো খোরি চা- তোমহ্‌রা বাপকো চা... । আই অলসো নো ইংলিশ। নোজ্ ফাটা দেয়গা।'১৬
আর বাসু-গৌরাঙ্গের যে আড্ডার ভাষা উপন্যাসে বাস্তব কলকাতার রককে উপন্যাসের পাতায় মূর্ত করে তুলেছে সেই ভাষাশিক্ষা লেখকের ঘটেছিল এক 'সমবয়সী ভাই'য়ের সৌজন্যে:

ভাই এবং তার বন্ধুদের মুখের বুলি থেকে আমার কিছু ভাষা শিক্ষা হতে লাগল। কলকাতার পাড়ার ছেলেদের চলিত মৌখিক সেই ভাষার সব আজ আর মনে নেই। কিছু কিছু আছে। ভাষার বিবর্তন হয়। জানি না, পঞ্চাশ বছর আগের সেই প্রচলিত ‘রক-ল্যাংগুয়েজ’ – এখনও শোনা যায় কিনা! হয়ত যায় না।১৭

অর্থাৎ ভাষা বিষয়ক একটি সচেতনভাব লেখকের আকৈশোর অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর শোনার কান ও তা স্মৃতিতে ধরে রাখার একটি সহজাত প্রতিভার প্রমাণ মেলে যখন স্মৃতিকথার পাতায় স্কুলের পণ্ডিতমশাইয়ের পূর্ববঙ্গীয় উপভাষিক সংলাপও ব্যক্ত হয় জীবন্তরূপে। সুনির্দিষ্টভাবে লেখকের এরূপ সচেতন ভাষা অভিজ্ঞতার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসের ভাষাব্যবহারে। সংলাপের ক্ষেত্রে তা যেমন জীবন্তভাবে পরিবেশিত হয়েছে; তেমনই বর্ণনার ক্ষেত্রেও তাঁর ভাষাব্যবহারে ধরা পড়েছে মানুষের অন্তর্লীন অনুভূতি, উপলব্ধির বহুবর্ণ প্রতিচ্ছবি।

তথ্যসূত্র

১। কর, বি. (১৯৯৭). *উড়ো খই* (২ খণ্ড). কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:. পৃষ্ঠা ৫৮.

২। ঐ, পৃষ্ঠা ৬৫

৩। কর, বি. (২০১৭). *উপন্যাস সমগ্র* (৬ খণ্ড). কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:. পৃষ্ঠা ৬২৩.

৪। সরকার, প. (২০১৪). *লোক ভাষা সংস্কৃতি নন্দনতত্ত্ব.* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রা: লি:. পৃষ্ঠা ১০৫.

৫। সরকার, প. (২০১৩). *চম্‌স্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান.* কলকাতা: পুনশ্চ. পৃষ্ঠা ১৮২.

৬। বসু, অ. (২০১৪). ‘ইতর শব্দ গতরজব্দ’, সম্পা. অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, রোববার, প্রতিদিন প্রকাশনী লি:, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি পৃষ্ঠা ১৮.

৭। সরকার, প. (২০১৪). *লোক ভাষা সংস্কৃতি নন্দনতত্ত্ব.* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রা: লি:. পৃষ্ঠা ১১৮.

৮। ঘোষ, অ. (২০১৫). আড্ডার ভাষা, সম্পা. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, *বহুরূপে ভাষা (১ খণ্ড).* কলকাতা:প্রতিভাস. পৃষ্ঠা ৪৭.

৯। নাথ, মৃ. (১৯৯৯). *ভাষা ও সমাজ.* কলকাতা: নয়া উদ্যোগ. পৃষ্ঠা ২৩৬.

১০।সরকার, প. (২০১৩). *চম্‌স্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান.* কলকাতা: পুনশ্চ. পৃষ্ঠা ১৯০.

১১। নাথ, মৃ. (১৯৯৯). *ভাষা ও সমাজ.* কলকাতা: নয়া উদ্যোগ. পৃষ্ঠা ২৩৮.

১২। চক্রবর্তী, উ. কু. (১৯৯৭). *আধুনিক কবি: কবিতার শৈলী.* কলকাতা: উত্থক প্রকাশনী. পৃষ্ঠা ১০৬.

১৩। কর, বি. (২০০১). *উড়ো খই* (১ খণ্ড). কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:. পৃষ্ঠা ১৯.

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১১৩

১৫। ঐ, পৃষ্ঠা ১১৯

১৬।ঐ, পৃষ্ঠা ৯৬

১৭। ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৪

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL
Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার ধানুক সম্প্রদায়ের বহুভাষিক পরিস্থিতি : কোড মিশ্রণ ও কোড পরিবর্তন

বাপী সরকার
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO
Article history:
Received 03/02/2024
Accepted 08/05/2024
Keywords:
আর্যভাষা,
জাতিগত সম্প্রদায়,
ধানুক,
বহুভাষিক পরিস্থিতি,
কোড মিশ্রণ,
কোড পরিবর্তন
Guest Editors
Agniv Dutta
Ratul Ghosh
Patitpaban Pal
Organised by: শব্দ /ʃɔbd̪o/

ABSTRACT
মগহী(Magahi) হল একটি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা। ভৌগোলিক দিক থেকে মগহী ভাষার দুটি ভাগ দেখা যায় –কেন্দ্রিয় মগহী(Central Magahi) ও পূর্বী মগহী(Eastern Magahi)। পূর্বী মগহী ভাষীদের একটি জাতিগত সম্প্রদায় হল ধানুক সম্প্রদায়(Dhanuk Community)। এদের কথ্য ভাষা স্থানীয় মানুষজনদের কাছে ধানুক ভাষা(Dhanuk Language)নামে পরিচিত। এদের পদবী সাধারণত মন্ডল। বর্তমানে এদের পেশা হল কৃষিকাজ। এরা পূর্বে মগধের রাজার সেনাবাহিনীতে চাকুরী করত। তখন এদের প্রধান অস্ত্র ছিল ধনুক। সেই থেকে ‘ধানুক সম্প্রদায়’ নাম। বহু দিন আগে এদের পূর্ব পুরুষ মগধ থেকে বিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ধানুক সম্প্রদায়ের মানুষজন সাধারণত উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে। এরা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলায় বসবাস করে। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহাকুমার প্রায় বাইশটি গ্রামে এই সম্প্রদায়ের মানুষজনদের দেখা যায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম হল- সরলা, লোকাইপুর, বসন্তপুর, ডাহিনা, ডাঙ্গাপাড়া, ছোট্টপাড়া, লালুপুর, সিধড়ি, নাদায়, উমরাপুর, হাসুপুর, আলমশাহী ইত্যাদি। এছাড়া মালদা জেলার চামাগ্রাম, বৈষ্ণব নগর, কালিয়াচক, যদুপুর, মোবারক পুর ইত্যাদি গ্রামে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের দেখা যায়।

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের ধানুক সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রধানত তিনটি ভাষায় কথা বলে, সেগুলি হল নিজেদের মাতৃভাষা ধানুক (পূর্বী মগহীর একটী রূপ),বাংলা ও হিন্দি। এই সম্প্রদায়ের মানুষজন বাড়ীতে নিজেদের মধ্যে বা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ধানুক ভাষায় কথা বলে। এরা স্কুল, কলেজ, অফিস ও বাজারে বাঙালি মানুষদের সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা বলে আর বিহারি মানুষদের সঙ্গে হিন্দি ভাষায় কথা বলে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক দিক থেকে বাংলা ভাষা কর্তৃত্বশালী হওয়ায় এই ভাষায় বাংলা ভাষার প্রচুর উপাদানের প্রভাব পড়েছে।তাছাড়া এই সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগই বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করে এবং বাঙালি মানুষজনদের সঙ্গে ভাষিক আদান প্রদান করে, এর ফলে খুব সহজেই এরা বাংলা ভাষায় লিখতে,পড়তে ও কথা বলতে পারে।
মগহী ভাষা হিন্দি ভাষার সমজ ভাষা হওয়ায় মগহী ভাষার শব্দভান্ডারে প্রচুর হিন্দি ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হয়।এর ফলে ধানুক সম্প্রদায়ের মানুষজন খুব সহজেই হিন্দি ভাষী মানুষদের সঙ্গে কথোপকথন করতে

email id:bapisarkar7890@gmail.com

পারে। ধানুক ভাষাভাষী মানুষদের বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন বিহার ও ঝাড়খন্ডে রয়েছে, তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ফলে হিন্দিভাষার সঙ্গে এদের একটি সংযোগ তৈরি হয়ে যায়। এছাড়া ধানুক ভাষী মানুষদের বাড়ীতে হিন্দি সিনেমা, সিরিয়াল ও সংবাদ শোনার প্রচলন রয়েছে- এই সমস্ত কারণের ফলে তারা হিন্দিভাষাতেও খুব সহজেই দক্ষতা অর্জন করে।

ধানুক ভাষায় বাংলা ভাষার সঙ্গে ভাষা সংযোগের (Language contact) ফলে বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে,যেমন- কোড-মিশ্রণ(Code-mixing), কোড-পরিবর্তন(Code-switching) ভাষা ঋণ(Language Borrowing) ও ভাষা সরণ(Language shift) ইত্যাদি। আমরা এই প্রবন্ধে কোড- মিশ্রণ ও কোড-পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

কোড-মিশ্রণ(Code-mixing)

একই পরিস্থিতিতে বক্তা যখন নিজের স্বাছন্দের জন্য বা শ্রোতার সুবিধার জন্য একটি ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দ, শব্দগুছ ও বাক্যাংশের ব্যবহার করে, তখন তাকে কোড-মিশ্রণ (code-mixing)বলে। দ্বিভাষিক বা বহুভাষিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কোডের একত্র সংযোগ ঘটে। অধ্যাপক মৃণাল নাথের মতে -

“যখন একই সঙ্কথনে (utterance) দ্বিতীয় ভাষার ভাষিক ইউনিট (linguistic unit) ব্যবহার হয়, তাকে বলা হয় কোড-মিশ্রণ(code-mixing)।”১

কোড-মিশ্রণ ও ঋণকৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে। কোড-মিশ্রণের ক্ষেত্রে বক্তার ‘choice’ বা নির্বাচন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে । আর ঋণকৃতির ক্ষেত্রে ‘শাব্দিক অভাব’ বা ‘প্রয়োজন পূরণ’ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ধানুক ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সংযোগের ফলে কোড-মিশ্রণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখানে তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরার প্রয়াস করেছি-

- radʰa gan kora hæĕ
  (রাধা গান করে)

এখানে বাংলা ভাষার শব্দ ‘গান’ ধানুক ভাষায় ‘গান’ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। আগে ধানুকরা ‘গান’ অর্থে ‘গীত’ এবং হিন্দি ভাষার শব্দ ‘গানা’ ব্যবহার করত।এখন ধানুক সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘গান’ এর ব্যবহার সর্বত্রই প্রচলিত।

- murgi d̪im de hæĕ
  (মুরগী ডিম দেয়)

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘আণ্ডা’ শব্দ ব্যবহারের প্রচলন আছে। তবে বাংলা ভাষার ‘ডিম’ শব্দের ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

- ɔikʰanme bɔɽka maʈʰ hæĕ
  (এইখানে বড় মাঠ আছে)

এখানে ‘মাঠ’ শব্দটি বাংলা ভাষার শব্দ। ধানুক সম্প্রদায়ের মানুষেরা আগে ‘মাঠ’ অর্থে ‘খেত’ বা ‘খেতি’ শব্দের ব্যবহার করত। কিন্তু এখন আর তা কেউ ব্যবহার করে না। তারা এখন ‘খেত’ শব্দের পরিবর্তে ‘মাঠ’ শব্দ ব্যবহার করে।

- ɔikʰanme bʰiɽ ho gɔlɔĕ
  (এইখানে ভিড় হয়ে গেল)

ধানুক সম্প্রদায়ের মানুষরা বাংলা ভাষার শব্দ ‘ভিড়’ ব্যবহার করে। কিন্তু ধানুক সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘ভিড়’ অর্থে ‘হুড়াহুড়ি’ বা ‘জমজমাট’ শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে।

- haraĕ anondo kɔrab
  (আমরা আনন্দ করব)

'আনন্দ' বাংলা ভাষার শব্দ, ধানুক ভাষায় 'আনন্দ' শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি 'ধুমাধুম' বা 'খুশ' শব্দ ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়।

- bokṭi me sob paṭua kʰa lelkɔĕ
  (ছাগলে সব পাট খেয়ে নিলো)

ধানুক ভাষায় 'সব' অর্থে 'সবটি' ব্যবহারের প্রচলন আছে। তবে তার পরিবর্তে বাংলা ভাষার 'সব' বিশেষণ পদটির ব্যবহার বেশি পছন্দ করে।

- ha beṭa bʰat hoje gælo bʰat kʰa le
  (আরে, খোকা ভাত হয়ে গেছে, ভাত খেয়ে নে)

ধানুক ভাষায় 'ভাত' অর্থে আগে 'ভাদ' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তবে এখন আর কেউ 'ভাদ' শব্দ ব্যবহার করে না। এখন সকলেই বাংলা ভাষার শব্দ 'ভাত' ব্যবহার করে।

- ham bai paṛ
  (আমি বই পড়ি)

ধানুক ভাষায় 'বই' অর্থে 'পুঁথি' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে। তবে সকলেই 'পুঁথি' শব্দের পরিবর্তে 'বই' শব্দ ব্যবহার করে।

- timon ne lonka lagtoĕ
  (তরকারীতে লঙ্কা লাগে)

ধানুক ভাষায় বাংলা ভাষার প্রভাবে 'লঙ্কা' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। এর পাশাপাশি তারা ধানুক ভাষার শব্দ 'মিচাই' ও ব্যবহার করে। দীর্ঘদিন ধরে ধানুক ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সংযোগের ফলে এমনটা ঘটেছে। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা বাংলা ভাষা ব্যবহারে বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠেছে কারণ এখানে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষার দিক থেকে বাংলা ভাষা বেশি কর্তৃত্বশালী।

কোড পরিবর্তন(Code–switching)

বিভিন্ন রকম পরিস্থিতিতে বক্তা যখন নিজের স্বাছন্দ্যের জন্য একটি ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাষার ব্যাকরণগত বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার করে, তাকে কোড-পরিবর্তন(Code switching) বলে। কোড-পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। ভাষা সংযোগের ফলে এটি ঘটে। এই বিষয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকার লিখেছেন-

"যদি তার আয়ত্তে একাধিক ভাষা উপভাষা থাকে তাহলে উপলক্ষ্য অনুযায়ী Shifting বা Switching যে সে করবে এ তো স্বাভাবিক ও সংগত ব্যাপার।"২

যেমন বাংলা ও ইংরেজী ভাষা দীর্ঘ দিনের ভাষা সংযোগের ফলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে কথা বলি। আমরা এই প্রবন্ধে বাংলা ও ধানুক ভাষার সংযোগের ফলে যে সমস্ত কোড-পরিবর্তনগুলি দেখা যায় তার আলোচনা করব। কোড-পরিবর্তনের বিষয়গুলি আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করার প্রয়াস করেছি-

আন্তঃবাক্যিক কোড-পরিবর্তন(Intersentential Code-switching)

বাক্যিক স্তরে এই ধরনের কোড-পরিবর্তন ঘটে, প্রতিটি বাক্য হয় দুটি আলাদা ভাষার। যেমন মুদিখানা দোকানওয়ালার সঙ্গে একজন ধানুক সম্প্রদায়ের ব্যক্তির কথোপকথন –

ʃibu monḍol – dada ʃorʃer tel kɔto ṭaka litar
ɟagonnatʰ monḍol – 150 ṭakka ḍampa
ʃibu monḍol – hommɔr ek ḍampa let de৩

এখানে দেখা যাচ্ছে একটি সামাজিক পরিস্থিতিতে দুজন ধানুক সম্প্রদায়ের মানুষ দুটি ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেছে। প্রথম জন শিবু মণ্ডল নিজ ভাষা সম্পর্কে সচেতন নয় কিন্তু দ্বিতীয়জন নিজ ভাষা সম্পর্কে সচেতন, তাই সে নিজেদের ধানুক ভাষা ব্যবহার করতে চাইছে।

অন্তঃবাক্যিক কোড-পরিবর্তন (Intrasentential Code-switching) :

অন্তঃবাক্যিক কোড-পরিবর্তন হল একটি বাক্যের মধ্যে দুটি ভাষার ব্যবহার। একটি বাক্যে এক ভাষার শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দ বা বাক্যাংশের ব্যবহার হলে তাকে অন্তঃবাক্যিক কোড-পরিবর্তন বলে। যেমন-

ɟɔiram mond̪ol – meg^{h}e pani haĕ na . maʈ^{h} p^{h}aʈ ɟa hæĕ
dɔʃorot^{h} mond̪ol – pani na holoĕ to mella k^{h}oti hotaĕ
ɟɔiram mond̪ol - ebber to poʈua ke dɔr acc^{h}a holɔĕ ni৪

ট্যাগ সুইচিং(Tag Switching)

যখন একটি ভাষার শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যখন অন্য ভাষায় সন্নিবেশ করা হয় তখন Tag switching হয়। যেমন দু'জন সচেতন ধানুক ভাষী মানুষের মধ্যে অনেকদিন পর হঠাৎ দেখা হলে তারা goi̯rlahabɔkoi̯ (নমস্কার) জানিয়ে কথোপকথন শুরু করে-

ɟajkumar mond̪ol– goi̯rlahabɔkoi̯
anondo mond̪ol – go̯irlahabɔkoi̯
ɟaikumar mond̪ol – tarpor tomader elakar sob k^{h}oborak^{h}obor ki
anondo mond̪ol – sob ager motoi colc^{h}e৫

তারা ধানুক ভাষার কোন শব্দ বা শব্দগুছ দিয়ে কথা বলা শুরু করে, পরে আবার বাংলা ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে শুরু করে। তাছাড়া দ্রুতভাবে কোন বক্তব্য বলার জন্য বা রেগে গিয়ে কাউকে বকাবকি করার জন্য তারা এইরকম বাক্য ব্যবহার করে। যারা এইরকম বাংলা ও ধানুক ভাষা মিশিয়ে কথা বলে ধানুক সম্প্রদায়ে তাদের "আধ-বাঙালী"৬ বলা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের ধানুক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা বাংলা, ধানুক ও হিন্দি ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের ধানুক সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে বাংলা স্ট্যান্ডার্ড বলে গণ্য হয়। রাজনৈতিক,প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত বিভিন্ন দিকে বাংলা ভাষার সুযোগ সুবিধা থাকায় ধানুক সম্প্রদায়ের মানুষদের বাংলা ভাষায় 'shift' করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই রকম পরিস্থিতিতে ধানুক সম্প্রদায়ের মানুষদের দুটো দিকের কথা বলা যেতে পারে – সদর্থক দিক আর নঞর্থক দিক। সদর্থক দিক হল এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা একাধিক ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারে কিন্তু নঞর্থক দিক হল ধানুক সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা হারিয়ে যাওয়া। ধানুক সম্প্রদায়ের বর্তমান স্কুল, কলেজ পড়ুয়া ছেলে মেয়েরা বাংলা ও হিন্দি ভাষাকে বিভিন্ন প্রয়োজনে গ্রহণ করছে ও ব্যবহার করছে। তাদের মধ্যে ধানুক ভাষা ব্যবহার করার প্রবণতা কমে যাচ্ছে । এদিক থেকে ধানুক সম্প্রদায়ের বয়স্ক মানুষেরা শঙ্কিত যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো এই ভাষাটি হারিয়ে ফেলবে। এইজন্য ধানুক সম্প্রদায়ের সচেতন ব্যক্তিবর্গ "ধানুক সমাজ কল্যাণ সমিতি" গড়ে তুলেছে, যা ধানুক সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করে নানা রকম সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে।

তথ্যসূত্র

নাথ, মৃ. (১৯৯৯). *ভাষা ও সমাজ.* কলিকাতা: নয়া উদ্যোগ. পৃঃ ২৩৬
সরকার, প. (১৪২২). *ভাষা দেশ কাল.* কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ. পৃঃ ১৩৬

তথ্য সংগ্রহ

মন্ডল, আ. বসন্তপুর, সুতি, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৪০+ (ক্ষেত্রসমীক্ষা)
সরকার, অ. সরলা. সুতি, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৬০+ (ক্ষেত্রসমীক্ষা)
মন্ডল, জয়কুমার. সিধোড়ী, সুতি, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৫৫+ (ক্ষেত্র সমীক্ষা)
মন্ডল, ষ. লোকাইপুর, সুতি, মুর্শিদাবাদ, বয়স ২৫+ (ক্ষেত্রসমীক্ষা)

******এছাড়া তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন – মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহাকুমার সরলা, বসন্তপুর, লোকাইপুর, ডাহিনা, ডাঙ্গা পাড়া, হাসুপুর, এবং মালদা জেলার চামাগ্রাম, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক, যদুপুর, মোবারক পুর ইত্যাদি স্থানের বাসিন্দারা।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি : সাধারণ পরিচয় ও নির্বাচিত গল্পে তার নানা মাত্রা অনুসন্ধান

পারমিতা দাস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30/04/2023

Accepted 08/05/2024

Keywords:

বাহ্যিক বিচ্যুতি,

আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি,

প্রমুখন,

'দিবসের শেষে' গল্প

Guest Editors

Agniv Dutta

Ratul Ghosh

Patitpaban Pal

Organised by: শব্দ /ʃɔbdo̪/

ABSTRACT

ভাষিক বিচ্যুতি (linguistic deviation) বলতে আমরা সাধারণত ভাষিক নর্ম (norm) থেকে বিচ্যুত হওয়াকে বুঝি। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায়, লেখার ভাষায় কিংবা কোনো সাহিত্যিক পাঠে ভাষিক বিচ্যুতি প্রায়শই আমাদের চোখে পড়ে। ভাষার যেকোনো স্তরেই (grammatical, phonological, syntactic, semantic প্রভৃতি) এই বিচ্যুতি দেখা যেতে পারে। কিন্তু এই সবই হল ভাষার বাহ্যিক বিচ্যুতি (external deviation)। বাহ্যিক বিচ্যুতি ছাড়াও আরও যে-এক প্রকার বিচ্যুতির কথা শৈলীবিজ্ঞানীরা বলেন, তা হল আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি (internal deviation)। এই জাতীয় বিচ্যুতি কেবলমাত্র সাহিত্যিকের লেখনীর কলাকুশলতার দ্বারাই প্রকাশ পায়। সচরাচর রোজকার কথাবার্তায় এর উপস্থিতি দেখা যায় না। এই আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি সম্পর্কে আলোচনা এবং এই জাতীয় বিচ্যুতি থেকে প্রাপ্ত প্রমুখনের (foregrounding) প্রকৃতি নির্ণয় বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আমরা দেখব, কোনো একটি সাহিত্যিক পাঠের অভ্যন্তরে লেখক নিজেই ক্রমশ এমন একটি ভাষিক নর্ম বা প্যাটার্ন গড়ে তুলেছেন, যাকে কোনো প্রথাগত বাহ্যিক ভাষাবৈশিষ্ট্যের (উপরোক্ত phonological, syntactic, semantic প্রভৃতি) আওতাভুক্ত করা যায় না। কিন্তু কিছু সময় পরে স্রষ্টা নিজেই সেই স্বনির্মিত ভাষিক প্যাটার্ন থেকে লেখনীকে বিচ্যুত করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের বিচ্যুতি সংশ্লিষ্ট পাঠের নিরিখে বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি সেইসব ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে কোনো একটি বিষয়ের প্রমুখন ঘটায়। প্রবন্ধের প্রথম পর্যায়ে আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ ধারণা দেওয়া হবে। এরপর প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি সাহিত্যিক পাঠকে কেন্দ্র করে আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির নানা মাত্রা বিশ্লেষণ করা হবে। সেটি একটি অতি পরিচিত ছোটগল্প - সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তের লেখা 'দিবসের শেষে'। আমরা দেখব, লেখক এই একটি গল্পের ভিতরেই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষিক প্যাটার্ন নির্মাণ করেছেন এবং প্রত্যেকটি প্যাটার্নই শেষ পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তিনটি ভিন্ন ধরনের আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি এই গল্পে দেখা যাবে। আরও দেখা যাবে যে এই তিন প্রকার বিচ্যুতি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এভাবে গোটা গল্প জুড়ে বারবার প্যাটার্ন নির্মাণ ও তার থেকে বিচ্যুতি এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক – এই সমগ্র প্রক্রিয়ার দ্বারা শেষ পর্যন্ত কোন্ বিষয়ের প্রমুখন হল, তা বর্তমান প্রবন্ধের অনুসন্ধানের বিষয়।প্রবন্ধের সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব যে আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির মতো একটি ভাষিক প্রক্রিয়া সাহিত্যের শিল্পসুষমা বৃদ্ধিতে কতখানি সহায়ক হতে পারে আর কতখানিই-বা কাহিনির প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

email id:paramitadas9832@gmail.com

১. ভূমিকা

পুনরাবৃত্তি (recurrence), পুনরাবৃত্তির হার (frequency), ছাঁচ (pattern) – এই বিষয়গুলি যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট পাঠের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণের মাপকাঠি হয়, তখন আমরা লেখকের শৈলী (authorial style) অপেক্ষা পাঠের শৈলী (textual style) অনুসন্ধানে বেশি প্রবৃত্ত হই। আমরা তখন যে-প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি, তা হল - পুনরাবৃত্তি, পুনরাবৃত্তির হার কিংবা পুনরাবৃত্তির ফলে নির্মিত প্যাটার্ন সংশ্লিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তুর নিরিখে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ? তবে পাশাপাশি একথাও স্বীকার্য যে এরকম ভাষাবৈশিষ্ট্য যদি একটি বা দুটি পাঠে সীমাবদ্ধ না-থেকে একই লেখকের অনেকগুলি লেখায় ধরা দেয়, তবে তা নির্দিষ্ট পাঠের শৈলীর সীমা পেরিয়ে লেখকের নিজস্ব ভাষাশৈলীকে চিহ্নিত করে।

রচনার অন্তর্গত কোনো একটি বিষয়কে ভাষা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলে, সেই প্রক্রিয়াকে প্রমুখন (foregrounding) বলে। আমরা সাধারণত যে-ধরনের প্রমুখন দেখতে অভ্যস্ত, সেটি হল গুণগত প্রমুখন (qualitative foregrounding)। অর্থাৎ, ভাষার গঠনগত নিয়ম (linguistic norm) থেকে বিচ্যুতি (deviation)-র ফলে এই জাতীয় প্রমুখন হয়। কিন্তু এছাড়াও রয়েছে পরিমাণগত প্রমুখন (quantitative foregrounding)। যখন কোনো ভাষাবৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তির হার নির্ণয় করা হয়, তখন আমরা পরিমাণগত (quantitative) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করি। অধিক পরিমাণ পুনরাবৃত্তির ফলে একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন তৈরি হয়। কিন্তু খানিক পরে ওই প্রাপ্ত প্যাটার্ন থেকে যদি বিচ্যুতি ঘটে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওই বিচ্যুতির ফলে কোনো বিষয়ের প্রমুখন (foregrounding) হয়। এই জাতীয় প্রমুখনকে আমরা পরিমাণগত প্রমুখন বলতে পারি। অর্থাৎ, পরিমাণগত প্রমুখন ধরা পড়ে ভাষাবৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই দ্বিতীয় প্রকার প্রমুখনই আমাদের বর্তমান নিবন্ধের আলোচনায় ধরা দেবে। কী জাতীয় বিচ্যুতির ফলে এই প্রমুখন সম্ভব, সে-সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)-এর 'দিবসের শেষে' গল্পটি বিশ্লেষণের আলোকে।

২. বাহ্যিক বিচ্যুতি ও আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি

'কোনো রচনার ভাষাগত বিচ্যুতি বলতে বুঝি, ভাষার প্রচলিত ও প্রত্যাশিত নিয়মের বাঁধন ভেঙে ফেলা (অভিজিৎ মজুমদার, ২০১৬: ৭০)।' গত শতাব্দীর তিনের দশকে প্রাগ্ গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান Jan Mukarovsky বিচ্যুতির তত্ত্ব নির্মাণ করেন। বিচ্যুতি হল এমন এক শৈলীগত কৌশল, যার মাধ্যমে রচয়িতা কোনো প্রতিষ্ঠিত নর্ম থেকে সরে আসেন। এর ফলে একটি শিল্পসম্মত সাহিত্যিক পাঠের জন্ম হয়। ভাষাবিদ্ Nils Erik Enkvist-এর মতে, রচনার বিষয় ও উদ্দেশ্য, পাঠকের যোগ্যতা ও লেখকের ব্যক্তিত্ব অনুসারে বিচ্যুতির মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিচ্যুতি ভাষার যেকোনো স্তরে (grammatical, phonological, semantic, syntactic, graphological প্রভৃতি) থাকতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট পাঠে একইধরনের বিচ্যুতি একাধিকবার প্রযুক্ত হলে, কোনো একক বিষয় বা ভাবনার প্রমুখন হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। তবে সব বিচ্যুতির ক্ষেত্রে যে প্রমুখন হবেই এমন নিশ্চয়তা নেই। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায়, লেখার ভাষায় কিংবা কোনো সাহিত্যিক পাঠে ভাষিক বিচ্যুতি প্রায়শই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু সচরাচর যেসব বিচ্যুতি আমরা দেখি, সেই সবই হল ভাষার বাহ্যিক বিচ্যুতি (external deviation)। রচনার বাইরে থেকে নির্মিত কোনো ভাষিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে এই জাতীয় বিচ্যুতি হয়। দুটি উদাহরণ দেখা যাক –

<u>আন্বয়িক বিচ্যুতি</u>: 'আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো' (মৃত্যুর আগে : জীবনানন্দ দাশ)

<u>ধ্বনিগত বিচ্যুতি</u>: 'মুখানি থুয়ে তার মুখে' [< মুখখানি] (ছবি ও গান : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাহ্যিক বিচ্যুতি ছাড়াও আরও যে-এক প্রকার বিচ্যুতির কথা শৈলীবিজ্ঞানীরা বলেন, তা হল আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি (internal deviation)। এই জাতীয় বিচ্যুতি কেবলমাত্র সাহিত্যিকের লেখনীর কলাকুশলতার দ্বারাই প্রকাশ পায়। সচরাচর রোজকার কথাবার্তায় এর উপস্থিতি দেখা যায় না। আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির ক্ষেত্রে বাহ্যিক বিচ্যুতির মতো আগে থেকে তৈরি কোনো ভাষিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না। বরং, রচনার ভিতরেই রচয়িতা স্বয়ং একটি ভাষা-ছাঁচ বা প্যাটার্ন বানিয়ে তোলেন এবং তারপর নিজেই সেই প্যাটার্ন থেকে বিচ্যুত হন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের বিচ্যুতি সংশ্লিষ্ট পাঠের নিরিখে বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি সেইসব ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে কোনো একটি বিষয়ের প্রমুখন ঘটায়। লেখকের স্বনির্মিত ভাষিক প্যাটার্নটি তৈরি হয় কোনো একটি ভাষাবৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তির ফলে। সুতরাং, নির্মিত প্যাটার্নটিকে বুঝতে গেলে পুনরাবৃত্তির পরিমাণ হিসাব করতে হয়। অর্থাৎ, পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। তাই আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির ফলে প্রাপ্ত প্রমুখনটি হয় পরিমাণগত প্রমুখন। এই আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি এবং তা থেকে প্রাপ্ত প্রমুখনের বহুবিধ দৃষ্টান্ত উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।

৩. বিশ্লেষণের পদ্ধতি

নির্বাচিত গল্পটির মধ্যে ব্যক্তি, ঘটনা বা কোনো পরিস্থিতি সম্পর্কে যেসব বর্ণনাধর্মী অংশ রয়েছে, সেইসব অংশেই আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির উপস্থিতি দেখা যায়। তাই সেই অংশগুলিই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পুনরাবৃত্তি বোঝার ক্ষেত্রে পরিমাণগত পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে বর্ণনাধর্মী অংশের বাক্যগুলির দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে।

৪. বিশ্লেষণ

'দিবসের শেষে' গল্পের দৈর্ঘ্য শব্দসংখ্যার বিচারে যদি বলা হয়, তাহলে এটি ১৬৫৬ শব্দের দীর্ঘ একটি গল্প। সুতরাং একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে গল্পটিতে আভ্যন্তরীণ ভাষিক প্যাটার্ন নির্মাণ করার এবং নির্মিত প্যাটার্ন থেকে বিচ্যুত হবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। খুব ছোট পরিসরের গল্পে বাহ্যিক বিচ্যুতি দেখা গেলেও আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি তেমন একটা দেখা যায় না। যেমন- বনফুলের নিমগাছ খুব ছোট পরিসরের একটি গল্প, যেখানে বিচ্যুতি ও প্রমুখন দু'য়ের উপস্থিতিই লক্ষণীয়। কিন্তু এই গল্পের বিচ্যুতিকে আমরা বাহ্যিক বিচ্যুতিই বলবো। এটি আসলে অর্থগত বিচ্যুতি (semantic deviation)। গল্পে উপস্থিত নিমগাছের মেটাফরই এই বিচ্যুতির জন্য দায়ী (transference of meaning)। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির জন্য সাধারণত মাঝারি থেকে বড় দৈর্ঘ্যের গল্প প্রয়োজন, যাতে লেখক বেশ ভালোভাবে একটি আভ্যন্তরীণ প্যাটার্ন তৈরি করার জায়গা পান।

৪.১. 'দিবসের শেষে' : বিষয়সংক্ষেপ

জগদীশ গুপ্তের 'দিবসের শেষে' গল্পে জীবনের অনিশ্চয়তার কাছে মানুষের নির্মম পরাভবের চিত্র ধরা দিয়েছে। গল্পে রতি নাপিতের পাঁচ বছরের ছেলে একদিন সকালে বলল, 'মা, আজ আমায় কুমীরে নেবে'। এরকম অদ্ভুত আকস্মিক কথা শোনার পর থেকে রতি ও তার স্ত্রীর মনে কিছুটা ভাবনার উদয় হলেও, বেশিক্ষণ তা স্থায়ী হয় না। ছেলের আশঙ্কাকে রতি মোটেই আমল দিতে চায়নি। বরং ছেলের কথায় মনে মনে ভেবেছে, 'পাগল ছেলে!'। কারণ সে তো জানে যে তাদের বাড়ির কাছের চিরপরিচিত মমতাময়ী কামদা নদীতে কেউ কোনোদিন কুমির দেখেনি। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেদিনই কামদা নদীতে কুমির দেখা দিল এবং ছেলেটি সেই কুমিরের মুখগহ্বরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আকস্মিক অথচ অনিবার্য নিয়তির কাছে মানুষ যে কতখানি অসহায়, তা এই পরিণতিতে প্রকাশ পায়। সেখানে

কোনো জ্ঞাত তথ্য, অভিজ্ঞতা, তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তিনিষ্ঠতা, বস্তুতান্ত্রিকতা এসবের কোনো মূল্য নেই। মানবজীবনের সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তাই তাই গল্পে শেষকথা বলে।

৪.২. 'দিবসের শেষে' গল্পে আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি ও তার প্রভাব

লেখক জগদীশ গুপ্ত এই একটি গল্পের ভিতরেই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষিক প্যাটার্ন নির্মাণ করেছেন এবং প্রত্যেকটি প্যাটার্নই শেষ পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তিনটি ভিন্ন ধরনের আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি এই গল্পে দেখা যায়। আমরা এই বিচ্যুতিগুলো ক্রমান্বয়ে বোঝার চেষ্টা করব।

৪.২.১. প্রথম প্রকার আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি ও তার প্রভাব

গল্পের একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ –

রতি নাপিতের বাড়ীটার অবস্থানক্ষেত্র বড় চমৎকার – বাড়ীর পূর্বে নদী কামদা, পশ্চিমে বাগান; উত্তরে বেণুবন; দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। সূর্যদেব দিগন্তরেখা স্পর্শ করিতে না করিতে তাঁর টক্‌টকে হিঙ্গুল আভাটি রতির গৃহচূড়া চুম্বন করে; রতি ঠিক পাখীর ডাকেই জাগে,-গোধূলিতে তারা বৃক্ষাবাসে ফিরিয়া আসিতেই তাদের কলকাকলির সঙ্গে সঙ্গে সেই শান্তির সুরে সুর মিলাইয়া তার তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে; দক্ষিণের হাওয়ায় উত্তরের বাঁশ সির্ সির্ করে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি জাগে, দক্ষিণে সুচিক্কণ শ্যামল দোলের অন্ত থাকে না; কিন্তু এই এতবড় কান্ডটার প্রতি রতির দৃক্‌পাতও নাই – তার চোখ কান এ-সব দেখিতে শুনিতে শেখে নাই। সে যে চাক্‌রাণ জমি ভোগ করে তাহাই তার একমাত্র ধ্যান। রতি বস্তুতান্ত্রিক। (জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬৫ব. : ৪৩৭)

অনুচ্ছেদে পরপর তিনটি বড় বাক্যের পর আসে শেষ বাক্যটি, যেটি মাত্র দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত (দ্রষ্টব্য সারণি (১):

বাক্যের ক্রম সংখ্যা	১	২	৩	৪
শব্দসংখ্যা	২১	৭২	১০	২

সারণি: ১

অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি বড়। দ্বিতীয়টি তার প্রায় সাড়ে তিন গুণ বড় বাক্য। এরপর তৃতীয় বাক্যটি শব্দসংখ্যার বিচারে হঠাৎ ক'রে দ্বিতীয়টির প্রায় সাত ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। তারপর অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি তৈরি হয় মাত্র দুটি শব্দে, যা তৃতীয় বাক্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, দ্বিতীয় বাক্যের ছত্রিশ ভাগের এক ভাগ এবং প্রথম বাক্যের সাড়ে দশ ভাগের এক ভাগ। এভাবে অন্যান্য দীর্ঘ ও অতিদীর্ঘ বাক্য মিলে যে দৈর্ঘ্যের আভ্যন্তরীণ প্যাটার্ন নির্মিত হয়, তা থেকে শেষ বাক্যটির বিচ্যুতি ঘটে।

'রতি বস্তুতান্ত্রিক।' - এই শেষ বাক্যটি কাহিনির নিরিখে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। রতির বস্তুতান্ত্রিক মন কোনো আবেগকে কখনো প্রশ্রয় দেয়নি। তাই ছেলেকে কুমীরে নেবে এমন আশঙ্কা যখন ছেলের মন থেকে তার মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়, তখনো সে আশঙ্কাকে আমল দিতে চায়নি। কিন্তু গল্পের পরিণামে তাকে নিয়তির কাছে এই বস্তুতান্ত্রিকতার মূল্য চোকাতে হয়েছে ছেলের জীবনের বিনিময়ে। সুতরাং আমরা বলতে পারি ছোট দৈর্ঘ্যের বাক্যটিকে লেখক আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির মাধ্যমে প্রমুখিত করেছেন।

৪.২.২. দ্বিতীয় প্রকার আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি ও তার প্রভাব

প্রথম অনুচ্ছেদে যে বিচ্যুতি ও প্রমুখন পাওয়া গেল, সেই একই প্রকার বিচ্যুতি ও প্রমুখনের যুগপদ পুনরাবৃত্তি দেখা যায় গল্পের অনেকগুলি বর্ণনাধর্মী অনুচ্ছেদে। অনুচ্ছেদগুলির প্রতিটিতেই কাহিনির নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবাহী বাক্যটি হয়েছে ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের। অর্থাৎ, ওই বাক্যগুলির প্রমুখন হয়েছে।

এভাবে সমজাতীয় বিচ্যুতি ও প্রমুখনের বহু পুনরাবৃত্তির ফলে আবার একটি প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে। আমরা প্যাটার্নটি প্রথমে বোঝার চেষ্টা করবো, তারপর তা থেকে কীভাবে বিচ্যুতি হল, তা দেখবো।
(ক) প্যাটার্নের অন্তর্গত প্রথম বর্ণনাধর্মী অংশ১ (দ্রষ্টব্য সারণি: ২) –

বাক্যের ক্রম সংখ্যা	শব্দসংখ্যা
১	২১
২	৭২
৩	১০
৪	২

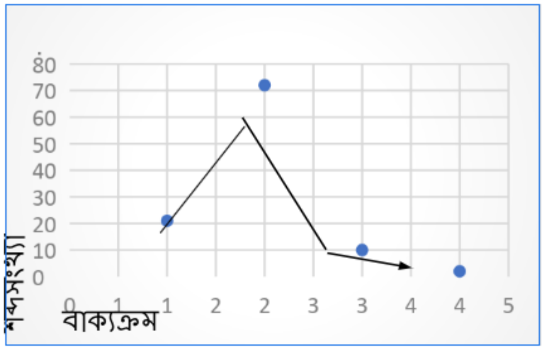

সারণি: ২

এখানে প্রমুখিত বাক্য হল - ‘রতি বস্তুতান্ত্রিক।’
(খ) প্যাটার্নের অন্তর্গত দ্বিতীয় বর্ণনাধর্মী অংশ২ (দ্রষ্টব্য সারণি: ৩) –

বাক্যের ক্রম সংখ্যা	শব্দসংখ্যা
১	১৮
২	৩১
৩	৮
৪	২

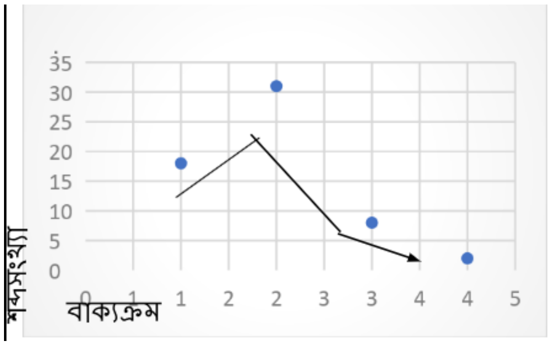

সারণি: ৩

এখানে প্রমুখিত বাক্য হল - ‘পাগল ছেলে!’
(গ) প্যাটার্নের অন্তর্গত তৃতীয় বর্ণনাধর্মী অংশ৩ (দ্রষ্টব্য সারণি: ৪) –

বাক্যের ক্রম সংখ্যা	শব্দসংখ্যা
১	১১
২	১২
৩	৩২
৪	১৪
৫	১৯
৬	২৩
৭	৫

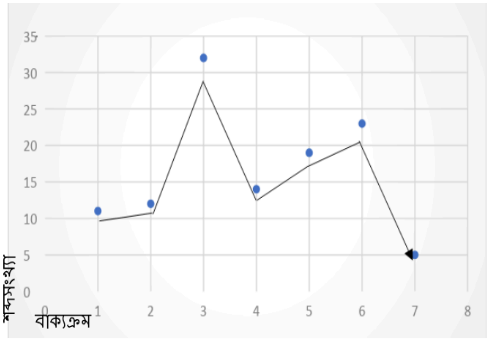

সারণি: ৪

এখানে প্রমুখিত বাক্য হল - ‘কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।’
(ঘ) প্যাটার্নের অন্তর্গত পরবর্তী বর্ণনাধর্মী অংশ৪ (দ্রষ্টব্য সারণি: ৫) –

বাক্যের ক্রম সংখ্যা	শব্দসংখ্যা	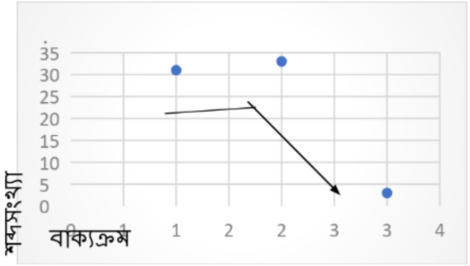
১	৩১	
২	৩৩	
৩	৩	

সারণি: ৫

এখানে প্রমুখিত বাক্য হল - ‘তাকে ভয় নাই।’
(ঙ) প্যাটার্নের অন্তর্গত পরবর্তী বর্ণনাধর্মী অংশ৫ (দ্রষ্টব্য সারণি: ৬) –

বাক্যের ক্রম সংখ্যা	শব্দসংখ্যা	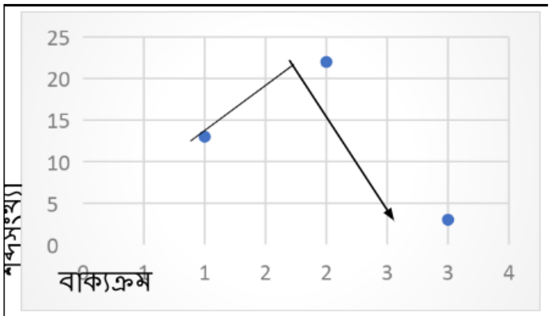
১	১৩	
২	২২	
৩	৩	

সারণি: ৬

এখানে প্রমুখিত বাক্য হল - ‘তবে ভয় কিসের?’
ওপরের প্রতিটি উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘ বাক্যের প্যাটার্ন থেকে বিচ্যুত হয়ে শেষ বাক্যটি হয়েছে ক্ষুদ্রতম। এভাবে বাক্যগুলির প্রমুখন হয়েছে। ফলে প্রতিটি বাক্যই হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ। বাক্যগুলি পৃথকভাবে কাহিনির ভয়ঙ্কর পরিনামের ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে। এভাবে সমজাতীয় প্রমুখনের একাধিক পুনরাবৃত্তির প্রভাবে দ্বিতীয় প্রকার প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে। কিন্তু গল্পের শেষে গিয়ে লেখক তাঁর স্বনির্মিত গুরুত্বপূর্ণ ছোট বাক্যের এই প্যাটার্ন থেকে বিচ্যুত হয়ে যান। গল্পের পরিণাম নির্দেশক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটি আর মোটেই ক্ষুদ্র থাকে না, বাক্যটির শব্দসংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ৪৬ –
পাঁচু হেঁট হইয়া ঘট তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দু’টি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল; পরমুহূর্তেই সে স্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিল, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেল—এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। (জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬৫ব. : ৪৪১)

এর পরের অনুচ্ছেদ হল গল্পের শেষ অনুচ্ছেদ৬। সেখানে আবারও আগের প্যাটার্ন ফিরে আসতে দেখা যায়। অর্থাৎ, অনুচ্ছেদ শেষ হয় ছোট বাক্য দিয়ে এবং বাক্যটির প্রমুখন হয় (দ্রষ্টব্য সারণি: ৭)।

বাক্যের ক্রম সংখ্যা	শব্দসংখ্যা	
১	১২	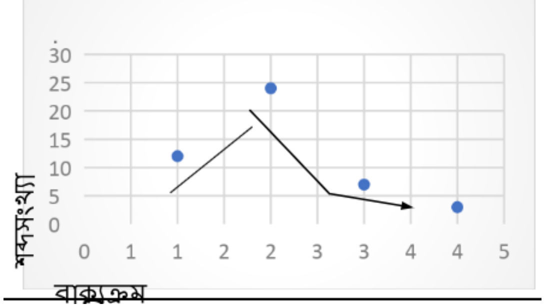
২	২৪	
৩	৭	
৪	৩	

সারণি: ৭

তাহলে এই দ্বিতীয় প্রকার আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির ফলে ৪৬-শব্দের বড় বাক্যটির প্রমুখন হল। দেখা যাক, এই প্রমুখন কী কী বিষয় নির্দেশ করছে -

১) গোটা গল্পে পাঁচুর মৃত্যুর ঘটনার গুরুত্ব সর্বাধিক।

২) দীর্ঘ সময় ধরে বানিয়ে তোলা প্যাটার্ন থেকে আকস্মিক বিচ্যুতি কার্যত ঘটনার আকস্মিকতাকেই নির্দেশ করে।

৩) প্যাটার্ন থেকে হঠাৎ-বিচ্যুত অংশটির পর যে আবার আগের প্যাটার্ন ফিরে এলো – এর ফলে যে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ফুটে ওঠে তা হল – ব্যক্তি-মানুষের জীবনে আকস্মিকভাবে যা-ই ঘটে যাক না কেন, তাতে প্রকৃতির কোনো বাত্যয় ঘটে না। চারপাশের জগত তার নিজের ছন্দে (প্যাটার্নে) চিরকালব্যাপী চলতে থাকে। শুধু মাঝখান থেকে তৈরি হওয়া দুয়েকটি আকস্মিক বিচ্যুতি দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র। তা কেবল সাময়িক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে।

৪.২.৩. তৃতীয় প্রকার আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি

ওপরের রেখচিত্রগুলির প্রত্যেকটিতে আমরা দেখি যে বর্ণনা-অংশ শুরু হয়েছে বেশি শব্দসংখ্যা দ্বারা গঠিত বড় বাক্য দিয়ে। এরপর ক্রমশ বাক্যের শব্দসংখ্যা আরও বাড়তে থাকে। শেষে গিয়ে শব্দসংখ্যা বৃদ্ধির গতি হঠাৎ নিম্নমুখী হয়ে যায় এবং একবারে অনেকটা নেমে যায়। যেহেতু বারবার সমজাতীয় রেখচিত্র পাওয়া যায়, তাই এক্ষেত্রেও একটি প্যাটার্ন তৈরি হয় -

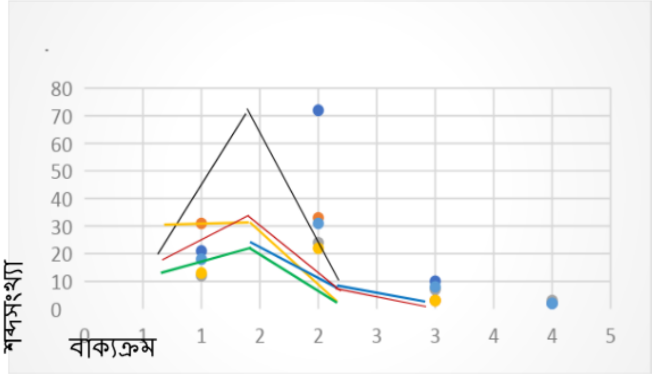

গল্পের ভিতরে এই প্যাটার্নটি থেকেও বিচ্যুতির দেখা মেলে। অর্থাৎ, বিচ্যুত অংশে আর শেষ বাক্যটি ছোট নয়, বরং তা বিপরীত – শেষ বাক্যটাই বহুশব্দ-নির্মিত। নিচে বিচ্যুতিগুলি দেখানো হল –

বিচ্যুত বর্ণনাধর্মী অংশ৭ (দ্রষ্টব্য সারণি: ৮) -

বাক্যের ক্রম সংখ্যা	শব্দসংখ্যা	
১	৩৮	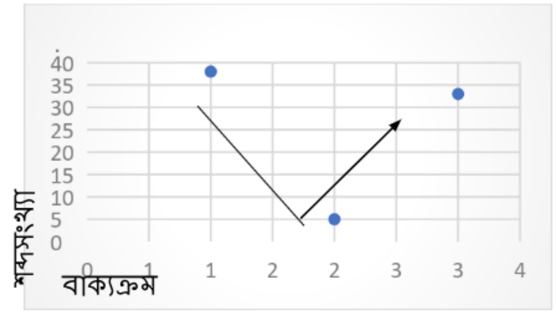
২	৫	
৩	৩৩	

সারণি: ৮

শেষ বাক্যটি শব্দসংখ্যার বিচারে উর্দ্ধগামী। এই প্যাটার্ন থেকে বিচ্যুতির দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উদাহরণে দেখা যায় একটি বাক্য দ্বারাই একটি অনুচ্ছেদ নির্মিত। অতএব এসব ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্য = অনুচ্ছেদের শেষ বাক্য। এইসব উদাহরণে বাক্যের শব্দসংখ্যা যথাক্রমে ২৩, ১২, ৫০ এবং ৫১।

৪.২.৪. চতুর্থ প্রকার আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি

প্রথমে আমরা দুটো বর্ণনাধর্মী অংশের রেখচিত্র পরপর দেখবো।

শব্দসংখ্যার নিরিখে গল্পের প্রথম দিকের একটি বর্ণনাধর্মী অনুচ্ছেদের৮ গঠন দেখানো হল (দ্রষ্টব্য সারণি: ৯)।

বাক্যের ক্রম সংখ্যা	শব্দসংখ্যা	
১	৮	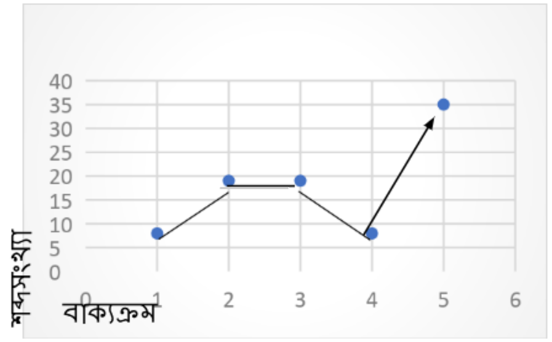
২	১৯	
৩	১৯	
৪	৮	
৫	৩৫	

সারণি: ৯

শব্দসংখ্যার সজ্জা দেখলে বোঝা যায়, লেখক পরিকল্পিতভাবেই শব্দসংখ্যার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। রেখচিত্রে দেখি, অনুচ্ছেদটি প্রথমে যে-শব্দসংখ্যায় শুরু হয়েছিল, পরের ধাপে সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। বিচ্যুত হয়ে যেখানে পৌঁছেছে (শব্দসংখ্যা=১৯), সেখানে কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়েছে। কারণ পরের ধাপেও দেখা যাচ্ছে, শব্দসংখ্যা একই আছে। কিন্তু এখানেও বেশি সময় স্থায়ী হয়নি। পুনরায় বিচ্যুত হয়ে প্রথম বাক্যের শব্দসংখ্যার সঙ্গে সমতা তৈরি করেছে। কিন্তু শেষ ধাপে গিয়ে আর কোনো শব্দসংখ্যার সাথেই সমতা তৈরি না-ক'রে এক ধাক্কায় অনেকখানি বিচ্যুত হয়ে গেছে।

এবার শব্দসংখ্যার নিরিখে গল্পের শেষ দিকের একটি বর্ণনাধর্মী অনুচ্ছেদের৯ গঠন দেখানো হল (দ্রষ্টব্য সারণি: ১০)।

বাক্যের ক্রম সংখ্যা	শব্দসংখ্যা
১	১৪
২	১৪
৩	৩৭
৪	১৪
৫	১৬
৬	৩
৭	১৮
৮	২০
৯	১৩
১০	৪
১১	৩

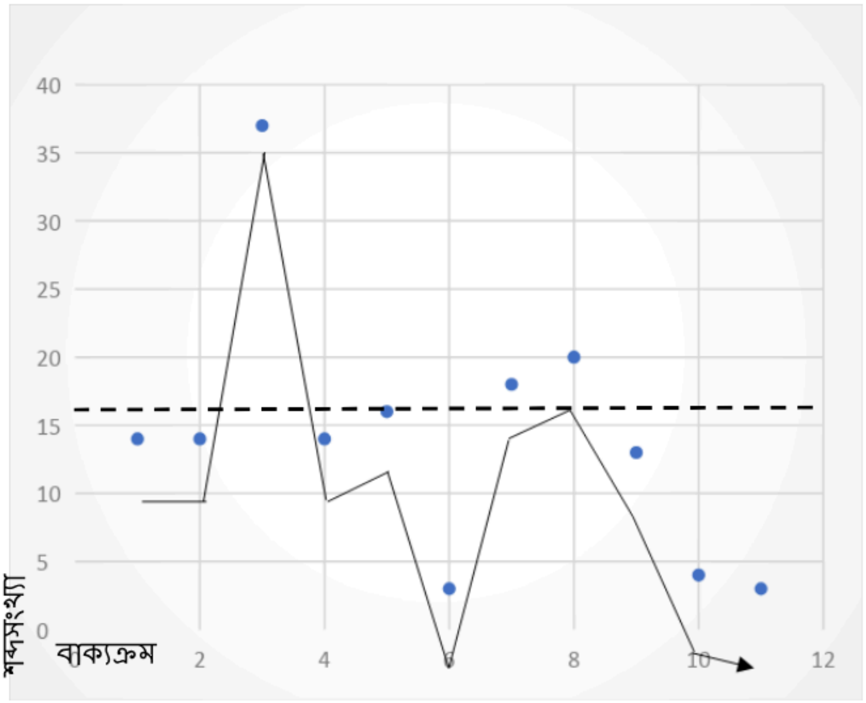

সারণি: ১০

শব্দসংখ্যার পুনরাবৃত্তি এই উদাহরণেও বেশ কয়েকবার দেখা গেছে। আর বেশ কয়েকবার কম পরিমাণ বিচ্যুতি ঘটেছে – শব্দসংখ্যা সেসব ক্ষেত্রে ১৩ থেকে ২০-র মধ্যে আনাগোনা করেছে। কিন্তু কোথাও কোথাও খুব বেশি মাত্রায় তরঙ্গ (fluctuation) দেখা যাচ্ছে। বিচ্যুতির প্রাবল্যও সেসব স্থানে অধিক।

৪.৩. সমস্ত প্রকার আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি থেকে প্রাপ্ত সার্বিক প্রমুখন

বারবার বিভিন্ন ধরনের ভাষাছাঁদ বা প্যাটার্ন এবং প্রতিটি প্যাটার্ন থেকে বিচ্যুতি, বিচ্যুতি থেকে প্রাপ্ত প্রমুখন, কখনো আবার শব্দসংখ্যার পরিকল্পিত পুনরাবৃত্তি – এই সবকিছুই একত্রে নির্মাণ করেছে গল্পের কাঠামো। বহুবিধ প্যাটার্ন থেকে প্রাপ্ত বহুবিধ বিচ্যুতি শেষ পর্যন্ত যে-বোধের প্রমুখন করেছে, তা হল এক সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তার বোধ। জীবন কখনোই চির-সুস্থির নয়। মাঝে-মাঝে এক-একটা প্যাটার্ন পাওয়া গেলেও, তা আসলে জীবনে চলার পথে আপাত স্থিতি। পরমুহূর্তেই আগের স্থিতাবস্থা থেকে বিচ্যুত হতে হয়। জীবনব্যাপী এই স্থিতি আর বিচ্যুতির চিত্র গল্পে একটি দিনের আধারে পরিবেশিত। সারাদিন ধ'রে রতি ও তার পরিবারের অন্য দুই সদস্যের মনে অনবরত যে ভয় আর অভয়ের পারস্পরিক স্থিতি-বিচ্যুতি চলেছে, তার ফলে একটি অস্থিরতার প্যাটার্ন (pattern of fluctuation) তৈরি হয়েছে। কিন্তু গল্পের পরিণামে পাঁচুর মৃত্যুর আকস্মিকতা ভয়-অভয় দ্বারা নির্মিত প্যাটার্ন থেকে এক লহমায় বিচ্যুত হয়ে গেছে। এই বিচ্যুতি আসলে জীবনের সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তার কাছে মানুষের চরম অসহায়তাকেই প্রমুখিত করেছে। একে আমরা discoursal foregrounding বলতে পারি।

৫. সিধান্ত

ক) বর্তমান গবেষণামূলক নিবন্ধে 'দিবসের শেষে' গল্পের syntagmatic ও paradigmatic উভয় স্তরেই

ভাষিক প্যাটার্ন ও বিচ্যুতি পরীক্ষা করা হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে বিচ্যুতি তথা প্রমুখন দেখা গেছে syntagmatic স্তরে। আর যখন অনেকগুলি অনুচ্ছেদের মধ্যে প্যাটার্ন পাওয়া গেছে এবং তার বিচ্যুতি ও প্রমুখন লক্ষ করা গেছে, তখন তা হয়েছে paradigmatic স্তরে।

খ) আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির মূলকথা হল পাঠের অভ্যন্তরেই গড়ে ওঠা কোনো প্যাটার্নের ভাঙন। ‘দিবসের শেষে’ গল্পে আমরা তেমনটাই বারবার হতে দেখি। তবে এই গল্পে শব্দসংখ্যার ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি দেখা গেছে। অন্য কোনো গল্পে অন্যভাবেও আভ্যন্তরীণ প্যাটার্ন ও তার থেকে বিচ্যুতি দেখা যেতে পারে।

গ) আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি কাহিনির অন্তর্নিহিত অর্থকে সুনিশ্চিত করে। ফলে গবেষণা আরও বেশি যুক্তিনিষ্ঠ হয়।

ঘ) আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি কাহিনিকে চরম পরিণতিতে পৌঁছাতে সহায়তা করে।

ঙ) আভ্যন্তরীণ প্যাটার্ন ও বিচ্যুতি যেকোনো পাঠের কাঠামোয় খানিক নান্দনিক শোভাও বৃদ্ধি করে বৈকি।

উল্লেখপঞ্জি

মজুমদার, অ. (২০১৬). *শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব*. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

চক্রবর্তী, উ. ও চক্রবর্তী, নী. (২০১৬). *ভাষাবিজ্ঞান*. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

গুপ্ত, জ. (১৩৬৫ ব). দিবসের শেষে, অন্তর্গত: নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পা.), *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*. কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড.

Leech, G. & Short, M. (1981). *Style in Fiction*. London and New York: Longman.

Levin, S. (1965). *Internal and External Deviation in Poetry*. Word, 21: 225-37. DOI: 10.1080/00437956.1965.11435425

Mukarovsky, J. (1964). Standard Language and Poetic Language. In *A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style*. Ed. Paul Garvin (trans. from the original Czech by Paul Garvin). Washington: Georgetown University Press.

পরিশিষ্ট

দিবসের শেষে' গল্প থেকে গৃহীত অংশগুলি বর্তমান নিবন্ধে ব্যবহারের ক্রম অনুসারে নিচে উল্লেখ করা হল–

১. ‘রতি নাপিতের বাড়ীটার ... রতি বস্তুতান্ত্রিক।’ (জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬৫ব. : ৪৩৭)
২. ‘ছেলের সর্বনেশে ... পাগল ছেলে!’ (জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬৫ব. : ৪৩৮)
৩. ‘রতি স্ত্রীর মুখে ... সত্য হইয়াছিল।’ (জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬৫ব. : ৪৩৮)
৪. ‘তখন আষাঢ় মাসের ... তাকে ভয় নেই।’ (জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬৫ব. : ৪৩৮)
৫. ‘এই ক্ষুদ্র ঘটনায় ... তবে ভয় কিসের?’ (জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬৫ব. : ৪৪০)
৬. ‘যখন ওপারের কাছাকাছি ... সে তখন মূর্চ্ছিতা।’ (জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬৫ব. : ৪৪১)
৭. ‘একগুঁয়ে কোপনস্বভাব ... সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।’ (জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬৫ব. : ৪৩৭)
৮. ‘রতির একটিমাত্র ... তার উৎকণ্ঠা।’ (জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬৫ব. : ৪৩৭)
৯. ‘জলের ধার পর্যন্ত ... রতি ভাবিতে লাগিল।’ (জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬৫ব. : ৪৩৯-৪০)

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

বাংলা শিশুসাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ, গঠন এবং ব্যকরণগত অবস্থান

রাকিবা সুলতানা
ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট

ARTICLE INFO

Article history:
Received 10/07/2023
Accepted 08/05/2024

Keywords:
ধ্বন্যাত্মক শব্দ,
শিশুসাহিত্য,
সাউন্ড সিম্বলিজম,
ব্যকরণ

Guest Editors
Agniv Dutta
Ratul Ghosh
Patitpaban Pal

Organised by: শব্দ /ʃɔbd̪o/

ABSTRACT

বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ—যার সূত্রপাত বলা যেতে পারে প্রাকৃতিক শব্দগুচ্ছ; যেসকল শব্দ, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সাথে সম্বন্ধিত, যেমন "টলটল", "রিমঝিম", "শোঁশোঁ" ইত্যাদি, এবং যা প্রাকৃতিক ঘটনার অনকরুণে নির্মাণ করা হয়েছে। বাক্যে ভাবগত দিক থেকে অক্ষরগুলি শব্দে বিন্যস্ত হলেও এর ব্যকরণগত বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এসকল শব্দ বাক্যের প্রয়োজনে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ও ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে কাজ করে। এসকল শব্দের গঠনের ক্ষেত্রে ধ্বনিতাত্ত্বিক কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্তমান। ধ্বনি, রূপ ও শব্দার্থগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নানান ভাষাবিষয়ক ভাবনাও প্রগাঢ় হয়, একারণেই এসব ধ্বন্যাত্মক শব্দের মধ্যে দিয়ে,অবশ্যম্ভাবী বাংলা সাহিত্যেও এর বহুল প্রয়োগ দেখা গেছে। শিশুসাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার গল্প বলাকে আরোও সহজ করেছে। শব্দকেন্দ্রিক ব্যাখ্যাগুলি পড়ার ক্ষেত্রে সহজবোধ্য হয়েছে এবং ভাবনাগুলোকে পরিস্কারভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বেশ কিছুশিশু সাহিত্যিক। প্রতীকি শব্দ কিংবা ডেভিড ক্রিস্টালের মতামত অনুযায়ী 'সাউন্ড সিম্বলিজমের' তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে বলা যেতে পারে, এইসব ধন্যাত্মক শব্দ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এর প্রয়োগে ভাষা আরোও জীবন্ত ও বোধগম্য হয়েছে। বর্তমানের এই গবেষণা পত্রটি কিছু শিশুসাহিত্যিকের কবিতা ও গল্পের সূত্র ধরে শব্দগুলিকে (১)ধ্বনিগত, (২)রূপগত এবং (৩)অর্থগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছে। সাহিত্যে ভাষার প্রয়োগ ও তার ধ্বনিতাত্ত্বিক বা ব্যকরণগত ব্যাখ্যা খুবই জনপ্রিয়, সাহিত্যের অন্যতম বিষয় ভাষা। এই গবেষণা পত্রে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার তাত্ত্বিক অবস্থান বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভূমিকা

বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ—যার সূত্রপাত বলা যেতে পারে প্রাকৃতিক শব্দগুচ্ছ; যে সকল শব্দ, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সাথে সম্বন্ধিত, যেমন "টলটল", "রিমঝিম", "শোঁ শোঁ" ইত্যাদি, এবং যা প্রাকৃতিক ঘটনার অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছে। বাক্যে ভাবগত দিক থেকে অক্ষরগুলি শব্দে বিন্যস্ত হলেও এর ব্যাকরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এ সকল শব্দ বাক্যের প্রয়োজনে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ও ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে কাজ করে। এ সকল শব্দের গঠনের ক্ষেত্রে ধ্বনিতাত্ত্বিক কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্তমান। ধ্বনি, রূপ ও শব্দার্থগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নানান ভাষাবিষয়ক ভাবনাও পরিস্কার হয়, একারণেই এসব ধ্বন্যাত্মক শব্দের মধ্যে দিয়ে,অবশ্যম্ভাবী বাংলা সাহিত্যেও এর বহুল প্রয়োগ দেখা গেছে। শিশুসাহিত্যে

email id:seikhrakibabinkar123@gmail.com

ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার গল্প বলাকে আরোও সহজ করেছে। শব্দকেন্দ্রিক ব্যাখ্যাগুলি পড়ার ক্ষেত্রে সহজবোধ্য হয়েছে এবং ভাবনাগুলোকে পরিষ্কারভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বেশ কিছু শিশু সাহিত্যিক। প্রতীকি শব্দ কিংবা ডেভিড ক্রিস্টালের মতামত অনুযায়ী 'সাউন্ড সিম্বলিজমের' তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে বলা যেতে পারে, এইসব ধন্যাত্মক শব্দ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এর প্রয়োগে ভাষা আরোও জীবন্ত ও বোধগম্য হয়েছে। বর্তমানের এই গবেষণা পত্রটি কিছু শিশুসাহিত্যিকের কবিতা ও গল্পের সূত্র ধরে শব্দগুলিকে (১)ধ্বনিগত, (২)রূপগত এবং (৩)অর্থগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছে।

(১) ধ্বন্যাত্মক শব্দের ধ্বনিগত বিশ্লেষণ-
হাঁটুতে হাঁটুতে ঠকাঠক হয়ে কড়া পড়ে যেত! (চিরকালের সেরা; লীলা মজুমদার)
এক্ষেত্রে 'ঠকাঠক' শব্দটির ধ্বনিগত বিন্যাস হচ্ছে- CVCVCVC
ওলটানো টবে চড়ে গ্যাঁসগ্যাঁসে গলায় বক্তৃতা দিচ্ছে। (চিরকালের সেরা; লীলা মজুমদার)
'গ্যাঁসগ্যাঁসে' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে ধ্বনিগত বিন্যাস হবে- CVCCVCV

(২) রূপগত - উপরোক্ত বাক্য থেকে পর্যবেক্ষণ করলে, 'গ্যাঁসগ্যাঁস' শব্দটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ হিসেবে পাওয়া যায়, যা বিশেষ্য হলেও বাক্যের প্রয়োজনে বিশেষণে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্যাঁসগ্যাঁস>গ্যাঁসগ্যাঁসে।

(৩) অর্থগত বিশ্লেষণ- 'কলকল','ছলছল', 'হড়হড়' এগুলি প্রকৃতি থেকে নেওয়া এবং প্রকৃতিজাত শব্দের অনুকরণে তৈরি; অন্যদিকে 'ঠকাঠক', 'শিরশির' এইসকল শব্দগুলি মানুষের নানান কর্মকাণ্ডর উপর নির্ভরশীল।

সাহিত্যে ভাষার প্রয়োগ ও তার ধ্বনিতাত্ত্বিক বা ব্যকরণ ব্যাখ্যা খুবই জনপ্রিয়, সাহিত্যের অন্যতম বিষয় ভাষা। এই গবেষণা পত্রে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার তাত্ত্বিক অবস্থান বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'শব্দতত্ত্বে' বর্ণনাসূচক একপ্রকার বিশেষ শব্দশ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন যা মূলতঃ বিশেষণ এবং ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে বাক্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এই শব্দগোষ্ঠীকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন এই শব্দগোষ্ঠীকে অর্থবদ্ধ শব্দের আওতায় না ফেলে ধ্বনির আওতায় ফেলা উচিৎ এবং ধ্বনি কেন্দ্রিক এইসকল শব্দগুলি এত সহজেই বিচিত্র বর্ণনা ব্যক্ত করতে পারে যা অর্থবহ শব্দের মাধ্যমে করা কখনই সম্ভব না।' শব্দতত্ত্বে' শব্দকে ধ্বনিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে- টকটক>টুকটুকে, এমন নিদর্শন দেওয়া হয়েছে; এখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দের নানাবিধ প্রকরণ নিয়েও আংশিক আলোচনা করা হয়েছে। এখান থেকে বলা যেতে পারে বাংলা শিশুসাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার তার বর্ণনাকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই শিশুদের কাছে অনেক বেশি সহজবোধ্য হয়েছে। অনেক সময় অনেক শব্দের অর্থ বুঝতে তারা অক্ষম হলেও ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি তাদের ধ্বনিকেন্দ্রিক গুণের কারণে বোধগম্য হয়েছে।

হান রুথ থমসনের মতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাংলা ভাষায় বর্ণ,গন্ধ এবং রং যোগ করে যা বাক্যকে আরোও প্রস্ফুটিত করে। উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর একটি গল্পে, বুদ্ধু নামক একটি চরিত্রের বাবা ক্ষেত থেকে পাখি তাড়ানোর জন্য বলছে- "এবার ইড়ি মিড়ি কিরি বাঁধন দেখিয়ে দেব"। 'ইরি মিড়ি কিরি' শব্দটির কোনোও রকম সঙ্গত মানে না থাকলেও, একথা বোঝানো যাচ্ছে বুধোর বাবা পাখিগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করছেন; যা ধ্বনিকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সহজবোধ্য হচ্ছে। এর থেকে বলা যেতে পারে, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি শিশুদের ক্ষেত্রে এক একটা 'reference point' তৈরি

করে দিচ্ছে এবং ধ্বনিকেন্দ্রিক এই শব্দগুলোর জন্য নিজেরা নিজেদের মতো একটা ‘কমপ্যাটিবেল’ অর্থ সাজিয়ে নিচ্ছে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নানা রকমের চিন্তাভাবনা আছে। ১৯৮১ সালে মুলার ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা ওনোম্যাটোপিয়াকে খুব হালকা চালে ‘playthings’ ও তাদের ‘rootless’ বলে জ্ঞাপন করলেও বাংলায় কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দের নিরুক্তি পাওয়া গিয়েছে– যা সংস্কৃত শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং তৎসম শব্দ থেকে তদ্ভব শব্দে রূপান্তরিত হয়ে ধ্বন্যাত্মক শব্দের তালিকায় স্থান পেয়েছে– যেমন, সংস্কৃত ধবল<বাংলা ধবধবে। সংস্কৃত চিক্কণ< বাংলা চিকচিক, সংস্কৃত গুঞ্জন<গুনগুন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ও.ডি.বি.এল গ্রন্থে ধ্বন্যাত্মক শব্দকে দুইভাগে ভাগ করেছেন– ১) মৌলিক ধ্বন্যাত্মক ধাতু – হাঁচা,হাঁকা,টুঁয়া, ২) ধ্বন্যাত্মক ধাতুর দ্বিতীয়করণ– কড়মড়া, টনটনা,হড়হড়া ইত্যাদি।

ভাষাতত্ত্ববিদ জেসপারসন সর্বপ্রথম ‘সাউন্ড সিম্বলিজম’ শব্দটি ব্যবহার করেন, পরবর্তীকালে ডেভিড ক্রিস্টাল বলেন- ‘sound symbolism is a direct association between the form and the of language’. ‘সাউন্ড সিম্বলিজম’ যার একটি বিস্তৃত অংশ অবস্থান করছে– ভাষা ও সাহিত্যে; তারই অনেক রকম প্রকরণের মধ্যে একটি ভাগ- ধ্বন্যাত্মক শব্দ। শব্দের উচ্চারণই যেখানে আংশিকভাবে মানে উল্লেখ করে দেয়।পৃথিবীর সকল ভাষাতেই ধ্বন্যাত্মক শব্দের উল্লেখ আছে। এমনকী অনেক ভাষাবিদ একথাও উল্লেখ করেছেন–ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোই সৃষ্টির আদি শব্দ হিসেবে পরিগণিত, যেহেতু সরাসরি অনুকরণের মাধ্যমেই শব্দগুলো তৈরি এবং শ্রোতা খুব সহজেই শব্দগুলির উল্লেখযোগ্যতা বুঝতে পারে। যেমন কিছুকিছু শব্দ সরাসরি আওয়াজকে অনুকরণ করে– ক) বৃষ্টির শব্দ– ঝমঝম, খ) ঘন্টার ধ্বনি- ঢংঢং।
প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে ‘সাউন্ড সিম্বলিজমের’ আওতায় বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাথে আরোও একপ্রকারের বিশেষ শব্দ ভীষণ রকম প্রচলিত, যাকে ‘ভাষানির্দেশক অনুকার শব্দ’ বা ‘ইডিওফোন’ বলা হয়। বিদ্যুৎ চৌধুরী ‘সাউন্ড সিম্বলিজম’ কে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন- ১)লিখিত(written form) ও ২) অলিখিত(non-written form)। লিখিত ভাগের আওতায় পড়ছে ধ্বন্যাত্মক শব্দ; যাকে পুনঃরায় ক) প্রাকৃতিক ও খ)মনুষ্য নির্মিত ধ্বন্যাত্মক শব্দে ভাগ করা যায়, অন্যদিকে অলিখিতর আওতায় আসে ইডিওফোন কিংবা ভাষানির্দেশক অনুকার শব্দ যা মানসিক ভাব কিংবা বর্ণনামূলক বক্তব্য এককথায় প্রকাশ করতে পারে।

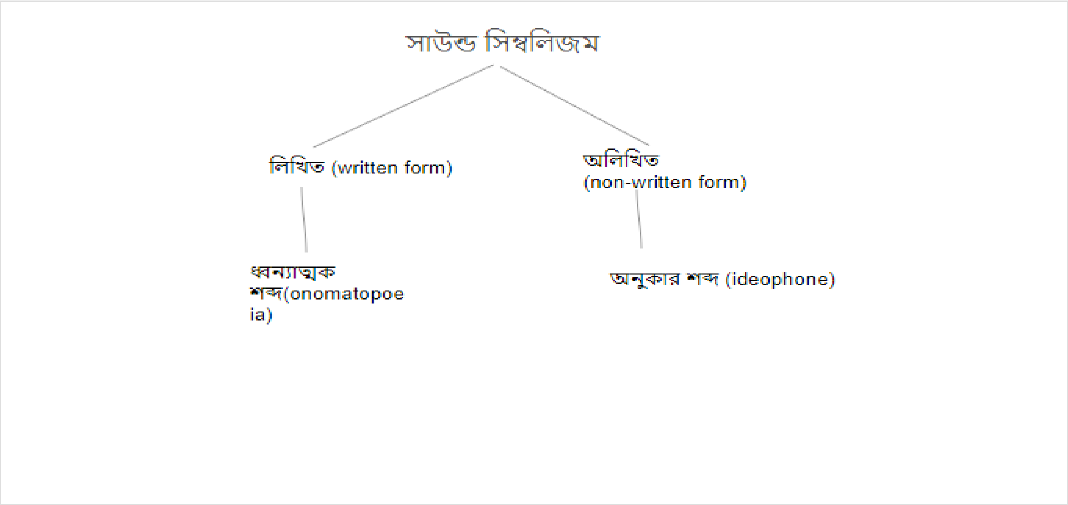

সাহিত্যে তথা শিশু সাহিত্যে এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং অনুকার শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম এবং অনেকক্ষেত্রেই এই দুইয়ের মধ্যে কিছু ধ্বনিগত সাদৃশ্যের জন্য প্রাথমিক বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। যেমন-
ঝুলোঝুলো গোঁফ এবং লকলকে চেহারার লোকটিকে দেখে পায়ে পায়ে ঠকাঠক লেগে গেল।

উপরোক্ত বাক্যে ‘ঝুলোঝুলো’ এবং ‘লকলকে’ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণ হিসেবে, এবং এরা একপ্রকার বাহ্যিক অবস্থাকে ধ্বনির সহায়তায় এমন দুটি শব্দে প্রকাশ করছে যা দৃশ্যটিকে আংশিক অনুকরণ করে চোখের সামনে একটা ‘reference’ তৈরি করছে, এদের ধ্বন্যাত্মক শব্দের মতো শুনতে মনে হলেও এরা হল ‘ভাবগত অনুকার’ শব্দ বা ‘ইডিওফোন’ কারণ এরা একটি ভাবনা বা তথাকথিত আইডিয়াকে ধ্বনিকেন্দ্রিক শব্দে আবদ্ধ করছে। অন্যদিকে ‘ঠকাঠক’ সরাসরি শব্দকে চিত্রিত করছে; এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের মধ্যে মনুষ্যনির্মিত শব্দের আওতায় স্থান পাচ্ছে; যদিও সাহিত্যে শব্দার্থিক আঙ্গিক থেকে ধ্বন্যাত্মক শব্দকে বিশ্লেষণ করলে তা নানারকম দিক থেকে ভাগ করা যেতে পারে।এরকমই কিছু গল্প ও কবিতা থেকে বাক্য নিয়ে তাতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিছু কিছু শব্দ, এই বাক্যগুলিতে ভাষার সরলরৈখিক নিয়ম মেনে অবস্থান করছে না, কিন্তু তারা বাক্যে নিজ মহিমায় ও লেখকের সূক্ষ্ম বোধ নিয়ে অবস্থান করে শিশু,কিশোর,বৃদ্ধ সকলের মধ্যেই অনাবিল আনন্দ তৈরি করছে। এই বাক্যগুলিতে এমন কিছু নির্দিষ্ট অবস্থানও বিরাজ করছে যেখানে এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ গুলিই পরপর অবস্থান করে একটা রূপকথাময় কিংবা ট্যাঁড়াব্যাঁকা ছবি তৈরি করে দিচ্ছে, যা পড়ার ক্ষেত্রেও যেমন আনন্দ প্রদান করছে মস্তিষ্কের ভিতরও একটি স্পষ্ট ছবির মতো বাক্য গেঁথে যাচ্ছে।

ঝকঝক কলসীর বকবক শোন গো। (প্যারাগ্রাফ ৫, দূরের পাল্লা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।)

‘বকবক’ শব্দটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, তার ভিতর জল ভরার কারণে যে একধরণের গাম্ভীর্যপূর্ণ আওয়াজ বের হয়, কবি শব্দটিকে কানে শোনানোর জন্য এই ধ্বন্যাত্মক শব্দটিকে কবিতায় ব্যবহার করেছেন, এর ধ্বনিগত বিন্যাস– (বকবক- CVCCVC)

মাঝে মাঝে গব গব গবাস করে বড় বড় কী সব ডুবে যাচ্ছে। (পৃষ্ঠা ২৯,প্যারাগ্রাফ ৮, চিরকালের সেরা, লীলা মজুমদার।)

‘গব’ ও ‘গবাস’ দুটো ভিন্ন ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং এদের ধ্বনিগত বিন্যাসও ভিন্ন (গব-CVC, গবাস-CVCVC)। ‘গব’ শব্দটিকে শব্দদ্বৈত হিসেবে ব্যবহার করার পরে তিনি ‘গবাস’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই তিনটি শব্দ যেমন কিছু ডুবে যাওয়ার রেফারেন্স তৈরি করছে তেমনই অন্যদিকে কবিতার লিটারেরি টেকনিক স্মরণ করলে, একথাও বলা যায়, গদ্যে লীলা মজুমদার ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে ‘alliteration’ -এর নিদর্শনও দিয়েছেন। ‘গব’ শব্দটি এখানে শব্দদ্বৈত হিসেবে উল্লেখ্য এবং এটি বাক্যে বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত অন্যদিকে ‘গবাস’ এর সঙ্গে ‘করে’ যুক্ত হওয়ায় শব্দটি ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অমনি মনে হল কলকল,ছলছল,হুড়হুড়,হড়হড় করে প্রবল জলরাশি কূল ছাপিয়ে উঠছে। (পৃষ্ঠা ২৯, প্যারাগ্রাফ ৮, চিরকালের সেরা, লীলা মজুমদার।)

উপরোক্ত বাক্যে ব্যবহৃত চারটি ধ্বন্যাত্মক শব্দেরই ধ্বনিকেন্দ্রিক গঠন- cvccvc। শব্দগুলি পরপর বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই চারটে শব্দই জলরাশির শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধিত। স্বভবতই এই চারটি শব্দ জলের আওয়াজকে বর্ণিত করছে।

সঙ্গে সঙ্গে কানে এল সড়সড়,খরখর,খুটখুট,টকটক,কটকট,গুমগুম,ধুপ,ধুপ,ধুপ--! প্রফেসর সুইচ টিপতেই সব চুপ। (পৃষ্ঠা ২৯, প্যারাগ্রাফ ৮, চিরকালের সেরা, লীলা মজুমদার।)

‘সড়সড়’, ‘খরখর’,’খুটখুট’,’টকটক’,’কটকট’,’গুমগুম’ -এর ধ্বনিগত বিন্যাস- CVCCVC এবং ‘ধুপ’ -এর ধ্বনিগত বিন্যাস- CVC। উপরোক্ত বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি যান্ত্রিক কোনও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্বন্ধিত, কারণ তারপরেই প্রফেসরের স্যুইচ টেপার একটি নিদর্শন বর্তমান। এই শব্দগুলির মাধ্যমে লেখক খুব সহজেই একটা কোলাহলের পরিবেশ তৈরি করেছেন, এবং এই বিশেষ ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির কারণে যন্ত্রকেন্দ্রিক একপ্রকার গড়বড়ের কথা আর কোনোও প্রকার বর্ণনা ছাড়াই এক বাক্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় এখানে প্রতিটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিশেষ্য হিসেবে কাজ করছে।

চোখে দেখে--আঁধারে ভরা কালো কালো ছায়ার মতো গাছপালা, বনবাদাড়। কানে শোনে--শিরশির,সরসর,খুস্খুস,খসখস। (পৃষ্ঠা ৩৭, প্যারাগ্রাফ ১০, চিরকালের সেরা, লীলা মজুমদার।)

উপরোক্ত বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির ধ্বনিগত বিশ্লেষণ করলে শব্দগুলি হবে- CVCCVC প্যাটার্নের, এবং শব্দগুলি বাক্যে বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দগুলি কোনোও জঙ্গলের পাতার আওয়াজের সাথে সম্বন্ধিত। শব্দগুলি মূলতঃ একটি জঙ্গলের দৃশ্যকে নির্দেশ করছে। এবং উপরোক্ত এই চারটে শব্দের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্ভবপর হচ্ছে।

এই প্রবন্ধে কিছু বিশেষ গল্প এবং কবিতা থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, ধ্বন্যাত্মক শব্দকে অর্থগত দিক থেকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়- ১) অনুকরণকেন্দ্রিক ধ্বন্যাত্মক শব্দ, এবং ২) ধ্বন্যাত্মক শব্দ যা মানসিক অবস্থান, ভাবনা এইগুলোর সঙ্গে সম্বন্ধিত। এইগুলোকে পুনরায়, ক) প্রাকৃতিক, খ) মনুষ্যনির্মিত, গ) বস্তুকেন্দ্রিক, ঙ)রকমারি-এই চারভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। নীচে কিছু বাক্য ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের নিদর্শন যোগ করা হল।

গিন্নিও ফিসফিস করে যেন বললেন, (পৃঃ ৫, প্যারা ৪, চিরকালের সেরা, লীলা মজুমদার।) = ‘ফিসফিস’ শব্দটি মনুষ্যনির্মিত এবং মানুষের কথা বলার ধরণের সঙ্গে সম্বন্ধিত।

গমগম করে গলার স্বর। (পৃঃ ৮, প্যারা, ৭, চিরকালের সেরা, লীলা মজুমদার।)= ‘গমগম’ শব্দটি মনুষ্যনির্মিত এবং তা কথা বলার সাথে সম্বন্ধিত।

চুলের গোড়াগুলো শিরশির করতে লাগল। (পৃঃ ১৩, প্যারা, ৮, চিরকালের সেরা, লীলা মজুমদার।)= ‘শিরশির’ শব্দটি মনুষ্যকেন্দ্রিক এবং শব্দটি মানুষের অনুভূতির সাথে সম্বন্ধিত।

খালি হাঁ করে আর চী-চী করে। (পৃঃ ১১, প্যারা,১ , চিরকালের সেরা, লীলা মজুমদার।)= ‘চী চী’ শব্দটি স্পষ্টতই পাখির আওয়াজের সাথে সম্বন্ধিত অর্থাৎ একটি প্রকৃতিগত শব্দ।

পরবর্তী দুটি উদাহরণে এমন শব্দ আছে (‘ক্যাঁওক্যাঁও’ , ‘চ্যাঁ চ্যাঁ’) যা মানুষ কিংবা পশু পাখির কোনোও বর্ণনা, দুইয়ের সাথেই সহাবস্থানে থেকে বর্ণনাকেন্দ্রিক দুটো পূর্ণাঙ্গ শব্দ হতে পারে।

তারা আমাদের দেখে মহা ক্যাঁওক্যাঁও লাগাল। (পৃঃ ২৮, প্যারা ৫ , চিরকালের সেরা, লীলা মজুমদার।)
মাঝখানে কান-ফাটানো চ্যাঁ চ্যাঁ। (পৃঃ ২৯, প্যারা ৭ , চিরকালের সেরা, লীলা মজুমদার।)

পরবর্তী উদাহরণগুলিতে সুকুমার রায়ের কবিতা থেকে কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ নেওয়া হয়েছে যা রকমারির তালিকাভুক্ত এবং বাক্যে এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি একপ্রকার 'unconventional image' তৈরি করছে। এই শব্দকেন্দ্রিক অনুভূতি গুলি চিরতরেই নবীন এবং এর দীর্ঘস্থায়ীতা নির্ভর করছে এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির উপর, যার প্রভাব শিশু,কিশোর ও প্রবীণদের মধ্যে ধ্রুব।
শাঁই শাঁই পনপন ভয়ে কান বন্ধ। (পৃঃ ১১, প্যারাগ্রাফ ১, শব্দ কল্প দ্রুম, সুকুমার সমগ্র, সুকুমার রায়।)
ঠুংঠাং ঢং ঢং, কত ব্যথা বাজে রে–(পৃঃ ১১, প্যারাগ্রাফ ১, শব্দ কল্প দ্রুম, সুকুমার সমগ্র, সুকুমার রায়।)
ঝন ঝন করতাল ঠন ঠন কাঁসি।(পৃঃ ১৬, প্যারাগ্রাফ ১, লড়াই ক্ষ্যাপা, সুকুমার সমগ্র, সুকুমার রায়।)

গঠনগত দিক থেকে এই শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ধ্বন্যাত্মক শব্দ মূলতঃ দ্বৈত আকারে পাশাপাশি অবস্থান করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মূল শব্দের পরবর্তী শব্দকে কখনও সম্পূর্ণভাবে নকল করে (ক্যাঁওক্যাঁও, শিরশির, গমগম) এবং কখনও তা আংশিকভাবে নকল করে (ক্যাঁওম্যাঁও,ঠকাঠক, ঠুংঠাং) ; এবং কোনোও ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দ কোনোও রকম repetetion ছাড়াই স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে ধ্বনিগত এলিমেন্ট নিয়ে গঠিত হয় (গবাস,ফুড়ুক) ।
পূর্বোক্ত কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দকে রূপগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা বাক্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ কিংবা ক্রিয়া হিসেবে অবস্থান করতে সক্ষম। বাংলায় মূল শব্দের সঙ্গে 'এ' যুক্ত করলে সেই শব্দটিকে বিশেষণ হিসেবে পাওয়া যায়- গ্যাঁসগ্যাঁস<গ্যাঁসগ্যাঁসে (ওলটানো টবে চড়ে গ্যাঁসগ্যাঁসে গলায় বক্তৃতা দিচ্ছে), ভনভন<ভনভনিয়ে (উড়ছে কতক ভন্ ভনিয়ে) , হনহন<হনহনিয়ে (আসছে কারা হন্ হনিয়ে?) আবার বাংলা শব্দ 'করে' সংযোগের মাধ্যমে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্রিয়া বিশেষণের রূপ মেলে- যেমন, 'ফুড়ুক করে'(সে ফুড়ুক করে উড়ে পালাল), 'হো হো করে' (রাজামশাই হো হো করে হাসলেন।) তাছাড়া ক্রিয়ার উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে- 'টলমল করছে', 'প্যাচপ্যাচ করছে'।

উপরোক্ত বাক্যগুলি থেকে পাওয়া কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে গঠনগত দিক থেকে ভাঙলে কয়েকটি প্রকরণ পাওয়া যেতে পারে।
১) শিরশির, চুকচুক,গমগম,টুপ্টুপ,বকবক – $C^1VC^2 + C^1VC^2$
২) ঠুকঠাক– $C^1VC^2+C^1VC^2$
৩) ঠকাঠক– $C^1V^1C^2+V^2+C^1V^1C^2$
৪) চ্যাঁ চ্যাঁ– $CV+CV$
রোজনামচা এবং সাহিত্যে প্রথম প্রকরণের ধ্বন্যাত্মক শব্দেরই উদাহরণ বেশি পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের শব্দ ভাণ্ডারে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এর রূপগত, ধ্বনিগত ও শব্দার্থিকগত বৈশিষ্ট্যগুলি এদের অন্য শব্দের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। সাহিত্যে বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দ একটি 'magic element' -এর মতো কাজ করে। এর কারণে শব্দকেন্দ্রিক ব্যাখ্যগুলি যে কোনোও পাঠকের মননে স্পষ্টভাবে চিত্রায়িত হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যকরণগত অবস্থান নিয়ে অনেকেই অনেক বক্তব্য রেখেছেন- অনেক ভাষাবিদ একে অব্যয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ একই সাথে রূপ বদলে ক্রিয়া কিংবা ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে অবস্থান করতে পারে– যেমন 'চকচক' শব্দটির সঙ্গে 'এ' যোগ করলে তা ক্রিয়া বিশেষণ হতে পারে অন্যদিকে 'চকচক করা'

বললে তা বাক্যে ক্রিয়া হিসেবে অবস্থান করতে সক্ষম। এই শব্দগুলি ব্যকরণগত দিক থেকে বিশেষণ, ক্রিয়া কিংবা ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে অবস্থান করলেও কখনওই অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী

Tagore, R. (1909). *Bangla Shabdatattva (Bengali philology)*. Kolkata: Viswabharati Prakashani.

Dakshi A.; *Onomatopoeia in Bengali in comparison with Oriya and Hindi*.

Majumder, L. (1997). *Chirakaler Shera*, Sishu Sahitya Sangsad.

Ray, S. (2001). *Sukumar Samagra*. Annapurna Prakashani. Chaturtha Prakash.

Chaudhuri, B. B. *Sound Symbolism in Bangla Language: Onomatopoeia and Ideophone*.

Dakshi, A. (2001). *Bangla dhvanvatmak shabda (Bengali onomatopoeic words)*. Kolkata: Subarnarekha.

Racova, A. (2014). *Ideophones in Bengali*.

Thompson, H.R. (2012). *Bengali*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL
Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

শব্দ ও সংকেত [দ্য ওয়র্ডস্ অ্যান্ড দ্য সাইনস্]

শিবাংশু মুখোপাধ্যায়
সোসাইটি ফর ন্যাচরাল ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনোলজি রিসার্চ

ARTICLE INFO
Article history:
Received 12/06/2023
Accepted 09/05/2024
Keywords:
সংকেত,
সংকেতক,
সংকেতিত,
প্রতীক,
প্রতিমা
Guest Editors
Agniv Dutta
Ratul Ghosh
Patitpaban Pal
Organised by: শব্দ /ʃɔbd̪o/

ABSTRACT
সমাজ-সংস্কৃতির সাপেক্ষে সংকেতেরও (সাইন) ইতিহাস থাকে। মানুষ বিশ্ববীক্ষায় পৌঁছয় সংকেতের ইতিহাসের অধ্যায়গুলো পেরোতে পরোতে। কিন্তু যখনই সে তার বিভাবকে (পারসেপশন) তার অভিপ্রেত (এক্সপ্রেশন) অবধি নিয়ে যায় - তখন তাকে ভাষার সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয় – আর সেখানেই সে সামগ্রিক একক; শব্দ, বাক্য, ইত্যাদিকে চিন্তাশীল বিভাবের ফল হিসেবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। আমরা এই আলোচনায় "শব্দ" এবং "শব্দবন্ধ" বেছে নিচ্ছি – কাজটা যাতে সহজ হয় তার জন্য। শব্দ/শব্দবন্ধ আর সংকেত-শরীর এক জিনিস নয়। সুতরাং শব্দকে, আধেয় (মিনিং) ও ধারণার (কনসেপ্ট) একমাত্র কক্ষ হিসেবে ধরে নিয়ে "ভাষার ভিত্তিতে মানব মন"-এর চর্চা কখনো কখনো সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য। শব্দ বা তৎসম এককও আসলে আধেয়-ধারণার যুগলবন্দীর এক "আপেক্ষিক" ফসল। ইংরিজিতে একটা খেলা আছে স্ক্র্যামবেলড ওয়ার্ড। সেখানে শব্দের ভেতরকার অক্ষরগুলোকে এদিক ওদিক করে খেলুড়েকে সাজাতে বলা হয়। যেমন; দেওয়া হল, N A G O M, আপনাকে বলতে হবে MANGO। কারুর যদি মনে হয় ONGAM (মার্কিন পদবী), তিনি ও-খেলায় ভুল প্রমাণিত হবেন। কেননা মানুষ ধারণার বিশ্বে বিভাবিত হন সংকেতের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে। আপনাকে আস্ত একটা স্তবক পড়তে দেওয়া হল, তাতে অজস্র বানান ভুল, অথবা মেজর টাইপোগ্রাফিক ভুল হয়ে রয়েছে। আমি অবলীলায় বলে দিতে পারি, আপনি অবলীলায় ওই স্তবক পড়ে ফেলবেন। ফেলেনও। আপনার ওই স্তবকের মানে বুঝতে সংশোধিত কপি লাগে - না কারণ আমরা বলবার চেষ্টা করছি যে শব্দ আসলে আধেয়-ধারণার যুগলবন্দীর এক "আপেক্ষিক" ফল। এই আলোচনায় এডোয়ার্ড স্যাপিরকে আরেকবার ডেকে নেব ঠিকই তবে ব্যবহার করব, প্রতীক নিয়ে তোদোরভের (১৯৮২) ভাষ্য। আরেকটা অন্য দৃষ্টান্ত দিয়ে সারসংক্ষেপটি শেষ করি। ধরা যাক, আমাদের বলা হল মানবমনের (আপাতত বাঙালির সংস্কৃতির সাপেক্ষে কথা বলছি) "বিশেষ" অভিপ্রেত নিষ্কর্মার সন্ধানে ভাষার কোনো শব্দজাতীয় একক খুঁজে বের করতে। "মাকাল (ফল)" সেই জাতীয় একক বা মানবমনের সমসমান বিভাবের কাছাকাছি এক কক্ষ। কিন্তু সেই কক্ষে কোনো জানলা নেই। এদিকে চিন্তা বদ্ধ নয়। সংকেতও বদ্ধ নয়। তারা দুজনে মিলে যতই চেষ্টা করুক না কেন। বক্তা "মাকাল" শব্দের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ছাড়া কিছুই জানে না। মাকাল সত্যিকারের ফল। তার সঙ্গে নিষ্কর্মার সংযোগের "কার্য-কারণ" না জেনে, কেবল মিমিক্রি করে, সরাসরি নিষ্কর্মা না-বলে "মাকাল" বললে - বক্তা হয়ে পড়ে ইতিহাসহীন এক অস্তিত্ব। শব্দ নয় সংকেতই পারে তাকে উদ্ধার করতে।

email id:sibansu.nltr@wb.gov.in

শব্দ ও সংকেত

মনে রাখতে হবে সংকেত স্যোসুরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সংকেতিত ওরফে সিগনিফায়েড আর সংকেতক ওরফে সিগনিফায়ারের যোগফল, যেখানে সংকেতককে বলা হয়েছে ধ্বনিছবি (সাউন্ড-ইমেজ) অর্থাৎ সামগ্রিক হিসেবে পদ। যার অনেকাংশেই সমগোত্রীয় জিনিসের লোকপ্রিয় নাম শব্দ। এই বক্তব্যের শিরোনামের দিকে তাকালে শব্দকে সংকেতের অর্ধাঙ্গ বলা যায়। পরিস্থিতির চাপে, সংকেত দরকার মত তার আকার বেছে নেয়। কখনো শব্দ, কখনো ছবি, কখনো মুদ্রা, এরকম আরও কত কী? এইসব আকারগুলোর মধ্যে মনে হয়, শব্দ সংকেতের সবচেয়ে বিমূর্ত আকার। শব্দ প্রতীক হয়ে ওঠার পরেই জগতের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে, মানুষের বোধের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখন সেটা সত্যকে স্পর্শ করে।অথচ, আমাদের কেমন একটা ধারণা আছে, ধারণাটা প্রায়-বিশ্বজনীন, যে শব্দই সত্য। ধারণাটা থাক বা না-থাক, উপপাদ্য প্রমাণ করার সময় যে আপ্তবাক্য লাগে। এক্ষত্রে আপ্তবাক্য ধরে নেওয়া যেতে পারে এইভাবে যে: শব্দই সত্য। এবার আমাদের যাত্রা এই আপ্তবাক্যকে মিথ্যা প্রমাণ করবার হেতু। অর্থাৎ, শব্দ যতক্ষণ না প্রতীক (সিম্বল) কিংবা প্রতিমা (আইকন) হয়ে উঠছে – ততক্ষণ সে সত্য হয়ে উঠতে পারে না।

চিন্তার বাহন

ভাষাকে মানুষ করে তুলেছে তার চিন্তার বাহন। অথচ সেখানেও তাকে কমপ্রোমাইজ করতে হয়। ভাষায় যা নেই - কাঁধ ঝাঁকিয়ে, সুর খেলিয়ে, হাত পা নাড়িয়ে, সেসব বোঝাতে হয়। যে শ্রোতা ওইসব কায়দায় অনভ্যস্ত তার কাছে পৌঁছানো ভারি শক্ত। আপনারা বলতেই পারেন যে, হাত-পা নাড়ানোটাও কি ভাষা নয়। আমরা ভাষা বলতে কেবল কথা বুঝি কেন? সবকিছুকেই কি একই রকম হতে হবে? ওই যে কাঁধ ঝাঁকানোর কথা বললাম, ওটাও কি ভাষার জিনিসই নয়? আজকাল কাঁধ ঝাঁকানোর অভ্যেসটা বেড়েছে ঠিকই, বাঙালিদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি জরুরি মাথা হেলিয়ে ও হাত নাড়িয়ে কথা বলা। অঙ্গুলিনির্দেশও চলতে পারে। কথার যেমন ভরসা কান, লেখার বা অঙ্গভঙ্গির ভরসা তেমনই চোখ। দু ক্ষেত্রেই যদিও মস্তিষ্ক প্রধান। সত্যের সাগরে সাঁতরে চলতে না পারলে মাথার মুশকিল হয়। সাঁতার মানুষকে শিখতে হয়, অনেক প্রানীকেই শিখতে হয় না বা না-শিখলেও চলে। সত্যের সাগরই আসলে সংকেত বিশ্ব – যেখানে সংকেতের একপ্রকার আকার হিসেবে শব্দের সত্যকে স্পর্শ করবার উপায় বাতলানো থাকে।

লতমানের (২০০৫) সংকেতবলয়ের ধারণায় প্রত্যেক সংস্কৃতি নিজেকে এক বিশেষ স্থান-কালের প্রেক্ষিতে গড়ে তোলে। সংস্কৃতি সংকেতবলয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যেখানে প্রতিটা স্বতন্ত্র সংকেত কোনো-না-কোনোভাবে এক সুতোয় বাঁধা। যেমন, ব্যক্তিমানুষ একক অস্তিত্ব হলেও সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে সেইসব একক ব্যক্তিমানুষ পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ।

দৃষ্টান্ত এক

মানুষ নিয়মিত কথা বলবার সময় এমনভাবে কথা বলে না যেখানে সবক্ষেত্রে মসৃণ নির্ভেজাল নিটোল বাক্য আপনি খুঁজে পেতে পারেন। খাপছাড়া কথা, বলতে বলতে অন্য কথায় চলে যাওয়া - এসব হামেশাই ঘটে। সে সব জিনিসকে হয়ত ব্যাকরণ অগ্রাহ্য করে। কিন্তু ওইটেই হচ্ছে ভাষার আসল কাণ্ডকারখানার জায়গা। সংকেত যেখানে ভাষায় বাসা বাঁধে – ওই আটপৌরে ভাষা হচ্ছে সেই বাসা বাঁধবার জায়গা। কথা বলবার ভাষায় মানুষ যে নানান কাণ্ড করে - যা লেখার ভাষায় সচরাচর জায়গা পায় না। বা পেলেও সেগুলোকে সাধারণত মুখের ভাষা হিসেবেই ধরা হয়। এই রকমই এক নমুনা মেলে যখন আমরা বাংলা ভাষায় অনুকার শব্দ উচ্চারিত হতে দেখি। যেমন, “সঙ্গে বই-টই কিছু এনেছো? না

ফাঁকা হাতে এসছো!” বাক্যে “বই-টই”, আর, “আমি ওসব অজুহাত-টজুহাত কিছু শুনব না”-য় “অজুহাত-টজুহাত”। খেয়াল করলেই দেখা যাবে বই-টই-য়ের /টই/ আর অজুহাত-টজুহাতের /টজুহাত/ শব্দের মানেহীন কলেবর বৃদ্ধি। অর্থাৎ শব্দ যেখানে আভিধানিক সেখা এই ফাঁকা অংশগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। অথচ যে পরিস্থিতিতে কথা হচ্ছে সেখানে তো এর গুরুত্ব সাংঘাতিক।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ধরনের নির্মাণ কেন হয় মানুষের রোজকার ভাষায়। এর একটা উত্তর হয় যে, মানুষের আটপৌরে কথাতেও যে ছন্দের গঠন বিশেষভাবে জরুরি সেই কথাই মনে করিয়ে দেয় অনুকৃতিগুলো। একথা এখন প্রমাণিত যে ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশেও মানুষের একধরনের ছন্দবদ্ধতা পালন করার অভ্যেস থাকে।
এখন বুঝতে হবে কোনো-না-কোনো প্রয়োজন থাকতেই হবে এই অভ্যেসের পেছনে। সেটা এক্ষেত্রে মূলত সংকেতনের। আটপৌরে কথায় যাকে অনুকার অথবা বিকার বলা হয়েছে – সেটা এক নিছক সংকেত বলয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, কোনো শব্দকে নিয়ে বক্তার লঘুকৃতী শ্রোতার মনকে মূল প্রতীকী শব্দের প্রতি সচেতন করে তোলে। এখন আপনার মনকে বোঝানোর সময়। যদিও আমরা শব্দকে দেখতে অথবা শুনতে পাই প্রতীক হিসেবেই – তার মানে কি এই যে - সকল শব্দকেই প্রতীক হতে হবে? ধরা যাক, জীবনানন্দের অতি-পরিচিত কবিতা ‘বোধ’ (ধূসর পাণ্ডুলিপি)-এর কথা:

তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর; কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর? শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর?

এখানে প্রত্যেকটা ব্যাকরণ-অনুমোদিত বাক্যের শেষে একটা করে “আর” বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই আর, বাংলা ভাষায় একধরনের কণিকাও বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সন্দর্ভের “প্রয়োজন”-টাকে না ধরতে পারলে অথবা ওই কবিতায় ওই “আর” শব্দের প্রতীকী ব্যবহারটাকে না-ধরতে পারলে, কেবল শব্দ হিসেবে আর-কে বোঝা মুশকিল।
‘আর’ নিয়ে বোধ করি সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন জ্ঞানেনন্দ্রমোহন। চারটে এন্ট্রি রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম ‘আর’-কে বলা হয়েছে ‘গমন করা’ বিশেষ্য পদ। তিনে বলা হয়েছে, ‘আর’ হচ্ছে বাংলা প্রাকৃত ক্রিয়া বিভক্তি, যেমন, খা+আর = খাওয়ার। চার নম্বরে বলা হয়েছে, ‘অস্ত্যর্থক, বিশিষ্টার্থক বা কুশলার্থক তদ্ধিত প্রত্যয়”। কিন্তু দুই নম্বর এন্ট্রি বিশাল। সেখানে ছত্রিশ রকমের ‘আর’-এর কথা বলা হয়েছে। সেগুলোর একটা তালিকা নির্ঘন্ট করে পেশ করেছি আলাপের শেষে যাতে – এই বক্তব্য লেখা হয়ে উঠলে পাঠক ঘ্যানঘ্যানে পাঠ থেকে মুক্তি লাভ করে - ব্যাখ্যাগুলোয় চোখ বুলিয়ে কাজ সেরে নিতে পারেন।
উচ্চারণের দিক দিয়ে একটা শব্দ তো কেবল এক বা একাধিক দলের সমাবেশ। কিন্তু শ্রবণে গিয়ে জমা হয় সামগ্রিক আকার। আপনারা বলবেন, এ তো ব্যক্তিনির্ভর প্রসঙ্গ। যেমন, আলাপ আপনাকে কণ্ঠসঙ্গীতের আলাপ বোঝাবে না পরিচয়বাচক শব্দ বোঝাবে সেটা নির্ভর করবে আপনার ওপর। বড়োজোর আপনি সেই মুহূর্তে যে প্রসঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন তার ওপর। কিন্তু লতমানের হিসেব, আপনি ও ওই প্রসঙ্গ সমস্তই আসলে এমন এক পরিসরের ঘটনা – যে পরিসর অনেকটাই পূর্ব-নির্ধারিত। অনিশ্চয়তা কিংবা আপেক্ষিকতাও আসে কোনো পূর্বতন ঘটনা বা ওই পরিসরের বিবর্তনের হাত ধরে।

দৃষ্টান্ত দুই

আরও সহজ দৃষ্টান্ত খুঁজে নেওয়া যায় রঙ ও চেনা রঙগুলোকে যে নামে ডাকি সেগুলোর দিকে অথবা সেগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে যেসমস্ত জিনিস প্রতীক বা প্রতিমাতুল্য হয়ে যায় – সেইসব নজিরগুলোকে টেনে নিয়ে এলে। যেমন ধরা যাক; বিশেষ্য – বিশেষণ, সবুজ এবং বিশেষণ সবজে। সবুজ হচ্ছে: রঙের নাম; বিশেষণে সবুজ প্রকৃতি, সবুজ মাঠ, সবুজ পাহাড়, সবুজ(-মেরুন) জার্সি, সবুজ সিগনাল, "ওরে আমার সবুজ" (সবুজ = অবুঝ), (হাল্কা) সবুজ (সিদ্ধির) সরবত, ইত্যাদি; প্রতীকে সবুজ তারুণ্য, যৌবন, উদ্দম, তাজা, এসবের প্রতীক। সবুজের নির্গতরূপ বিশেষণে সবজে(-টে) শুধুমাত্র বিভাব। সবজে শাড়ি, সবজে চিঠি, সবজে পাহাড়।

জিনিসটা সহজ হয়ে যায় দৃষ্টান্ত সামনে রাখলে। সবুজ আর সবজে দুটোই বিশেষণ – এবং সবজে, সবুজ থেকে নির্গত রূপ। অথচ, সবুজ আর সবজে – দুটো সম্পূর্ণ পৃথক সাংকেতিক সন্দর্ভ তৈরি করে। অথবা য়্যুরি লতমানের মতো পূর্বসূরীর কাছে ঋণ স্বীকার করে বলতেই হয় – ইহা (সবুজ – সবজে(-টে)) এক ধরনের সংকেতের বিবর্তনের ক্ষেত্র। সেটা ভিন্ন সংস্কৃতিতে আলাদাও বটে। "গ্রিনারি" শব্দটার বাংলার খুঁজলে অভিধানে পাওয়া যায় "শ্যামলিমা।" এখান থেকে যে-কেউ হাঁটতে থাকুন – শ্যামল, শ্যামলী, শ্যামলা, ইত্যাদি – এর কোনোটাই সবুজ কিছু বোঝায় না। ওদিকে, ইংরিজিতে, "গ্রিনারি"-র সংজ্ঞায় "গ্রিন ফলিয়েজ", "গ্রোইং প্লান্ট" অথবা "ভেজিটেশন" ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। "শ্যামলিমা" আর "গ্রিন ফলিয়েজ"- এর ফারাক আকাশ-পাতাল।

সুতরাং শব্দ বনাম সংকেতের এই খেলায়, একটা শব্দকে ঘিরে সংকেতের প্রতীক হয়ে ওঠার আভাস পাওয়া গেল। একটা বিশেষণ পদও নিজেই কেমন সংকেতের প্রয়োজন ছাপিয়ে প্রতীক হয়ে উঠল ওই সবুজের বেলায়। তাই তো আমরা বলি সবুজ তারুণ্যের প্রতীক। লাল, হলুদ, সাদা, কালো, ইত্যাদির বেলাতেও তাই।

এবার রঙ ছেড়ে অন্যকিছুতে নজর দিই। দেখা আর নজর যে আলাদা – সেকথা আশা করি বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি সি/লুক কিংবা গেজের কথা বলছি না। বাংলাতেই বলছি দেখা আর নজর। আমি কাউকে কুনজরে দেখতে পারি। কিংবা কারুর উন্নতিতে, সুখের সংসারে নজর দিতে পারি। অথবা বাচ্চার নজর লেগে যাবে বলে কালো রঙের দাগ লাগিয়ে তার সৌন্দর্য্যকে কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন, মা ঠাকুমারা। এই সব ক্ষেত্রে বোঝা যায় দেখার চাইতে নজর অনেক বেশি ঐতিহাসিক ওজনদার জিনিস, যার সঙ্গে নানারকম বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পরত জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকে। আবার, উর্দু "নজর-আন্দাজ" কথাটার মানে উপেক্ষা। কেবল উপেক্ষা বললে একটু মুশকিল। এই শব্দের প্রতীক হয়ে ওঠার গল্প ২০২২-এ ওই একই নামের মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাটা দেখলে আরও পরিষ্কার হবে।

শব্দ আসলে ভীষণ মামুলি জিনিস। বিশেষ করে, যতক্ষণ-না সে সংকেতের কারসাজিতে অংশগ্রহণ করছে। ওদিকে শব্দের ভাষাবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা – তাতে তাকে বলা হয়েছে, স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ পদানুর ক্ষেত্রেও যতটুকু পরস্বৈপদী ভাব – ততটুকুও শব্দের বেলায় থাকে না। সে নিজে নিজের আধেয়বৃত্তে একলাই আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কিন্তু আদপে দেখা যায় যে সেই আত্মপ্রকাশ আসলে একরকম বিমূর্ত সামগ্রিক ব্যাপার। বিমূর্ত থেকে মূর্তি হয়ে উঠতে গেলে – শব্দকে নিয়ে যে-খেলা সংকেতন প্রক্রিয়ায় চলে সেই খেলায় শব্দের বাহক বক্তাকে অংশগ্রহণ করতে হয়। এই জায়গায় কথা বলেন জভেন তোদোরভ (১৯৮২)।

তোদোরভের (১৯৮২) বক্তব্যকে কখনো ইতিহাসের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কারণ তিনি সংকেত বা প্রতীকের ব্যাখ্যা দেবার চাইতেও জরুরি মনে করতেন কালের গতির মধ্যে সংকেতের বিচিত্র চেহারার ছবিকে এঁকে বোঝানো। ধরা যে সবুজের কথা হচ্ছিল, সে-যে কোনো কালে ঔদ্ধত্বের প্রতীক ছিল – সে কথা মনে করিয়ে না দিলে সবুজের আজকের সংকেতন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ভাষ্য তৈরি করা সম্ভব নয়। সেই কারণে তোদোরভের কাছে সংকেততত্ত্বের (সেমিওটিক্স) সমগোত্রীয় শব্দ প্রতীকতত্ত্ব (সিম্বলিক্স)।

সিদ্ধান্ত

মানুষের চিন্তা তার বেঁচে থাকার অবিচ্ছেদ্য এক পরিসর। বেঁচে থাকা সমান সমান বিশ্ববীক্ষা। বিশ্ববীক্ষার প্রতিটা পরতে সংকেতের থাকবন্দী অবস্থান। সমাজ-সংস্কৃতির সাপেক্ষে সংকেতেরও (সাইন) ইতিহাস থাকে। মানুষ বিশ্ববীক্ষায় পৌঁছয় সংকেতের ইতিহাসের অধ্যায়গুলো পেরোতে পরোতে।

কিন্তু যখনই সে তার বিভাবকে (পারসেপশন) তার অভিপ্রেত (এক্সপ্রেশন) অবধি নিয়ে যায় – তখন তাকে ভাষার সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয় – আর সেখানেই সে সামগ্রিক একক; শব্দ, বাক্য, ইত্যাদিকে চিন্তাশীল বিভাবের ফল হিসেবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। আমরা এই আলোচনায় "শব্দ" এবং "শব্দবন্ধ" বেছে নিচ্ছি – কাজটা যাতে সহজ হয় তার জন্য। শব্দ/শব্দবন্ধ আর সংকেত-শরীর এক জিনিস নয়। সুতরাং শব্দকে, আধেয় (মিনিং) ও ধারণার (কনসেপ্ট) একমাত্র কক্ষ হিসেবে ধরে নিয়ে "ভাষার ভিত্তিতে মানব মন"-এর চর্চা কখনো কখনো সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য। শব্দ বা তৎসম এককও আসলে আধেয়-ধারণার যুগলবন্দীর এক "আপেক্ষিক" ফসল। ইংরিজিতে একটা খেলা আছে স্ক্র্যামবেলড ওয়ার্ড। সেখানে শব্দের ভেতরকার অক্ষরগুলোকে এদিক ওদিক করে খেলুড়েকে সাজাতে বলা হয়। যেমন; দেওয়া হল, N A G O M, আপনাকে বলতে হবে MANGO। কারুর যদি মনে হয় ONGAM (মার্কিন পদবী), তিনি ও-খেলায় ভুল প্রমাণিত হবেন। কেননা মানুষ ধারণার বিশ্বে বিভাবিত হন সংকেতের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে। আপনাকে আস্ত একটা স্তবক পড়তে দেওয়া হল, তাতে অজস্র বানান ভুল, অথবা মেজর টাইপোগ্রাফিক ভুল হয়ে রয়েছে। আমি অবলীলায় বলে দিতে পারি, আপনি অবলীলায় ওই স্তবক পড়ে ফেলবেন। ফেলেনও। আপনার ওই স্তবকের মানে বুঝতে সংশোধিত কপি লাগে না – কারণ আমরা বলবার চেষ্টা করছি যে শব্দ আসলে আধেয়-ধারণার যুগলবন্দীর এক "আপেক্ষিক" ফল। এই আলোচনায় মুদ্দা হিসেবে ব্যবহার করেছি, প্রতীক নিয়ে তোদোরভের (১৯৮২) ভাষ্য।

আরেকটা অন্য দৃষ্টান্ত দিয়ে সারসংক্ষেপটি শেষ করি। ধরা যাক, আমাদের বলা হল মানবমনের (আপাতত বাঙালির সংস্কৃতির সাপেক্ষে কথা বলছি) "বিশেষ" অভিপ্রেত নিষ্কর্মার সন্ধানে ভাষার কোনো শব্দজাতীয় একক খুঁজে বের করতে। "মাকাল (ফল)" সেই জাতীয় একক বা মানবমনের সমসমান বিভাবের কাছাকাছি এক কক্ষ। কিন্তু সেই কক্ষে কোনো জানলা নেই। এদিকে চিন্তা বদ্ধ নয়। সংকেতও বদ্ধ নয়। তারা দুজনে মিলে যতই চেষ্টা করুক না কেন। বক্তা "মাকাল" শব্দের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ছাড়া কিছুই জানে না। মাকাল সত্যিকারের ফল। তার সঙ্গে নিষ্কর্মার সংযোগের "কার্য-কারণ" না জেনে, কেবল মিমিক্রি করে, সরাসরি নিষ্কর্মা না-বলে "মাকাল" বললে – বক্তা হয়ে পড়ে ইতিহাসহীন এক অস্তিত্ব। শব্দ নয় সংকেতই পারে তাকে উদ্ধার করতে।

রেফারেন্স

তোদোরভ, জভেন (Todorov, Tzvevan). ১৯৮২. *সিম্বলিজম এবং ইন্টারপ্রিটেশন*. নিউ ইয়র্ক: কর্ণেল ইউনিভার্সিটি প্রেস.

লতমান, য়্যুরি (Lotman, Juri). ২০০৫. *অন সেমিওস্ফিয়ার. সাইন সিস্টেম স্টাডিজ* ৩৩ (১): ২০৫ – ২২৬.

পরিশিষ্ট

"আর"-এর দুই নম্বর ব্যাখ্যার শুরুতেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন দেখিয়েছেন, আর সংস্কৃত 'অপর' শব্দ থেকে এসেছে। অন্যান্য ব্যবহারগুলো তালিকা করে দেওয়া হল, যেখানে প্রতি ক্ষেত্রে শব্দের প্রতীক হয়ে ওঠবার দৃষ্টান্ত রয়েছে:

১. অপর (বাংলা আবারের মতো) ইংরিজিতে বলা হয়েছে কপ্যুলেটিভ কনজাংশন। তুমি আর আমি, কুনাল ঋষভের বাবা আর মিনতি ঋষভের মা
২. অধিক কি আর বলিব নাথ
৩. 'যে পর্য্যন্ত যতক্ষণ বা যতদূর হইয়াছে তার পর বা অধিক' 'আর কেঁদো না'
৪. 'অপর; অন্যজন' 'আর জন কয় এই মহাশয়।'
৫. 'অন্য কিছু; অন্য বিষয় বা বস্তু' 'আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙা' - কমলাকান্ত
৬. অতঃপর 'আমার আর বলিবার কথা নাই'
৭. 'নিষেধবাচক; অসময়; অযুক্তি; অনৌচিত্য ইত্যাদি বোধক' 'আর আমার কাজ কি বিয়ের সাজ পরিয়ে বৃদ্ধকালে'
৮. 'পরে; আখেরে; ভবিষ্যতে; জন্মান্তরে' 'মিছে কান্নায় কি ফল আর...'
৯. এখনও "বিশ্বরাজ হে আমায় কেন ডাক সখা বলে আর"
১০. 'এখন; বর্ত্তমান "আর কি মোদের সে দিন আছে।"
১১. 'ইহা ব্যতীত; অন্য; এক ভিন্ন" "যত দুঃখ লাজ দারিদ্র সঙ্কট, আর জানাইব কারে"
১২. অধিকন্তু; তা ছাড়া - ইংরিজি বিসাইডস বা মোরওভারের সমতুল। "অনাথা বালিকার উপর তোমার এত আক্রোশ! আর তুমি কি একটু বোঝ না, কনককে তুমি এ বাড়ীতে রাখ নাই।"
১৩. ডিসজাংক্টিভ কনজাংশন অথবা; কিম্বা ইংরিজি হোয়েদার বা অর-এর সমতুল - "আমার উপর রাগ কর, আর আমাকে কেটে ফেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়েই দাও।"
১৪. এককালে; যুগপৎ "আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আর তোমার যম।"
১৫. দ্বিতীয়টী বা অন্য একটী "এমন পরমা সুন্দরী, রূপবতী গুণবতী মেয়ে আর পাওয়া যাবে না।"
১৬. 'সুতরাং; যে রকম অবস্থা তাতে' "বড় অসহ্য ব্যাপার হ'য়ে উঠল। আমার আর এ বাড়ী থাকা কোন ক্রমে পোষালো না দেখছি।"
১৭. কখন; কস্মিন্ কালে (অসম্ভব বা কখন হয় না এই অর্থে) 'আমড়া গাছে কি আর আম ফলে থাকে।
১৮. কোন; বিশেষ; একটা "বড় বউমা তো আর মন্দ বলে নি।"
১৯. দ্বিতীয় বার; একবারের অধিক " কাহারও সহিত হয় ত সে একটীবার মাত্র সম্ভাষণ করিয়াই উচ্ছিষ্ট পাত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের ভাগ্যে আর তাহার দর্শন ঘটে নাই।"
২০. স্বতন্ত্র; পৃথক; বিভিন্ন; অন্য "আর এক স্থানে দেখুন"
২১. পক্ষান্তরে; কিন্তু "অতীত-দর্শী ঐতিহাসিক প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে হিন্দুর অতীত গৌরবের কথা ঘোষণা করিতেছেন। আর যাহারা অসভ্য ও অনক্ষর বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারা এখন সভ্যতায় শ্রীসপন্ন ও জ্ঞান-গৌরবে মহিমান্বিত হইয়া হিন্দুর জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি সংগ্রহ করিতেছেন।" রজনীকান্ত গুপ্ত
২২. পূর্ব্ববৎ; তখনকার মত "আমি এখন আর সে বড় মানুষের মেয়ে নহি।"
২৩. তদবধি; সেই হইতে "দলিতপুষ্প মর্ম্মপীড়িতা প্রেমলতা আর কক্ষের বাহির হন না।"
২৪. বিপরীত বা অপ্রত্যাশিত পরিণাম-বোধক "এক করিতে আর হয়।"

২৫. ক্রমোৎকর্ষসূচক; তার উপর; তাহাতে আবার; ইহাতেই রক্ষা নাই আবার “একে সে মোহন যমুনার কূল, আর সে কেলি-কদম্ব-মূল, আর সে বিবিধ ফুটন্ত ফুল, আর সে শারদ-যামিনী।”
২৬. পুনরায়; আবার; ফিরিয়া; পাল্টে “আর কি আমার হবে সে দিন, সুদিন হেন আসিবে।”
২৭. পূর্ব্বে বা পরে “আর কখনও দেখা যায় নাই, যাবেও না।”
২৮. অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী বা পরবর্ত্তীর অব্যবহিত পূর্ব বা পরবর্ত্তী কাল, ইত্যাদি “ এ শনিবার যাওয়া হবে না; আর শনিবারে যাইব।”
২৯. গত; বিগত ইত্যাদি “আর বৎসর এমন দিনে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।”
৩০. আক্ষেপ; অবসাদ ইত্যাদি “আর বাছা, এই কনককে নিয়েই এই সংসারটা ছারখার হবে দেখছি, অভাগীর কি পোড়া অদেষ্ট।”
৩১. একটা কথা, এক নূতন বিষয় বা সংবাদ ইত্যাদি অর্থে কথার মাত্রা প্রযুক্ত...ইত্যাদি “আর শুনেছ গুণধর। এসেছে এক ব্রহ্মচারী বাঞ্ছা তারি হ’তে বর।”
৩২. অবশ্য “যা নষ্ট হইয়াছে তা আর এখন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু বর্ণনা ও ছবি হতে তার অনেকটা আভাস পাইতে পার।
৩৩. এতক্ষণ বা এইক্ষণ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকা ...ইত্যাদি। “তবে বুঝি আমার মামা আর নাই! দুই ঘণ্টা তো অনেকক্ষণ হ’য়ে গিয়েছে, এখনও তো তারের জবাব এল না।”
৩৪. নিষ্ফলতার আশঙ্কাসূচক “অমন করলে আর কি হবে।”
৩৫. তুলনায় “সে একদিন আর এই একদিন”
৩৬. অব্যবহিত পরেই; প্রায় তখনই। “তুমিও গেলে আর সেও এল
এছাড়াও আর নিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের আরও বক্তব্য আছে। তবে সেসবের থেকে একটু-আধটু আপাতত বাদ দিলে পাঠকের স্বস্তি।